বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন

বিদেশী ছোটগল্প-সঞ্চয়ন

(ভূমিকা ও সমালোচনা সহ)

অনুবাদক ও সম্পাদক

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

খ্যাতনামা কথাশিল্পী

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অশেষপ্রীতিভাজনেষু।

সূচী

বলা যাইতে পারে না। এমনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সাহিত্যিক শিক্ষা বা সাধনা নাই বলিলেই হয়—ইংরেজীও যেমন বুঝে, বাংলা-জ্ঞানও তেমনই—তাহারা আর কিছু করিতে না পারিয়া, ঐরূপ অনুবাদ-কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়াছে; ফলে, বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের যে চেহারা বাঙালী পাঠকের সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এইরূপ ইংরেজী-গন্ধী ভাষার কারণ অনেক; প্রথমতঃ,—বাংলা বিদ্যার, বিশেষ করিয়া ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব; দ্বিতীয়তঃ,—মাতৃভাষা অপেক্ষা পিতৃভাষার প্রতি পক্ষপাত। আজকাল ইংরেজীর পালিশ না থাকিলে বাংলাকে কুলচুরী (Cultured) সমাজে বাহির করা মুস্কিল। এমনও দেখা যায় যে, অনুবাদ-গ্রন্থটি কত উচ্চাঙ্গের তাহাই ঘোষণা করিবার জন্য, বইএর ইংরেজী নামটাই হুবহু বাংলা অক্ষরে ছাপা হইয়া থাকে; অর্থাৎ কুরুচি তো পরের কথা—অসভ্যতার চূড়ান্ত করিতেও বাধে না। ঐ ইংরেজী নামের দ্বারা বাঙ্গালী পাঠককে অপমান করাই হয়, বিলাতের অনুবাদক ঐরূপ সাহস করিত না। কিন্তু আমাদের এই বর্ব্বর সমাজে উহাও একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সব অনুবাদকেরা ভুলিয়া যান যে, ঐরূপ নামের অর্থ যাহারা করিতে পারে তাহারা ইংরেজীতেই বইখানি পড়িবে, তাঁহাদের অমূল্য অনুবাদে তাহাদের কোন প্রয়োজন নাই। আর যাহারা ইংরেজী তেমন বোঝে না, তাহারা ঐ নামের কি অর্থ করিবে? অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদক মহাশয় নিজেই ইংরেজী নামটার উপযুক্ত বাংলা করিতে না পারিয়াই যে ঐরূপ উচ্চভাব ধারণ করেন, তাহা অসম্ভব নয়। যাহারা নামটাও অনুবাদ করিতে পারে না তাহাদের বাংলা অনুবাদও যে কত মনোহারী হইবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। আমরা অধিকাংশ য়ুরোপীয় (কন্টিনেণ্টাল) গল্প-উপন্যাস ইংরেজীর মারফতেই পড়িয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও কি অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করি, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহার কারণ, প্রথমতঃ ইংরেজী ভাষার ঐশ্বর্য্য; দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী সাহিত্য-সমাজ আমাদের মত বর্ব্বরের সমাজ নয়; সেখানকার প্রকাশক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভদ্ররকমের বোঝাপড়া আছে; উৎকৃষ্ট বিদেশী সাহিত্য সম্বন্ধে তাহাদের যে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আছে, তাহাতে ঐরূপ অনুবাদের ভার তাহারাই গ্রহণ করে, বা করিবার অধিকার পায়—যাহারা একাধারে সাহিত্যবিদ্যায় পারদর্শী এবং সাহিত্য-রস-রসিক। আমাদের এখানে ঠিক তাহার বিপরীত।

কিন্তু ঐ ভাষার কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা। একটা বিদেশী ভাষার উৎকৃষ্ট রচনা অনুবাদ করিতে হইলে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন; প্রথম,—সেই মূল ভাষায় শুধুই শব্দার্থ-জ্ঞান নয়, তাহার ইডিয়মের রস-বোধ; দ্বিতীয়,—যে ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে সেই ভাষার অনুরূপ ইডিয়ম যোজনা করিবার শক্তি; এই শক্তি আমাদের অনুবাদকের নাই, তার কারণ, ইহারা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য তো পড়েই নাই,—যে-সমাজের যে-ভাষায় ইহারা অভ্যস্ত, তাহা একটা কৃত্রিম ভাষা, তাহাতে ইডিয়মের বালাই নাই। অনুবাদের ভাষাও মূল-ভাষার সমান না হউক, সমকক্ষ হওয়া চাই—যদি সে ভাষা অধিকতর শক্তি ও শ্রীসম্পন্ন হয়, তবে তো কথাই নাই। ইংরেজী ভাষার অসামান্য উৎকর্ষই তাহাকে জগতের যাবতীয় সাহিত্যের অনুবাদ-কর্ম্মে এমন সুনিপুণ করিয়াছে। আমাদের ভাষা এখনও ততখানি সমৃদ্ধিলাভ না করিলেও, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর—এবং আরও কয়েকজন শক্তিশালী কথাশিল্পীর দ্বারা ভাষার নানারূপ কর্ষণের ফলে, এ ভাষা যেটুকু শক্তিলাভ করিয়াছে, সেই শক্তিকে বিদেশী ভাব-কল্পনার সহিত যুঝিবার সুযোগ দিলে এবং সুশিক্ষিত সাহিত্যসেবীরা সেই ভার গ্রহণ করিলে, বাংলা ভাষার শক্তি যে আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদেশী ভাব-চিন্তাকে আমাদের ভাষায় জয় করিয়া লইতে পারা কম গৌরবের কথা নয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে ভাষার ইডিয়ম ও সংস্কৃতি দুইয়েরই বিষয়ে যাহারা অজ্ঞ—রাত্র্যন্ধ বলিলেও হয়, তাহাদের এই হঠকারিতায় বাংলাভাষার গ্লানিই বৃদ্ধি পাইতেছে—জয়ের পরিবর্ত্তে পরাজয়টাই প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

আমার এই উক্তিগুলি অতিশয় কঠিন হইলেও সত্য। আমি সাহিত্যিক অথবা সাহিত্যিক-খ্যাতি-প্রত্যাশী অনুবাদকদিগের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এই সকল কথা বলিতেছি না; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে (যাহার জন্য আমি অতি আধুনিকদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছি) এবং সাহিত্যের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমার যে আন্তরিক শুভচিকীর্ষা আছে, তাহারই বশে আমি আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও রসবোধ অনুযায়ী এই সকল কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে আমার সহিত যাঁহারা একমত নহেন তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিব না, কেবল ইহাই বলিব যে, রচনার রীতি বা ষ্টাইল যাঁহার যেমনই হোক, ভাষার ইডিয়ম নষ্ট করিবার অধিকার কাহারও নাই—কমিউনিষ্ট বা সোস্যালিষ্টদেরও নাই। "পুঁজিবাদ" শব্দটির মত

কুৎসিত ভাষা আর কি হইতে পারে? তথাপি তাহার দ্বারা সমাজ ও ধ
ভাঙিয়া ফেলা সহজ হইলেও সাহিত্য গড়িয়া তোলা যায় না—যত চীৎকা
ও তর্কই করি না কেন। যাহাদের সত্যকার সাহিত্যরস-বোধ আছে তাহার
কখনই ইডিয়ম্ লঙ্ঘন করে না—করিতে পারে না; তর্ক নয়, ইহা একটা প্রাকৃতি
নিয়মের মত। যাহারা উহা করে, এবং করিয়া আস্ফালন করে—তাহারা ক্ষণজীবী
পতঙ্গ, নিজেদের অক্ষমতা ও অজ্ঞতা,—অর্থাৎ সাহিত্যরস-বোধের অভাবকে
একটা নূতন আদর্শের দোহাই দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে
তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত ঐ নব্য সাহিত্যিকদের আত্মপ্রসাদ-লাভ হইতে পারে,
সাময়িক সাহিত্যে—বিশেষ করিয়া আজিকার এই অরাজক সাহিত্য-সমাজে,
তাহাদের কিছু নগদ লাভও হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের ঐ
অপকীর্ত্তিগুলি বাংলাভাষা হইতে—অর্থাৎ সাহিত্য মাত্রেরই সেই রসবাহী যুগান্তর-
জীবী বৃক্ষকাণ্ড হইতে—অচিরে ঝরিয়া যাইবে। এমন অনুবাদ যেমন মূলের মর্য্যাদা
রক্ষা করিতে পারে না, তেমনই তাহা অপর সাহিত্যেরও অঙ্গীভূত হইয়া তাহার
শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে না। আমি বাংলায় এইরূপ অক্ষম ও বিকৃত অনুবাদের বহু
দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা আরও কঠোর হইবে বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

দ্বিতীয়তঃ, সৃষ্টিধর্ম্মী সাহিত্যের—যেমন, গল্প-উপন্যাসের (কবিতার কথা
স্বতন্ত্র) অনুবাদে, একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; গল্প ও উপন্যাসে
বিদেশী সমাজের এমন সকল প্রথাগত সংস্কার—সেই সমাজের ইতিহাস-গত
জীবনের এমন সকল অনুবন্ধ—গল্পের প্রধান গ্রন্থি হইয়া থাকে যে, ঐরূপ
উপন্যাসের রস আর এক সমাজের রস-চেতনার অনুকূল হইবে না। আবার,
এমন সকল বিদেশী গল্প ও উপন্যাস আছে যাহা সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ
নিদর্শন হইলেও, তাহার রস-সংস্কার সার্ব্বজনীন নয়। ইহার কারণ, এই
সকল রচনা প্রাণধর্ম্মী নয়—মনোধর্ম্মী; য়ুরোপের নিজস্ব সভ্যতা ও কালচার
যে-পথে অন্ধবেগে অগ্রসর হইয়া শেষে মানুষকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে—
তাহার প্রকৃতির বিকৃতি ঘটাইয়াছে—এই সাহিত্য তাহারই অতিসূক্ষ্ম রস-
বিশ্লেষণ; ইহাকেই সাহিত্যের চরম decadence বলে। অপর দিকে,
সেইরূপ উপন্যাসে একটা বিশিষ্ট জাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন-সংগ্রামের
অভিজ্ঞতা হইতেই কোন প্রতিভাবান লেখক একটা নূতন জীবন-দর্শন প্রণয়ন
করিয়াছেন; তাহার যে-রস সে সমাজে অতিশয় উপাদেয়, অপর সমাজে তাহা
তেমন হইতে পারে না; তার কারণ, তাহাতে একটা বিশিষ্ট মনোভঙ্গি আছে,

নোভঙ্গি যতই উৎকৃষ্ট হোক, তাহা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বসমাজের মানব-হৃদয়-
নয় ; কোনও মনোভঙ্গিই খাঁটি জীবন-রস-রসিকতার ভঙ্গি হইতে পারে
কিন্তু সমাজ ও জাতি-নির্ব্বিশেষে মানুষের জীবনে ও চরিত্রে যে
্য ফুটিয়া উঠে, তাহার রস সকল জাতিই উপভোগ করিতে পারে, কারণ
বৈচিত্র্য আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার বহির্ভূত হইলেও, সেগুলির বীজ
mmon humanity" বা মানব-মহাজাতির স্বভাবে সর্ব্বত্রই নিহিত আছে ;
-ই অবস্থায়, সেই ধরণের জীবন-যাত্রায় আমরাও যে ঠিক ঐরূপ ব্যবহার
করিতাম, অন্তরে তাহা স্বীকার করি বলিয়াই আমরা তাহার রস উপভোগ
করিতে পারি ; বরং তাহাতে আমাদের কল্পনাশক্তি আরও উদ্দীপ্ত হয়। কিন্তু
যখানে এই সার্ব্বজনীন মানবীয় সংস্কারের বহির্ভূত কোন একটা বিশেষ
জাতি ও বিশেষ সমাজের বিশেষ সংস্কৃতির উপরেই কোন গল্প বা উপন্যাসের
দ-রূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে তাহার অনুবাদ যতই সুষ্ঠু ও সুসম্পন্ন হউক
কেন, অপর কোন জাতির রস-সংবেদনায় তাহা গ্রাহ্য হইবে না। অথবা,
ল বিদেশী বা অপরিচিত-পূর্ব্ব বলিয়াই (যাহাকে ইংরাজীতে exotic
ল) যেমন কোন দ্রব্য চিত্তাকর্ষক হয়—বিদেশী সাহিত্য-কলার তেমন সামগ্রীও
আমাদের চিত্তে একরূপ রসসঞ্চার করে, সেজন্য তেমন বস্তুর অনুবাদ আমাদের
সাহিত্যের চিত্রশালায় স্থান পাইবার যোগ্য। আমার মনে আছে একবার
রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে টেনিসনের "Lady of Shailot" নামক প্রসিদ্ধ
কবিতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ঐ কবিতা ইংরেজিতে এত সুন্দর
হইলেও বাংলায় তাহার অনুবাদ নিরর্থক হইবে, তার কারণ, উহার যে
একটি বিশিষ্ট ভাবমণ্ডল আছে (য়ুরোপের মধ্যযুগের সেই 'নাইট-এরান্ট্রি'র)
তাহা আমাদের সংস্কারের বহির্ভূত। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমি ঐ কবিতাটির
একটি বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলাম (আমার 'হেমন্ত-গোধূলি' নামক কাব্য-
গ্রন্থে আছে), কেবল অনুবাদ-কর্ম্মের একটা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার
জন্য। এইরূপ অনুবাদের মূল্য কেবল তাঁহাদের নিকটেই আছে, যাঁহারা
মূল কবিতাটিও পড়িয়াছেন। ঠিক এই কারণে বিদেশী সাহিত্যের অনেক
উৎকৃষ্ট বস্তুই যে অনুবাদ-যোগ্য নহে (খাঁটি সাহিত্যিক প্রয়োজনে) তাহার
আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। আনাতোল ফ্রান্সের "Procurateur of Judœa"
রটি য়ুরোপীয় গল্প-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, আমরা
হার ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু ঐ গল্পের শেষ কয়
ংক্তিতে যে চমক-সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহার প্রয়োজনে সমগ্র গল্পটিতে

নানা তথ্যের যে বর্ণ-বিন্যাস আছে, তাহার রস উপলব্ধি করিতে হইলে শুধুই গল্প-পাঠক হইলে চলিবে না, একটা বিশিষ্ট কালের বিশিষ্ট জাতির ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানিয়া রাখা চাই; এজন্য উহার বাংলা অনুবাদ নিষ্ফল, আমিও দুঃখের সহিত সে প্রলোভন সংবরণ করিয়াছি। ভাষার বাধাও আছে। ঐরূপ বিশিষ্ট উপাদানে রচিত ভাবমণ্ডলটীকে এক ভাষা হইতে আরেক ভাষায় তুলিয়া আনিতে হইলে যে সকল নূতন শব্দ এবং অনুরূপ ইডিয়ম-যোজনার প্রয়োজন, তাহা বাংলা ভাষায় মিলিবে না, জোর করিয়া তাহা করিতে গেলে ভাষা পীড়িত হইবে, এবং ভাষা পীড়িত হইলে রসসৃষ্টিও ব্যাহত হইবে,—শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িতে হইবে।

উপরে আমি অনুবাদ-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছি, আশা করি তাহা সকল সুশিক্ষিত ও সুরসিক পাঠকের সমর্থন লাভ করিবে। অনুবাদ-কার্য্যের অভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দুই-ই দুইদিক দিয়া পঙ্গু হইয়া আছে। বিশ্বসাহিত্যের রসধারার সহিত এ সাহিত্যের যোগ স্থাপিত না হইলে ভাষারও যেমন সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ষণ হয় না, তেমনই জাতির চিত্তভূমি সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিবে। যাঁহারা মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভা নাই বলিয়া হতাশ হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তথাকথিত সাহিত্যিকদের তুলনায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও রসবোধে প্রবীণ; তাঁহারা যদি একটা উচ্চ ও বিশুদ্ধ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আজিকার এই প্রগতি-প্রবল মৌলিক সাহিত্যের বন্যা রোধ করিবার জন্য, বিদেশী সাহিত্যের অমর রচনাবলী বাংলায় অনুবাদ করিতে ব্রতী হন, তবে এই ভাগ্যহত, বুদ্ধিহত, আত্মঘাতী স্বজাতির একটা মহৎ কল্যাণ করিতে পারিবেন; কারণ, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মত এমন সঞ্জীবনী সুধা আর নাই। আমি উপরে সেই অনুবাদ-কর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটি বড় সমস্যার আলোচনা করিলাম।

আরও একটা বিষয়ে এই প্রসঙ্গে কিছু বলা আবশ্যক। আমি বলিয়াছি, এইরূপ অনুবাদের মুখ্য অভিপ্রায়—বিদেশী সাহিত্যের রস আমাদের ভাষায় সঞ্চারিত করিয়া ভাষারও যেমন শক্তিবৃদ্ধি করা, তেমনই আমাদের অন্তরে রস-সংবেদনার ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করিয়া তোলা। কিন্তু এইরূপ অনুবাদের দ্বারা আরও একটি বড় প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে—শুধুই রসাস্বাদন নয়—জ্ঞানেরও উন্নতি হয়। এইরূপ অনুবাদ-সাহিত্য হইতেই আমরা সে সার্ব্বভৌমিক মানব-প্রকৃতির (Common Humanity) যে পরিচয় লাভ

করি তাহা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অপেক্ষাও এক হিসাবে মূল্যবান। এই এক মানব-প্রকৃতি—ভিন্ন জাতি, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন জীবন-যাত্রার এবং সভ্যতার স্তরভেদে কত বিচিত্র রূপ ধারণ করে, মানুষের সেই আদি প্রকৃতির উপরেই নানা সংস্কার এবং সামাজিক ও প্রাকৃতিক নানা সমস্যা-সঙ্কট কত রকমের কত চরিত্র গড়িয়া তোলে! সেই বহু-রূপ দেখিয়াই মানুষের আসল রূপটি আমরা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি; সেই জ্ঞানই সকল জ্ঞানের উপরে, এইজন্যই—"The proper study of mankind is man"। আমার এই সঞ্চয়নেও তাহার দৃষ্টান্ত আছে। ঐ বহুবিচিত্রের মধ্যে সেই এককে—সেই মানুষকে—চিনিতে পারি বলিয়াই রসাস্বাদ হয়, এবং গল্প-উপন্যাসের উৎকৃষ্ট আর্ট বা রস-নৈপুণ্যই তাহার কারণ।

(২)

এইবার আমার এই অনুবাদগুলির কথা। বলা বাহুল্য, আমার এই কাজ সামান্য—সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মত। কিন্তু এই সামান্য কাজটিতেও আমি আমার সাহিত্য-ধর্ম্ম যতদূর সাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সে বিষয়ে আমার রুচি ও রসবোধের উপরেই নির্ভর করিতে আমি বাধ্য; তথাপি এই নির্ব্বাচন-কর্ম্মে আমি যে আদর্শ রক্ষা করিয়াছি, তাহা সাহিত্য-রসিকমাত্রেরই মনঃপূত হইবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। সবগুলি গল্প সমান উৎকৃষ্ট না হইলেও, কোনটাই তুচ্ছ বা সামান্য বলিয়া মনে হইবে না। ইহার কয়েকটি অতিপরিচিত এবং প্রসিদ্ধ। এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা বলি। আমি অনেকগুলি বিখ্যাত ও অ-বিখ্যাত বিদেশী গল্প-সংগ্রহের বই পড়িয়াছি—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল লাইব্রেরীতে যতগুলি ছিল তাহার প্রায় সবই এককালে পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বে এই বিদেশী ছোটগল্পের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, ক্রমে তাহা হ্রাস পাইয়াছে। সত্য বটে, এমন কয়েকটি গল্প আমার চোখে পড়িয়াছে যাহার তুলনা নাই,—এই সঞ্চয়নে তাহায় কয়েকটি আছে; কিন্তু অধিকাংশ লেখাই শুধু নীরস নহে, এমনই অর্থহীন (pointless) যে, ঐরূপ বড় বড় সংগ্রহে তাহারা স্থান পাইল কেমন করিয়া ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। বিরক্তিও কম হয় নাই—অধিকাংশ গল্প শেষ করিয়া সম্পাদক বা সম্পাদক-মণ্ডলীকে গালি দিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ইহার কারণ কি? উহাদের দেশেও

কি যেমন-তেমন কতকগুলা পুরাতন ও নূতন গল্প একত্র করিয়া একখানা মোটা বই বাজার-যোগ্য করিতে পারিলেই হইল? না, উহাদের রুচি ও রসবোধ অন্যরূপ? এই শেষ কথাটা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের রুচি ও রসবোধ মুখ্যতঃ উহাদেরই শ্রেষ্ঠ লেখক ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সহিত পরিচয়ে গড়িয়া উঠিয়াছে। তবে কি উহারা ঐরূপ নির্ব্বাচন-কার্য্য সেখানকার পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের দ্বারা করাইয়া লয়?—একটা কারণ হয়তো ইহাই। গল্পের রস-বিচারে ঐরূপ পণ্ডিতদের দক্ষতা কেমন, তাহা আমাদের দেশেও চাক্ষুষ করিতেছি। আমার বোধ হয় প্রকাশকগণের ব্যবসায়-নীতিও আর একটা কারণ। একালে সাহিত্য-বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যে বাধ্য-বাধকতা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পণ্যের ভারটাই বড়, সারটা কিছুই নয়। কেবল তাহাই নয়, ঐ ক্রেতারা এমন পুস্তকে লেখকের নাম-সংখ্যা গণিয়া দেখিবে। কাজেই এই গণ-প্রগতির যুগে সাহিত্যের কুল-শীল আর বজায় থাকিতেছে না। আরও কারণ এই যে,—আমার মনে হয়, য়ুরোপীয় সাহিত্যে উৎকৃষ্ট ছোটগল্প-লেখকদের সংখ্যা খুব অল্প—ঔপন্যাসিকদিগের সংখ্যা তাহার তুলনায় অনেক বেশী। বরং আমাদের সাহিত্যে গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে—এ গর্ব্ব আমরা করিতে পারি। কিন্তু সম্প্রতি যে "শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়নে"র হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ এক গণ-নীতিই শিরোধার্য্য হইয়াছে; লেখকগুলি 'শ্রেষ্ঠ' হইলেও, গল্পগুলির অধিকাংশই 'শ্রেষ্ঠ-গল্প' নয়। এই সকল সম্পাদকগণ, হয়তো ভুলিয়া যান যে, 'শ্রেষ্ঠ-গল্প' নির্ব্বাচন করিবার যোগ্যতা বা অধিকার সকলের নাই—কারণ, নির্ব্বাচনই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা; শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক না হইলে শ্রেষ্ঠ-গল্প-নির্ব্বাচনের স্পর্দ্ধা কাহারও হইতে পারে না। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' না বলিয়া 'কয়েকটি গল্প' বা 'দশটি গল্প' এইরূপ নাম দিলে ঐরূপ স্পর্দ্ধার কারণ ঘটে না। আরও একটা কথা, ঐ কাজ যিনি করিবেন তাঁহাকে গল্পের লেখক-গণের স্বকীয় মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

এইবার, আমার এই অনুবাদগুলির ভাষার কথা। আমারই অনুবাদ-নীতি অনুসারে এই অনুবাদের ভাষা যদি খাঁটি বাংলা না হইয়া থাকে, তবে ঐ নির্ব্বাচনেরও কোন মূল্য নাই। কিন্তু সে বিচারের ভার আমি বাঙালী পাঠকের উপরেই দিলাম—যাঁহারা ইংরেজীর মাধ্যমে বাংলা পড়িতে ও বুঝিতে অভ্যস্ত হন নাই এবং যাঁহাদের সাহিত্যিক রুচি ও রস-বোধ কিছু পরিমাণ

কর্ষিত হইয়াছে। তথাপি এই অনুবাদের ভাষা সর্ব্বত্র এক রীতির নয়—ইহাও পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন; কোথাও সাধু-রীতি, কোথাও চলতি-রীতি। এইরূপ হইবার কারণ, আমার যাহা মনে হয়—তাহা এই। বাংলা ভাষার যে দুই রীতি এক্ষণে প্রচলিত হইয়াছে (একটি গণ-সাহিত্যের জন্ম-জিনিয়াসদের ধর্ম্মভাষা হইয়া উঠিয়াছে), সাহিত্যের বাহনহিসাবে তাহাদের আপেক্ষিক যোগ্যতা বিচার না করিয়াও বলা যাইতে পারে, ঐ দুই রীতির বাচন-ভঙ্গি যেমনই হোক, পয়ার ও ছড়ার ছন্দের মত উহাদের প্রত্যেকের বাক্যচ্ছন্দের যে বৈচিত্র্য আছে তাহাতে আবশ্যক-মত উহাদের একটি বা অপরটির সাহায্যে কোন বিশেষ ভাবমণ্ডলকে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ সুযোগ অন্য ভাষাতেও আছে,—সেখানেও ভাষার স্পষ্ট স্তরভেদ আছে, কেবল বাংলার মত তাহা এমন রীতি-ভেদ হইয়া উঠে নাই। অতএব, প্রত্যেক গল্পের ভাবমণ্ডল, আমাকে যেমন আবিষ্ট করিয়াছে আমি সম্ভবতঃ তাহার অনুরূপ বা উপযোগী ভাষায় আকৃষ্ট হইয়াছি। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ রীতি বুদ্ধিপূর্ব্বক স্থির করিয়াছি। তার কারণ, গল্পের বিষয়বস্তু বা বর্ণনার ভঙ্গি এমনই যে, ঐ দুই রীতির কোন একটিতে অনুবাদ করা সহজ বলিয়া মনে হইয়াছে। তথাপি সবগুলি এক রীতিতে অনুবাদ করা নিশ্চয়ই যাইত, ইহা স্বীকার করি; করিলে কেমন হইত তাহা এই অনুবাদগুলি হইতেই কাব্যরসিক পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, যদি না পারেন আমারই দুর্ভাগ্য। আমার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা-গদ্যের ঐ দুই রীতিকেই এই অনুবাদের সুযোগে একটু বাজাইয়া লওয়া। একটি গল্পে ('সোনা-পোকা') এই পরীক্ষাকার্য্যে একটু বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলিবার আছে। ভাষার কোনটাই আমার ভাষা অর্থাৎ নিজস্ব ষ্টাইল নয়। বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্বসূরিগণ এই ভাষার অঙ্গে যতখানি শক্তি ও শ্রী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আমি তাহারই সাহায্যে এই উৎকৃষ্ট বিদেশী গল্পগুলির রস অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাহাতে বাংলা সাহিত্যের সুপরিপুষ্ট ভাষাকে পরীক্ষা করিবার একটা বড় সুযোগ পাইয়াছি। ঐ ভাষা যে আমার ষ্টাইল নয়, তার প্রমাণ—আমি সর্ব্বত্র গল্পের ভাব ও কল্পনামণ্ডল অনুসারে ভাষাকে তদনুবর্ত্তী করিয়াছি—কোন একটা রীতি বা ষ্টাইলের শাসন মানি নাই। এইজন্য অনুবাদক হইয়াও আমি শিল্পী-সুলভ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। রসজ্ঞ অনুবাদক মাত্রেই আমার এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন, এবং অনুবাদ-কর্ম্মও যে কি কারণে আর্টের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে, তাহা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইবেন।

(৩)

এইবার এই গল্পগুলির রস-রূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে ভাল হয়। প্রথমেই একটা পুরাণো প্রশ্ন হয়তো অনেকেই উত্থাপন করিবেন—'ছোটগল্প' কি বস্তু? তাহার সংজ্ঞা বা আদর্শ কি? আদর্শ অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা নিরাপদ নয়,—আধুনিক সাহিত্য-বিচারেও ঐরূপ সংজ্ঞা-নির্ম্মাণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। ঐরূপ প্রশ্ন এবং তাহার সমাধান সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠকদের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজনীয় নয়, উহা পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সেই অবিদ্যা-চর্চ্চা—যাহার দ্বারা পণ্ডিত-জীবনের নানা সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। সাহিত্যের নানা সৃষ্টিকর্ম্মের শ্রেণীভাগ করিতে না পারিলে যাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারাই প্রত্যেক রচনার একটা নাম-গোত্র স্থির করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের শরণাপন্ন হন, এবং তদ্দ্বারা একটা মাপকাঠি প্রস্তুত করিয়া, পরে সেই কাঠি বা লাঠির দ্বারা মাপিয়া ঠুকিয়া তাহার গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ছোটগল্প—ইংরেজী 'short story'—নামটি নিশ্চয় প্রথমে একটা সাধারণ বিশেষণরূপে এক ধরণের গল্পকে নির্দ্দেশ করিত। পরে ঐ ছোটও কত ছোট হইবে তাহার একটা হাস্যকর পৃষ্ঠা ও পংক্তি-সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তারও পরে যখন নানা রকমের ছোটগল্প দেখা দিতে লাগিল, তখন সেইগুলির কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বাছাই করিয়া, ছোটগল্পের একটা রীতিমত সংজ্ঞা তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু যতই সংজ্ঞা-নির্ম্মাণ হউক, তাহার দ্বারা কোন কাব্য-বস্তুরই যে একটী সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করা যায় না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন—প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া যায় মাত্র। ছোটগল্পেরও ভঙ্গি, ও তাহার রসরূপ এত বিচিত্র যে কোন, সংজ্ঞার দ্বারা সেই বৈচিত্র্যকে বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। তবু ছোটগল্প যে আকারে বা প্রকারে উপন্যাস নয়, তাহা আমরা বুঝি, আরও কি কি নয়, তাহাও বলা যায়। উহার আকার কত ছোট বা কত বড় হইতে পারে, তাহা নির্ভর করে এমন একটা কিছুর উপরে যাহা বুঝিয়া লইতে পারিলে উহার আর সকল গুণও বুঝিতে পারা যাইবে; বাহিরের আকারটার দিকে না চাহিয়া ভিতরের সেই রস-প্রেরণা বুঝিয়া লইতে হইবে। যদিও তাহার বিভিন্ন রূপের কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হয়, তথাপি সেই সাধারণ লক্ষণগুলা হইতেই একটা আরও গভীরতর সাধারণ-কিছুকে ধরিতে পারিলে কতকটা কাজ হইতে

পারে—তাহাও সবটা নয়। আমি ইহার নাম দিব—একটি বিশেষ রকমের গাঁথুনি, বাঁধুনি বা form; ইংরেজী শব্দটির প্রতিশব্দ বাংলায় অনেক রকম হইতে পারে, কিন্তু এখানে form বলিতে কোন্ বস্তু বুঝাইতে চাই, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি।

"ফর্ম্ম" বলিতে রচনার রস-রূপও বুঝায়; কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝা যাইবে না, কারণ, ঐ 'রূপ'—ঐ form সর্ব্ববিধ সাহিত্য-সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ; তাহা হইলে ছোটগল্পের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হইল না। রচনা যত বড় বা ছোট হৌক,—সকল উপাদান-উপকরণের যথোচিত মিলনে এবং সকল অঙ্গের নিখুঁত সংযোজনায় যে একটি সমগ্রতার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই রচনার রস-রূপ বলে—উহাই তাহার রস-পরিণাম। অতএব সকল রচনার রস-রূপ একই। তথাপি, সেই রস-রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার কল-কৌশল (mechanism) সকল রচনায় একই রূপ হইতে পারে না; রচনার প্রকৃতি অনুসারে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। আমি এখানে 'form' বলিতে সেই mechanism-এর কথাই বলিতেছি না, কারণ তাহা প্রত্যেক গল্প-রচনায় একটু না একটু পৃথক হইতে বাধ্য। ইহাকে ছোটগল্পের আর্ট বা টেকনিকও (technique) বলিব না, কারণ ঐ আর্ট বা টেকনিকও বাহিরের কলা-কৌশল। আমি যাহাকে form বলিতেছি তাহা কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমে ধরা দেয়, পরে গল্পটিতেও সেই form ফুটিয়া উঠে, এবং তাহারই কারণে গল্পেরও একটা form বা বাঁধুনি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অতএব, আগে ঐ form, পরে টেকনিক।

তাহা হইলে এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—ছোটগল্প রচনা করিতে হইলে লেখকের সেই দৃষ্টি কিরূপ হইবে? উপন্যাস লেখেন যিনি, তাঁহার দৃষ্টি মানুষের জীবনকে কালের গতি-স্রোতে ফেলিয়া, একটা ঘটনা-ধারায় তাহাকে বিবর্ত্তিত হইতে দেখে; ঘটনাগুলিতে কার্য্য-কারণের অলঙ্ঘ্য নিয়ম, দৈব, এবং নর-নারীর চরিত্রগত নানাশক্তির দ্বন্দ্ব—এইগুলির যোগে সেই ধারার গতি ও তাহার আদি-অন্ত নিরূপণ করিয়া, জীবনের রহস্যকে কোন একটা রস-রূপে আমাদের চিত্তে প্রতিভাত করে। এই যে দৃষ্টি ইহার অনুরূপ একটা 'form' উপন্যাস-কবির দৃষ্টিতে, রচনারও পূর্ব্বে ভাসিয়া উঠে; তারপর তাহাই উপন্যাসের সর্ব্ববিধ উপাদানকে একটা প্লটের (plot) বাঁধুনিতে ঐ আকারে রূপ দেয়। ছোটগল্পের form বা লেখকের সেই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরূপ। সে দৃষ্টির দৃশ্য-ভূমি এমন বিস্তৃত নয়,—ঐরূপ একটা কাল-প্রবাহে দীর্ঘ ঘটনা-ধারার অনুসরণ করে না; মানব-জীবনের কোন বৃহত্তর রহস্যভেদ করিতেও চায় না।

জীবনের নিত্য-ধারায় যে নৈমিত্তিক তরঙ্গগুলি উঠিতেছে ও পড়িতেছে, যাহা আমাদের চক্ষে সর্ব্বদা পড়ে না, তাহারই কোন একটিকে ছোটগল্পের কবি স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। উহা একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা হইতে পারে, ব্যক্তি-চরিত্রের কোন একটা অতর্কিত অথচ লক্ষণীয় দিক হইতে পারে, অথবা একটা বিচিত্র ঘটনা-সংস্থানে (situation) কোন এক চরিত্রের অদ্ভুত বিকাশ হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিতেই একটা form-এর উদ্ভব হয়; স্থান-কাল-পাত্রের ঐ সংকীর্ণ পরিসরেও জীবনের একটা খণ্ড অংশ এমন একটা form-এ ধরা দেয়—এমন একটা সঙ্গতি-সুষমায় ফুটিয়া উঠে যে, তাহাতেই একটা সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতা-বোধ জাগে। ইহাই ছোটগল্পের সেই form। অতএব, কতকগুলি বহির্গত লক্ষণ বিচার না করিয়া একেবারে ঐ ভিতরের দৃষ্টিভঙ্গি ও তজ্জনিত ঐ form-টার কথা মনে রাখিলে ছোটগল্পেরও একটা আদর্শ নির্ণয় করা যাইতে পারে, তখন ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, উহা এক ধরণের কথা-শিল্প,-যাহাতে নাটক, উপন্যাস বা মহাকাব্যের পটবিস্তার, কাল-বিস্তার বা দীর্ঘ ঘটনাজাল নাই; বরং তাহারই একটা খণ্ড-রূপকে কোন একটি বিশেষ সংস্থানে, বিশেষ ঘটনায় ও বিশেষ চরিত্রে এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তোলে যে, তাহাতেই এক প্রকার রসোপলব্ধি হয়; যেন জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে যে সকল স্বল্পালোকিত, অনাবিষ্কৃত, অবজ্ঞাত কোণ রহিয়াছে, সেইগুলার উপরে তীব্র ও চকিত আলোকপাত করে; কোথাও কৌতুক, কোথাও বিস্ময়, কোথাও বা আমাদের হৃদয়ের একটা সুপ্ত তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ক্ষণিক ভাব-বিহ্বলতা সৃষ্টি করে। ইহার মূলে আছে লেখকের সেই দৃষ্টিগত form, তারপর ঐ form-এর কারণেই গল্পে যে একটা গাঁথনি থাকিবেই তাহাকেই উহার একরূপ mechanism বা গঠন-কৌশল বলিলে সকল তর্ক ও আপত্তির নিরসন হইবে; কারণ তখনও গল্প-বিশেষের গঠন-বিচারে সর্ব্বত্র ঐ formটাই মুখ্য হইয়া থাকিবে এবং ইহাও দেখা যাইবে যে, সেই form-এর জন্যই ঐ বাঁধুনির একটা বিশেষত্ব আছে, আর কোন কারণে নয়; সে বিশেষত্ব এই। একটি ক্ষুদ্র পরিসর বা পটভূমিকা; একটি চরিত্র (অপরগুলি সেই পটভূমিকারই অন্তর্গত); এবং যে-একটি নাটকীয় পরিণামে গল্পটির সমাপ্তি ঘটিবে তাহারই আয়োজনে ও অভিমুখে যত কিছু উপাদান-বিন্যাস—একটি কথা বা একটি বর্ণনা নাই যাহা সেই সমাপ্তিকে চূড়ান্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে অনাবশ্যক। ইহাই উৎকৃষ্ট form, অর্থাৎ ইহাই ছোটগল্পের আদর্শ; তারপর যে-গল্প ইহার যতটা নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহা সার্থক।

ছোট-গল্পের form বলিতে আমি কি বুঝি তাহাই যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিলাম। এই form-ই সব, যদি ওটা ঠিক থাকে তাহা হইলে ছোটগল্প যে ভাবের, যে ভঙ্গিরই হউক, আমাদের চিত্তে রসোদ্রেক করিবেই। আমি উহাকে গল্পের বাঁধুনি বলিয়াছি, সেই অর্থে form সব গল্পে সমান নির্দোষ না হইতে পারে—কিন্তু ঐ গভীরতর অর্থে সকল উৎকৃষ্ট গল্পে তাহা থাকিবেই। এইজন্য আমি ঐ বাঁধুনি কথাটার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিলাম। ছোটগল্পের আকার কত ছোট বা কত বড় হইতে পারে তাহা নির্ভর করে ঐ form-এর উপরে; খুব ছোট হইলে ঐ form-এর অবকাশ থাকে না, তখন তাহা ছোটগল্প না হইয়া, চুটকি-গল্প হইয়া পড়ে; আবার খুব বড় হইলে ঐ বাঁধুনি ঢিলা হইয়া যায়।

আমি যাহাকে চুট্‌কি বলিয়াছি তাহা ছোটগল্প নয় এই জন্য যে, তাহাতে জীবনের গভীর স্রোতের তরঙ্গ-ভঙ্গও যেমন নাই, তেমনই রসেরও গূঢ়তা বা গাঢ়তা নাই। সমাজ-বিশেষের নিতান্তই উপরিভাগে, মানুষের চরিত্রে বা ব্যবহারে মুদ্রাদোষের মত যে সকল লক্ষণ নিত্যই দৃষ্টিগোচর হয়—অতি-ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাতেও যে অভিজ্ঞতার উপাদান আছে, তাহাই কোথাও নীতি-উপদেশ, কোথাও ব্যঙ্গ, বা কোথাও একটু সেন্টিমেণ্টের আকারে উপভোগ্য করিয়া তোলাই চুট্‌কি-গল্পের কাজ। অতএব ছোটগল্প ছোট হইলেই তাহাকে যেমন চুট্‌কি বলা যাইবে না, তেমনই সেই নজীরে চুটকীও ছোট গল্পের মর্য্যাদা দাবি করিতে পারে না; এইজন্য, যিনি অজস্র চুট্‌কি-রচনায় সিদ্ধহস্ত তিনিও বড় সাহিত্যিক নহেন।

কিন্তু আমি যে কোনরূপ সংজ্ঞা-নির্ম্মাণের পক্ষপাতী নই কেন, এখনই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; এই যে এত করিয়া ছোটগল্পের একটা আদর্শ নির্ণয় করিলাম, তাহাতেও হালে পানি পাইবে না। ঐ যে বাঁধুনির কথা আমি বলিয়াছি, উহা কয়েকটি বিশেষ উপাদানের অপেক্ষা রাখে, যেমন—একটা সুস্পষ্ট ঘটনা, বিশিষ্ট চরিত্র এবং নাটকীয় পরিসমাপ্তি—ইহার জন্য ছোট-গল্প কল্পনা বা ভাব-প্রধান না হইয়া বাস্তবাশ্রয়ী হইবে। কল্পনা-প্রধান হইলে ঐ বাঁধন ছিঁড়িয়া যাইবে; ভাব-প্রধান হইলে, কোন সুস্পষ্ট ঘটনা বা নাটকীয় পরিসমাপ্তি তাহাতে থাকিবে না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, এই সঞ্চয়নের 'লায়লা-মজনুঁ' গল্পটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার বাঁধুনি ছোটগল্পের মত নয়—রোমান্স-জাতীয় উপন্যাসের মত। চরিত্র এবং ঘটনা বাস্তবের অধিক; সাধারণ সুস্থ (normal) জীবনের কথা নয় বলিয়া

ঘটনাগুলিতেও যেমন, নায়ক-নায়িকার চরিত্রেও তেমনই আতিশয্য আছে; এজন্ত জীবনেরই একটা খণ্ড-চিত্র যেরূপ ঘটনা বা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া একটি সুডৌল রস-রূপ ধারণ করে ইহাতে তাহা হয় নাই; কতকগুলি ঘটনা পর পর ঘটে মাত্র, এবং যাহাতে সমাপ্ত হয় তাহা ঘটনার সমাপ্তি নয়, একটা কল্পনারই সমাপ্তি। অতএব ইহাকে ছোট গল্প বলা যায় না—একখানি ক্ষুদ্র আকারের রোমান্স বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া কাহিনীহিসাবেও ইহার রস কি কম উপভোগ্য? ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উহার ঐ ক্ষুদ্র আকারটাই উহাকে ছোটগল্পের সহিত এক পংক্তিভুক্ত করিয়াছে।

আবার অতিশয় কাল্পনিক না হউক, ভাবপ্রধান হইলেও উৎকৃষ্ট ছোট-গল্প হইতে বাধা নাই। সেখানে ঐরূপ খণ্ড-চিত্র বা জীবনের কোন একটা অলক্ষ্য ঘটনাকে ভাব-দৃষ্টিতে দেখিয়া আর একটা জগতের সংবাদ আমাদের চিত্তগোচর করা হয়—সে ঘটনা বাহিরের জগতে ঘটে না, অন্তর্জ্জগতেই ঘটে। আমাদের সাহিত্যে এই ধরণের ছোট-গল্প রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় একটা নূতন genre বা শিল্প-রীতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাঁহার দুইটি গল্প—'কাবুলিওয়ালা' ও 'পোষ্ট-মাষ্টার' তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, তেমন গল্পে ব্যক্তি-মানুষের চরিত্র নয় মানব-হৃদয়,—এবং বহির্জ্জগতের ঘটনা নয়—সেই হৃদয়াকাশের বিদ্যুৎ-বিকাশই মুখ্য। তথাপি প্রথম গল্পটিতে ছোট-গল্পের সেই form অক্ষুণ্ণ আছে—ঘটনা ও সমাপ্তি বাহিরের রঙ্গমঞ্চে একটি নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় গল্পের ঐ 'রতন' নাম্নী পল্লী-বালিকার কথা যেমন ভাবের অসীমায় অসমাপ্ত হইয়া আছে, তেমনই তাহার সেই চরিত্রও ভাবের তুলিতে আঁকা, লেখকের দৃষ্টি বাস্তবে আবদ্ধ নয়—উহার ঘটনাও ঘটনাহিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের সকল ছোট-গল্পই এমন ভাব-প্রধান নয়—সেই ভাববস্তু হৃদয়-রঙ্গমঞ্চেও নাট্যীকৃত হইয়াছে। কিন্তু 'একরাত্রি,' 'শুভা', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্প-গুলিতে ঘটনা, চরিত্র ও সমাপ্তির সেই বাঁধুনি নিখুঁত হইতে পারে নাই; তার কারণ, ইহাদের রস-রূপ স্বতন্ত্র। কিন্তু ঐ ভাব এবং ঐ বস্তু উভয়ে মিলিয়া যেখানে একটি নাটকীয় পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে সেইখানেই গল্পগুলি অনবদ্য হইয়াছে, ইহাও সত্য। তথাপি, তাঁহার অধিকাংশ গল্পে কবির নিজস্ব ভাব-দৃষ্টিই প্রবল, তাই সেগুলিকে একরূপ গল্পায়িত লিরিক

বলা যাইতে পারে। তিনি নিজেই তাঁহার এই গল্পগুলির প্রেরণা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি',
তাহারই দু'চারিটি অশ্রুজল;
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে, সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

—অতএব ঐরূপ form-এর প্রয়োজন কি?—কাহাকে form দিবেন? অজস্র ধারায় চারিদিকে যাহা ঝিক্‌মিক্ করিয়া ফুটিয়া ঝরিতেছে তাহা কবির চিত্তে কোন form গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে রসাবিষ্ট করে; সে রসের মূর্চ্ছনা শেষ হয় না, সেই অসমাপ্তিই যে আরও মধুর! কিন্তু ঐ যে 'শেষ হয়ে হইল ন শেষ'—উহা যে কিরূপ, তাহা আমরাও কবির দৌলতে উপভোগ করিয়াছি; এজন্য রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছ" (শেষের দিকের গল্পগুলি নয়) তাঁহার অমর কীর্ত্তি হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে আমি ঐ যে form-এর কথা বলিয়াছি তাহার কি হইবে?

পাঠকগণ নিশ্চয় বলিবেন, ঐ form-এর কথাটা ছাড়িয়া দিলেই তো হয়,—কাজ কি কোন বাঁধুনি বা বাঁধাবাঁধির কথায়? কিন্তু তাহাতে একটা মুস্কিল আছে,—আমরা 'ছোটগল্পের' আদর্শ নির্ণয় করিতেছি। গল্পের আকারে এমন অনেক রচনাই তো সম্ভব, যাহাতে কোন-না-কোন প্রকার রস-সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখানে সেকথা বলিলে চলিবে না, কারণ রসসৃষ্টি হোক বা না হোক, ঐ 'ছোটগল্পে'র নামে অনেক রচনা আমাদের নিকটে কৃতিত্ব দাবী করে। আমি এই সঞ্চয়নে এমন গল্পকেও স্থান দিয়াছি, যাহার form যেমনই হোক, একটা বিচিত্র রস তাহাতে আছে। তথাপি, অপর যে ছোটগল্পগুলি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে—তাহাদের রস ছোটগল্পেরই রস, এবং তাহার কারণ হইয়াছে—ঐ form বা একটা বিশেষ ধরণের বাঁধুনি। অতএব ঐ formটাকে স্বীকার করিতেই হইবে। য়ুরোপীয় সাহিত্যে ঐ ছোটগল্পের জন্ম হইতে আমাদের সাহিত্যেও উহার উদ্ভব ও প্রসার পর্য্যন্ত, আমরা ঐ form-টাকেই ছোটগল্পের প্রাণবস্তু বলিয়া বুঝিয়াছি। সেখানকার সাহিত্যে ফরাসী লেখক

মোপাসাঁ-ই (Guy de Maupassant) ছোটগল্পের প্রথম ও প্রধান ওস্তাদ। মোপাসাঁর গল্পগুলি ঐ form-এর গুণেই আমাদিগকেও এমন মুগ্ধ করে, কারণ অনেক গল্পের বস্তু-অংশ আমাদের সংস্কারে তেমন উপাদেয় নয়; তথাপি তাহাদের ঐ form-ই যেন জীব-জীবনের একটা স্থূল রহস্যকে আমাদের চিত্তে রসবৎ করিয়া তোলে। কিন্তু য়ুরোপীয় গল্পসাহিত্যের একদিকে যেমন মোপাসাঁ, তেমনই অপরদিকে প্রায় বিপরীত বলিলেও হয়—রুশীয় লেখক চেহভ (Anton Tchehov), যেন দুই প্রান্তে দুই জন, জীবনের বাস্তবকে দুইজনে দুইরূপে দেখিয়াছেন—একজন বাহিরে, আর একজন ভিতরে। মোপাসাঁ যেমন মানুষের দেহ-যাত্রা বা প্রাণী-জীবনটাকেই তাঁহার দৃষ্টির সেই চকিত আলোকপাতে স্ফুলিঙ্গময় করিয়া দেখাইয়াছেন, চেহভ মানুষের সেই জীবনের ভিতর দিকটাকে—স্ফুলিঙ্গময় নয়—প্রখর আলোকও নয়—যেন এক চিরস্থির অপরাহ্নের শান্ত অনুজ্জ্বল আলোকে রহস্য-গভীর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার গল্পে প্লট নাই, রং নাই, কোন মশলার স্বাদ-গন্ধ নাই,—একটি একাকারের ব্রহ্মাস্বাদ আছে; জীবনের উপরকার সকল তরঙ্গের তলদেশে যে ক্লান্ত-মন্থর, উদাসীন, উদ্দেশ্যহীন, অথচ কেমন একটা অর্থপূর্ণ একটানা স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহারই একরূপ চেতনা ঐ গল্পগুলিতে উদ্রিক্ত হয়। অতএব, এমন গল্পকে আমাদের ঐ আদর্শের অধীন করিয়া বিচার করা চলিবে না; এমন কি, সেগুলিকে গল্প নাম না দিয়া আর কোন নাম দিতে পারিলে ভাল হয়। চেহভের গল্প পড়িয়া বিলাতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা প্রশংসায় মুখর হইয়াছেন, তার কারণ, য়ুরোপীয় মনীষিগণ এক্ষণে আর জীবনের আর্ট-সুন্দর রহস্যরূপ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, তাহার সেই দশমহাবিদ্যারূপের বন্দনা করিয়া তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সেই রূপের অন্তরালে একটা শান্ত-শিব-সত্য কিছুকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইয়াছে। একজন বলিতেছেন—

It is as though he (Tchehov) understood that not only life was so, but also that it must be so, as though he knew a secret. And the secret, as all secrets must be, is very simple, so simple that we cannot recognise it; we can recognise only a strange enchantment in what he shows us, a strange haunting quality in his words. We look and listen and we feel that we are trembling on the brink of knowledge so incredible that it cannot be.

—ইহা নিশ্চয় সাহিত্যরস-আস্বাদন নয়; লেখকের ঐ ভাষাও অধ্যাত্ম-দর্শনের ভাষা। এই যে জীবনের রহস্যভেদ ও তাহা হইতে একটা আধ্যাত্মিক

অনুভূতি, এইরূপ metaphysical প্রেরণা ছোটগল্পের প্রেরণা নয়; এমন রচনায় form-এর প্রয়োজন কি? কারণ, রং বা রেখার সাহায্যে জীবনের কোন বিশিষ্ট চিত্র উহাতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না—আকারের পরিবর্ত্তে একাকারের একটা তত্ত্বরস বা বিচিত্র চেতনা সঞ্চার করাই উহার কাজ। এজন্য আমি ছোটগল্পের ঐ form এবং তাহারই রসকে আমার বিচারে মুখ্য স্থান দিয়াছি; ছোটগল্পে ঐরূপ তত্ত্ব-অনুভূতির অবকাশ থাকিলেও আমি এখানে তাহার বিচার করিব না; কেবল একটি কথা মনে রাখিতে বলি,—সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মত, ছোটগল্পেরও রস-বৈচিত্র্য অল্প নহে, এজন্য কোথাও বা ঐ form মুখ্য না হইয়া গৌণ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বিদেশী গল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে যে কবিদৃষ্টির পরিচয় আছে—মানুষের ব্যক্তি-চরিত্রের বিরূপতা, কামনা ও প্রবৃত্তির বিচিত্র-বিকাশ, ক্ষুদ্র ঘটনা ও তুচ্ছ কারণে হৃদয়-মনের কত অজানিত দ্বার খুলিয়া যাওয়া,—এই সকলের রস-পরিবেশনে ঐ form-টাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। একথাও সত্য যে, জীবনের বাস্তবকে আশ্রয় না করিলে—কেবল সূক্ষ্ম ভাব ও স্বকীয় অনুভূতির গৌরব প্রদর্শন করিলে ঐ formটাকে লঙ্ঘন করিতে হয়, তজ্জন্য—ইংরেজিতে যাহাকে grip বলে—ছোটগল্পে তাহা থাকে না।

একজন বিখ্যাত আধুনিক ইংরেজ কথা-শিল্পী তাঁহার নিজের রচনার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করি,—তাহার সহিত আমার কথাগুলির অনেকখানি মিলিবে, তিনিও ঐ form-এর কথা বলিয়াছেন; তবে আমি উহার যে অর্থ করিয়াছি তিনি সেইরূপ একটা বিশেষ অর্থ না করিয়া সরাসরি ও সাধারণ ভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন—

> "I wanted to write stories that procceded, tightly knit, in an unbroken line from the exposition to the conclusion. I saw the short story as a narrative of a single event, material or spiritual, to which by the elimination of everything that was not essential to its elucidation a dramatic unity conld be given.
>
> In short I preferred to end my short stories with a full stop rather than with a straggle of dots."
>
> "From the familiarty with Maupassant that I gained at an early age, from my training as a dramatist and perhaps from personal idiosyncrasy, I have. it may be, acquired a sense of form that is pleasing to the French. At all events they find me neither sentimental nor verbose."

[W. Somerset Maugham—*The Summing Up.*]

(৪)

এইবার আমার এই অনুবাদ-গল্পগুলির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই দীর্ঘ আলোচনা শেষ করিব। প্রথম গল্প 'নর্ত্তকী' সম্বন্ধে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, আমি এই গল্পটির নামেই বইখানির নামকরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ইহার কারণ কি, তাহা গল্পটি পড়িলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। গল্পটি একটি লিরিক-গাথা বলিলেই হয়। মানব হৃদয়াকাশের বর্ণমাধুরীই ইহার রস-বস্তু—এ রস একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পে আমরা আস্বাদন করিয়াছি। তথাপি, অনুভূতির সূক্ষ্মতর পেলবতা ও গভীরতা সত্ত্বেও, ইহাতে যে খাঁটি নাটকীয় করুণ-রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনটি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহার পর, কয়েকটি গল্পে, পুরুষ-চরিত্রের যে কঠিন পৌরুষ-মহিমা আমাদিগকে বিস্মিত করে তাহাও ছোটগল্পের ঐ বাঁধুনিকে সার্থক করিয়াছে। সেদিক দিয়া আমি 'ক্রৌঞ্চ-মিথুন' নামক গল্পটিকে এই সংগ্রহের শ্রেষ্ঠগল্প বলিয়া মনে করি। উহাতে যে সৈনিকের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, সেই পুরাতন সংস্কৃত বচন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' একটা কবি-সুলভ অত্যুক্তি নয়, এমন কি, উহার জন্য লোকোত্তর-চরিত্র কোন মহাপুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক হয় না। এমন পাপের কথাও যেমন কোন শাস্ত্রে নাই, তেমনই তাহার শাস্তি বহন করিতে যুগপৎ যে দৃঢ়তা ও কোমলতা ঐ চরিত্রকে একটি নৈসর্গিক মহত্ত্বে মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা অভাবনীয়; অথচ, এই গল্পে বাস্তব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার বাঁধুনিও যেমন, আর্টও তেমনই অনবদ্য। 'পিঁপড়ায়-মানুষে'-নামক গল্পটিতে এরূপ হৃদয়-বলের পরিচয় নাই বটে, তথাপি একটা অশ্রুতপূর্ব্ব এবং প্রায় অতিপ্রাকৃত ঘটনার সম্মুখ-সঙ্কটে পুরুষের যে দুর্জ্জয় সংকল্প এবং ততোধিক দুর্জ্জয় যে সহ্য-গুণ উহাতে চাক্ষুষ করি, তাহা য়ুরোপীয় জাতি-বিশেষের চরিত্রেই সম্ভব। একটি লোমহর্ষণ ঘটনাই এই গল্পের অতি-সহজ আকর্ষণ হইলেও, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ঘটনাটাই ইহার সর্ব্বস্ব নয়; ঐ ঘটনা এমন ভাবে নাট্যীকৃত হইয়াছে যে, ঐটুকু কালের মধ্যে একটা পূরা নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে—নাটকের সবগুলি অঙ্গ-সন্ধি উহাতে রহিয়াছে। এজন্য কেবল একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবৃতি হিসাবেই নয়—উৎকৃষ্ট ছোটগল্প হিসাবেও ইহা অনবদ্য। আরও দুইটি গল্পে পুরুষ-চরিত্রের যে অভাবনীয় বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহাদের সেই অস্বাভাবিকতাই কেমন করিয়া স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে তাহাই চিত্ত-চমৎকারের কারণ। 'জল্লাদ'-গল্পটিতে একটা বিশেষ সমাজের আভিজাত্য-

সংস্কার, যে অবস্থায় এবং যে অনিবার্য্য ঘটনা-সংস্থানে পিতৃহন্তাকেও একটা মহাযজ্ঞের ঋত্বিকরূপে, এবং পিতাকেও যে ট্র্যাজিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে, তাহা ঐ ছোটগল্পের বাঁধুনিতেই সম্ভব। এই গল্পের ঐ পরিসরে যে পারিপার্শ্বিক এবং যে দৃশ্য-যোজনা আছে—অনাবশ্যকের বাহুল্য-বর্জ্জন ও অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির চয়নে যে একাগ্র-দৃষ্টি ও সংযত কল্পনার পরিচয় আছে, তাহা বিস্ময়কর। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ছোটগল্পের ফ্রেমে বাঁধা না হইলে, ঘটনা ও চরিত্রের সংযোগে ঐ রস এমন দীপ্তি লাভ করিত না, ঐ সমাপ্তিই উহাকে এমন মহিমা দান করিত না। ইহার সহিত 'বিচার' গল্পটির তুলনা করা যাইতে পারে। সেখানে পিতাই জল্লাদ হইয়াছে; কিন্তু এ গল্পের পারিপার্শ্বিক এবং সমাজ কত ভিন্ন! দুই পিতার মনোভাবও কত স্বতন্ত্র! একজন বংশের আভিজাত্য-গৌরব স্থায়ী করিবার জন্য পুত্রকে পিতৃহত্যায় সম্মত করিল, আর একজন বংশের কলঙ্ক-ভয়ে নিজেই নিজেকে নির্ব্বংশ করিল। দুইটি গল্পে একই মনুষ্য-চরিত্রের দুই বিপরীত বিকাশ লক্ষ্য করা যায়,—একটিতে একটা কৃত্রিম সামাজিক সংস্কার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, আরেকটিতে সমাজ-শাসন-মুক্ত আদিম মনুষ্য-প্রকৃতি একটা আদিম বীর্য্য-সংস্কারের বশে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে পুরুষ-আত্মারই একটা দুর্জ্জয় রূপ দেখিয়া আমরা হত-চকিত হইয়া যাই। এই দুইটি গল্পের আর্টও বিষয়-বস্তুর অনুরূপ; একটিতে নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের বা কলা-কৌশলের যেমন পরাকাষ্ঠা আছে, তেমনই অপরটির রচনা-ভঙ্গি অতি মাত্রায় স্বচ্ছ ও সরল, একেবারে প্রাকৃতিক বলিলেও হয়। ইহাকেই ষ্টাইল বলে, অতএব দুই গল্পেরই ষ্টাইল উৎকৃষ্ট। আমার মনে হয়, বিদেশী ছোটগল্পের ভাণ্ডারে এমন গল্প বেশী নাই। এইখানে ঐ দ্বিতীয় গল্পটির অনুবাদ-প্রসঙ্গে বাধ্য হইয়াই আমাকে একটা কথা বলিতে হইল। এই বিখ্যাত গল্পের একটি বাংলা অনুবাদ সম্প্রতি একখানি গল্প-সঞ্চয়ন পুস্তকে দেখিতে পাইলাম। অনুবাদ পড়িয়া আমি শিহরিয়া উঠিয়াছি। ইংরেজী বিদ্যা, বাংলা-জ্ঞান এবং রসবোধ এই তিনের অপূর্ব্ব মিলনে উহা যে কি বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিবার নয়। প্রকাশকের তাগিদে অর্থাৎ পুস্তক-ব্যবসায়ের হিতার্থে বাঙ্গাল পাঠককে বিদেশী সাহিত্যের রস এমনই করিয়া পান করানো হইতেছে!

আমার এই সঞ্চয়নে মোপাসাঁর (Guy de Maupassant) একটিমাত্র গল্প আছে, নাম—'সাগরিকা'। স্থান কাল, ও পাত্রগত একটা situation বা ঘটনা-সন্ধি এই গল্পটিকে এমন সরস করিয়াছে। গল্পটি একটু sentimental

হইয়া উঠিতেই লেখক তাহা কেমন সামলাইয়া লইয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য ; কারণ মোপাসাঁ একজন প্রকৃতিবাদী (Naturalist), তাঁহার জীবন-দর্শনে ভাব-প্রবণতার অবকাশ নাই। কিন্তু ঐ গল্পে মনুষ্য-জীবনের যে নিয়তির কথা আছে তাহা—সার্ব্বজনীন বলিয়াই নহে—একটি বিশেষ ঘটনায়, বিশেষ চরিত্রে ও বিশেষ পরিণামে এমন রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ ছোটগল্পের সেই দৃষ্টিগত formই উহার কারণ।

এইবার আরও কয়েকটি গল্পের উল্লেখ করিব। 'ডাক্তারের কীর্ত্তি' নামক গল্পটিতে একটা বীভৎস-রসের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ঐ ঘটনাটিকে ঠিক ঘটনা বলা যায় না, উহা এক বিকৃত-মস্তিষ্ক পুরুষের একটা আকস্মিক ও হৃদয়হীন কুকীর্ত্তি—গল্পটি যেন তাহারই একটা বিবরণ। অতএব ইহাতে 'চরিত্র'ও নাই ; এমন গল্পকে মাত্র একটা কাহিনী বলাই সঙ্গত। আর্টের দিক দিয়াও গল্পটি নির্দ্দোষ নয়, কারণ উহাতে একটা উগ্র নীতিবাদের উত্তেজনা আছে, শেষের দিকে লেখকের সুস্পষ্ট উক্তি ও মনোভাব উহার রস-রূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—গল্পটি যেন একটা নূতন পাপের দৃষ্টান্ত মাত্র। তথাপি এমন কাহিনীরও একরূপ চিত্তাকর্ষণ আছে, পাঠকগণ তাহা স্বীকার করিবেন। অতএব গল্প-নির্ব্বাচনে সব সময়ে আদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলে না, কোন একপ্রকার চিত্ত-চমৎকার সৃষ্টি করিতে পারিলেও তেমন রচনার মূল্য আছে। এই চিত্ত-চমৎকার বা চমকের সৃষ্টি কয়েকটি গল্পে আরও সূক্ষ্ম কৌশলে করা হইয়াছে। এগুলির প্রত্যেকটিতে আর্টের নৈপুণ্যই লক্ষণীয়—form-এর বিশেষ প্রয়োজন নাই। তার কারণ, এ গুলিতে জীবনের কোন একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা কোন একটা রসই মুখ্য—ঘটনা বা চরিত্র মুখ্য নয়। এইজন্যই আমি ছোটগল্পের-আদর্শ নির্ণয়ে কোনরূপ সংজ্ঞার পক্ষপাতী নই। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ছোটগল্পের উৎকর্ষ-বিচারে (সাধারণ ভাল-মন্দ বিচারে নয়) ঐ form-এর কথাটা আসিয়া পড়ে—মীমাংসার পক্ষে সুবিধা হয়। উহার অভাবে অনেক সুকল্পিত গল্পও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। 'দেয়াল-ভাঙ্গা' গল্পটির ঐ form-ই সর্ব্বস্ব। 'তারা-হারা' গল্পটিও একটি অপূর্ব্ব রচনা। প্রথম, ইহার কল্পনা-বীজ হইয়াছে একটি কবি-সুলভ উপমা। সেই কল্পনাও বাস্তবের জবানীতে হাস্যরসযুক্ত হইয়া যেমন উদ্ভট তেমনই নিত্য-পরিচিতের সমান হইয়া উঠিয়াছে। উহার রসটা আসলে বাস্তবেরই রস, প্রেমেরই একটা বাস্তব-চিত্র ; মেয়েটির চরিত্রও অতিশয় জীবন্ত। উহাতেও একটা বাঁধুনির আভাস আছে। অতএব, ছোটগল্প যে কত ছোট

হইতে-পারে এই গল্পটি তাহারও নিদর্শন। কিন্তু 'খোলা-জানালা' গল্পটিতে লেখকের বাহাদুরী আরও বেশী; একটা রীতিমত trick বা জুয়াচুরী করিয়া তিনি এই গল্পে যে রসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্বই বটে; নিছক fun বা তামাসার মত হইলেও, উহার ঐ practical joke করুণার উদ্রেকও করে; আরও একটি যে রস অতি নিপুণভাবে ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে এবং যাহার জন্য গল্পটি এমন দানা বাঁধিয়াছে, তাহা ঐ ভৌতিক আবহাওয়া। একটি ক্ষুদ্র গল্পের সঙ্কীর্ণ পরিসরে এতগুলি ভাবের সমাবেশ এবং সর্ব্বোপরি ঐ মেয়েটির নিষ্ঠুর রঙ্গপ্রিয়তা ও আশ্চর্য্য পটুতা এই রচনাটিকে বড়ই উপভোগ্য করিয়াছে। 'সোনা-পোকা' নামক গল্পটিতে আর এক প্রকার রস ছোটগল্পের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইহাতেও চরিত্র বলিতে বিশেষ কিছু নাই, চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে এক অসাধারণ বিশ্লেষণী বুদ্ধি, এবং ঘটনাটি হইয়াছে—একটা সামান্য সূত্র ধরিয়া দুর্ভেদ্য-রহস্য-ভেদ ও গুপ্তধনের আবিষ্কার। কিন্তু ইহারও আর্ট নির্দ্দোষ নহে, কেবল সমস্ত ব্যাপারটির অতি-নিপুণ কার্য্য-কারণ-সঙ্গতি এবং লেখকের উদ্ভাবন-শক্তি আমাদিগকে মুগ্ধ করে। এই গল্প একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের প্রসিদ্ধ রচনা; ইনি য়ুরোপীয় গল্প-সাহিত্যে একটা নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মানুষমাত্রেরই স্বভাবে দুর্জ্ঞেয় রহস্য-বস্তুর প্রতি যে একটি প্রবল আকর্ষণ আছে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ছোটগল্পের আকারে যে রসসৃষ্টি সম্ভব, এই গল্প তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানে রহস্য অপেক্ষা রহস্য-ভেদের ঐ প্রণালীটাই অধিকতর চমকপ্রদ হইয়াছে। 'লায়লা-মজনুঁ'র উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। দুই কারণে এই রচনাটি এই সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে, প্রথম, উহা একটি জগৎ-প্রসিদ্ধ কাব্য-কাহিনী; দ্বিতীয়, এই রচনাটি হইতে প্রাচীন কাহিনী ও আধুনিক গল্প-সাহিত্যের পার্থক্য অতিশয় স্পস্ট হইয়া উঠিবে। তা ছাড়া, এমন বিশুদ্ধ কাব্যরসের কাহিনীও এতগুলি ছোট-গল্পের মধ্যে আপন মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিবে—রসেরও বৈচিত্র সম্পাদন করিবে। 'বসন্ত-দিনের স্বপ্ন' নামক রচনাটিও ছোটগল্প নয়; একটি উপকথাকে আশ্রয় করিয়া লেখক যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাহার সেই কাব্যময় ভাবুকতাই রস-হিসাবে উপভোগ্য; তাই স্বাদ-বৈচিত্র্যের জন্য এটিকেও ত্যাগ করি নাই।

'ধর্ম্ম-প্রচার' নামক গল্পটির রস একটু স্বতন্ত্র। এই গল্পটিতেও বিখ্যাত ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রান্সের কল্পনা-শক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। অতীতকালের কেবল ঐতিহাসিক চিত্রই নয়—তেমন ঐতিহাসিক গল্প ও

উপন্যাস অনেকেই লিখিয়াছেন,—সেই কালের, অর্থাৎ একটা বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজের দেহ, প্রাণ এবং আত্মাটিকে পর্য্যন্ত এমন করিয়া আমাদের চক্ষুগোচর করা হইয়াছে যে, মনে হয়—আমরা যেন সেই কালের সেই সমাজেই বাস করিতেছি, অথবা প্রত্যক্ষদর্শী পর্য্যটকের মত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সব দেখিতেছি ও শুনিতেছি। পাশ্চাত্য সমালোচক ইহাকে 'Renanism' নাম দিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাকে 're-conquest of antiquity' বা "লুপ্ত অতীতকে পুনরুদ্ধার করা" বলিয়াছেন। কিন্তু এ গল্পের রস সাধারণ পাঠক হয়তো সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না; ঐ যুগের রোমক ইতিহাস এবং খ্রীষ্টের জীবন-কাহিনী যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারাই ইহার সূক্ষ্ম কারিগরি দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। আমি অনুবাদের ভাষায় যথাসম্ভব সেই রস রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 'অধঃপতন' ও 'শাস্তি' নামক গল্পদুইটির সম্বন্ধে, আশা করি, আমার কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই; শেষেরটিতে আছে সর্ব্ব-সমাজের সেই এক পারিবারিক ট্র্যাজেডির একটি মর্ম্মান্তিক চিত্র; অপরটিতে আছে—সভ্যতা-ক্লান্ত, কৃত্রিম বিলাস-ব্যসন-বিড়ম্বিত, স্বর্ণমৃগ-সন্ধানী, আধুনিক বণিক-শাসিত পাশ্চাত্য-সমাজের অন্তরাত্মার ক্রন্দনধ্বনি,—যক্ষপুরী হইতে উদ্ধারলাভের আকুল কামনা। এই দুইটি গল্পেরই form ছোটগল্পের পক্ষে কিঞ্চিৎ জটিল হইয়াছে, এজন্য এ দুইটিকে খাঁটি ছোটগল্প না বলিয়া বৃহত্তর ছোটগল্প বলাই সঙ্গত। এখানেও গল্পের রস form-এর উপযোগিতাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রথম গল্পটিতে এইরূপ হইবার একটা কারণ, উহাতে একটা সজ্ঞান প্রতিবাদের অধৈর্য্য লেখকের রস-প্রেরণাকে স্বচ্ছন্দ হইতে দেয় নাই। কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, আমরা এই যে 'ছোটগল্পে'র সমালোচনা করিতেছি, ইহাতে সর্ব্বত্র রস-সৃষ্টির দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি, অর্থাৎ আমি খাঁটি সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিতেছি। তথাপি এই গল্পের প্রকৃতি-চিত্র-অঙ্কনে যে লিরিক রসাবেশ অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় উৎসারিত হইয়াছে, এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা—সামাজিক সংস্কারমুক্ত সরল অকপট রস-সম্ভোগের যে নিদর্শন—বিশেষ করিয়া ঐ প্রৌঢ় পুরুষটির চরিত্রে ও জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এমন এক অভিনব জীবন-রস-রসিকতার পরিচয় পাই, যাহা রচনার ঐরূপ গঠনেই সম্ভব। আধুনিক সাহিত্যে জীবনকে দেখিবার যে এক নূতন ভঙ্গি এবং তজ্জন্য রস-সংবেদনার যে পন্থা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কোথাও আর সেই form-এর প্রয়োজন স্বীকৃত হয় না; ইহাকে 'আর্ট'-পন্থা না বলিয়া 'জীবন'-পন্থা বলাই সঙ্গত।

সর্ব্বশেষে, আর একটি গল্পের পরিচয় দিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। গল্পটির নাম 'মরুর মায়া'। এই গল্পটি পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন—ইহার রস কিরূপ অদ্ভুত। বাল্‌জাকের এই গল্পটিতে ফরাসী প্রকৃতিবাদী (Naturalist) লেখকদের মূলমন্ত্রটি পূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের মতে, সৃষ্টির সর্ব্বত্র এক শক্তির লীলা অব্যাহত রহিয়াছে; মূক জড়পদার্থ—ভৌগোলিক ভূমি, আকাশ, সমুদ্র, এবং নিখিল জীব-জগৎ একই রহস্য-রস-সূত্রে বাঁধা। চেতনে-অচেতনে, মূক ও মুখরে, জন্তু ও নর-নারীতে, সেই এক শক্তি একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্রতায় যে অখণ্ড নাটকের অভিনয় করিতেছে তাহারই নাম—জীবন। এই জীবনকে চিত্রিত করিতে হইলে, ইহার যত-কিছু ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দৃশ্য ও অদৃশ্য রূপ তেমনই সমগ্রতায় চিত্রিত করিতে হইবে। এই গল্পে তাহাই করা হইয়াছে; ইহাতেও মূক জড়-প্রকৃতিরূপা ঐ মরুভূমি, পশুজগতের ঐ বাঘিনী এবং মানবজাতির প্রতিনিধি ঐ সৈনিক—এই তিনে মিলিয়া একটি অখণ্ড-জীবনের নাটক অভিনয় করিতেছে। মরুভূমি, মানুষ ও পশু এই তিনই উহার পাত্র-পাত্রী, নাটকের রস-পরিণতির জন্য ঐ তিনের ত্রিবিধ প্রকৃতি পরস্পরের পরিপূরক হইয়াছে; এবং ঐ পুরুষ-মনুষ্য এবং ঐ স্ত্রী-ব্যাঘ্রী এই দুইয়ের দেহ-রহস্য যে একই, প্রাণের গূঢ়তম পিপাসায় দুইজনের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, ব্যাঘ্রীও মানবীতে পরিণত হইয়াছে,—তাহাই ঐ একটি ঘটনায় লেখক যে আশ্চর্য্য নৈপুণ্যসহকারে ঘটাইয়াছেন, তাহার মত বিস্ময়কর কিছু আমি সাহিত্যে আর কোথাও দেখি নাই। মরুভূমির ভীষণ শূন্যতা ও তাহার নিঃশব্দ-গম্ভীর সুবিরাট সত্তা মানুষটাকে আচ্ছন্ন করার ফলেই ঐ ঘটনা যে সম্ভব হইয়াছে, লেখক সেই তত্ত্বটিও বিশেষ করিয়া আমাদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য, আপত্তির যদি কোন নৈতিক কারণও থাকে, তথাপি গল্প-সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিটি আমার সঞ্চয়নের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়া আমি বড়ই সন্তোষলাভ করিয়াছি।

গল্পগুলির পরিচয় শেষ করিলাম। সমালোচকের কাজ যথাসাধ্য সম্পন্ন করিলেও অনুবাদকের কাজ কতটুকু সফল হইয়াছে তাহা নিজ মুখে বলিবার উপায় নাই। তথাপি আর একবার দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই দীর্ঘ ভূমিকার উপসংহার করিব। 'ছোটগল্প' কি বস্তু, তাহার সরাসরি উত্তর না দিয়া, আমি প্রথমে তাহার একটা আদর্শ-স্থাপনের জন্য

উহার যে form বা বাঁধুনির ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা যদি সহজ-বোধ্য না হয়, ছোটগল্পের এই বিবিধ ও বিচিত্র সংকলন হইতেই আমি পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহা বুঝিয়া লইতে বলি,—সেগুলির সমালোচনাতেও আমি বারবার ঐ form-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি; তাহাতেই গল্পগুলি পড়িবার পর উহার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। আর একটি কথা, আমি এই যে গল্পগুলি ভাগ্যক্রমে—আদৌ কোন অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের বশে নয়—নিজেরই রস-পিপাসার বশে অনুবাদ ও সঞ্চয়ন করিতে পারিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে খুব জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বিদেশী গল্পের এমন সঞ্চয়ন—একই স্থানে এতগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের সমাবেশ কোন ইংরেজী সঞ্চয়নেও এ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। আরও দাবি এই যে, ভাষার ইডিয়ম ও রস যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া, যে আদর্শে আমি এই অনুবাদ ও সঞ্চয়ন করিয়াছি তাহাতে এই গ্রন্থখানি বাংলা গল্প-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবে এ বিশ্বাস অসঙ্গত নয়,—অনুবাদক নয়—সমালোচক হিসাবেই আমি এই উক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

সম্পাদনে একটা বড় ত্রুটি রহিয়া গেল, দুইটি গল্পের লেখকের নাম প্রকাশিত করা গেল না; তার কারণ, অনুবাদের সময়ে সেদিকে লক্ষ্য ছিল না, পরে বইগুলি পুনরায় সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হওয়ায় নাম দুইটি অজ্ঞাত হইয়া রহিল। এজন্য এই সংস্করণে, কোন্‌টি কোন্ ভাষার—সূচিপত্রে কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবে। আর একটি কথা জানাইবার আছে; এই সংগ্রহের তিনটি গল্প ('পিঁপড়ায়-মানুষে', 'সোনা-পোকা' ও 'শাস্তি') আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীমান্ মথুরেন্দ্রনাথ নন্দী এম-এ, আমার উপদেশে ও তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করিয়াছেন—তাঁহার এই সাহায্য আমি আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

বড়িশা (২৪ পরগণা),
১লা বৈশাখ ১৩৩০।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নর্ত্তকী

[পূর্ব্বভাস :—পূর্ব্বকালে জাপানী চিত্রকরদের শিক্ষালাভ হইত সমস্ত দেশটা পায়ে হাঁটিয়া পরিভ্রমণের দ্বারা ; সেখানে যত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, যত পুরাতন বৌদ্ধ-মন্দির ও তাহাদের ভিতর-বাহিরের যত কারুকার্য্য—সেই সকলই স্বচক্ষে দেখিয়া রঙে ও রেখায় চিত্রিত করিতে হইত। এই সকল চিত্রে আমরা শিল্পীর নিজস্ব অন্তর্ভূতির রংটিও পাই ; কোন এক বিশেষ ঋতুতে, কোন বিশেষ স্থানে, একটি বিশেষ ক্ষণে তাহার মনে যে বিশেষ ভাবটির উদয় হইয়াছিল, চিত্রে তাহাই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ঐরূপ চিত্রাবলীতে কল্পনার অতীত কিছুও থাকে, তাহাতে আমাদের চিত্তে একটি অনন্তভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়, একটা এমন কিছুর চকিত আভাস ফুটিয়া উঠে যাহা আমাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসাকে তৃপ্ত হইতে দেয় না। জাপানী চিত্রকর যত চিত্র করে তাহা হুবহু বাস্তব-চিত্র নহে—স্মৃতি ও ভাব-জগতের বস্তু, যদিও তাহাতে একটা বাস্তব স্থান-কাল-পাত্রের গূঢ় রস-সংবেদনাও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। এই জন্য, যাঁহারা ঐ দেশ এবং ঐ সকল দৃশ্য দেখেন নাই, তাঁহারা জাপানী চিত্রশিল্পীর এই যাদুশক্তির সম্যক ধারণা করিতে পারিবেন না। এই গল্পটিতে তাহার প্রমাণ আছে।]

(১)

সে অনেকদিনের কথা। একজন শিক্ষার্থী তরুণ চিত্রকর পার্ব্বত্যপথে পায়ে হাঁটিয়া কিয়োতো হইতে ইয়েদো-নগরের দিকে চলিয়াছিল। সেকালে রাস্তা বেশি ছিল না, যাহা ছিল তাহাও দুর্গম। দেশটার সাধারণ চেহারা আজিকার মতই ছিল ; ঠিক এমনই পাইন ও সিডার-গাছের বন, বাঁশের ঝাড়, পাহাড়ের মাথায় মাথায় গ্রাম, ঘরগুলি খড়ে-ছাওয়া ; একটার উপর আরেকটা—যেন থাকে-থাকে ধানের ক্ষেত, তাহার মধ্যে কাদার উপরে ঝুঁকিয়া চাষীরা কাজ করিতেছে—মাথায় একরকম ঘাসে-বোনা হলুদবর্ণের প্রকাণ্ড টোকা। পথের পাশে সর্ব্বত্র 'জিজো'-দেবতার মূর্ত্তি,—তাহাদের সম্মুখ দিয়া, আজিকার মতই, যাত্রীর দল তীর্থ-মন্দিরে গমন করিত।

যুবকের এ সকলই জানা ও দেখা আছে, তাহার এই দেশ-ভ্রমণ নূতন নয়। তবু একদিন সন্ধ্যাকালে সে এমন এক স্থানে পৌছিল যেখানকার দৃশ্য দেখিয়া মনে হয় না যে, নিকটে কোথাও রাত্রিবাস বা আহারের উপায় হইবে; চতুর্দিকে কোথাও চাষের ভূমি দেখা যায় না। স্থানটা তাড়াতাড়ি পার হইবার জন্য পথ-সংক্ষেপ করিতে গিয়া সে একেবারে পথ হারাইয়া ফেলিল।

মুক্ত আকাশের নীচেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে এইরূপ স্থির করিয়াছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, সে যে-পাহাড়টার উপরে উঠিয়াছে তাহার বিপরীত দিকে, ঢালু ভূমির একস্থানে একটিমাত্র পীত আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছে—নিশ্চয় কোন বাস-গৃহ! সেই দিকে পদচালনা করিয়া নিকটে আসিয়া দেখিল, একটা কুটীরই বটে—কোন কৃষকের হইবে। একটিমাত্র দরজার সামান্য একটু ফাঁক দিয়া সেই আলোর রেখা তখনও বাহির হইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ দ্বারে করাঘাত করিল।

(২)

কয়েকবার করাঘাত এবং ডাকাডাকি সত্ত্বেও প্রথমে কোন সাড়া মিলিল না; পরে ভিতর হইতে একটী স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেল—"কি চাই?" কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট; আরও বিস্ময়ের কারণ—তাহার উচ্চারণ ভদ্র সমাজের মত, বাক্‌ভঙ্গিও রাজধানীর মার্জ্জিত ভাষার। উত্তরে যুবক জানাইল, সে একজন ছাত্র, পাহাড়ের মধ্যে পথ হারাইয়াছে; রাত্রিটার জন্য একটা বিশ্রাম-স্থান ও কিছু খাদ্য পাওয়া যাইবে কিনা,—না গেলে, সবচেয়ে নিকট গ্রাম কোনদিকে ও কতদূর তাহা বলিয়া দিলেও উপকৃত হইবে; ইহাও বলিল যে, পথ দেখাইয়া দিবার যদি কেহ থাকে তাহাকে সে বকশিস দিবে।

কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন, উত্তর শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন—যুবক যে-দিক হইতে যে-প্রকারে ঐ কুটীরে পৌছিয়াছে, তাহা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু আরও দুই একটি প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া বোধ হয় বিশ্বাস হইল, কারণ শেষে বলিলেন, "আমি এখনই আসিতেছি; আজ রাত্রে কোন গ্রামে পৌছিবার চেষ্টা না করাই ভালো, পথ অতিশয় বিপদসঙ্কুল।"

একটু পরে সেই একটি মাত্র বহির্দ্বার খুলিয়া গেল। রমণীর হাতে একটি কাগজের লণ্ঠন—এমন ভাবে ধরিয়া আছেন যে, তাহার আলো অতিথির মুখেই পড়িতেছে, নিজের মুখ অন্ধকার। বেশ ভাল করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রমণী বলিলেন "একটু অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।" একটু পরেই পদপ্রক্ষালনের জন্য একটি জলপাত্র লইয়া আসিলেন, দরজার চৌকাঠের উপরে তাহা রাখিয়া যুবকের হাতে একখানি তোয়ালে দিলেন। যুবক পাদুকা খুলিয়া পায়ের ধুলাকাদা ধুইয়া ফেলিল, তারপর যে ঘরখানিতে প্রবেশ করিল—বাড়ী বলিতে সেই একখানি ঘর—খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোনখানে একটু ময়লা নাই ; পিছনের দিকটায় কাঠের মেঝে একটু উঁচু-করা, সেইখানেই রন্ধনাদি হয়। গৃহস্বামিনী একখানি 'জাবুতন' (সুতী-চাদর) পাতিয়া দিলেন, যুবক তাহার উপরে হাঁটু মুড়িয়া বসিল ; তাহার সম্মুখে একটি পিতলের অগ্নিপাত্রও রক্ষিত হইল।

এতক্ষণে স্ত্রীলোকটিকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ মিলিল। তাহার রূপ দেখিয়া যুবক চমকিত হইল ; বয়স তাহার অপেক্ষা তিন কি চারি বৎসর অধিক হইবে, এখনও পূর্ণ যৌবন। চাষার ঘরের মেয়ে নয়—নিশ্চয়। সেই অপূর্ব্ব মধুর কণ্ঠে রমণী তাহাকে বলিলেন, "আমি একা থাকি, কোন অতিথি অভ্যাগত আমার গৃহে স্থান পায় না। কিন্তু আজ রাতে আপনি আর কোথাও গেলে প্রাণের আশঙ্কা আছে। কিছুদূরে কয়েক ঘর কৃষক আছে বটে, কিন্তু আপনাকে পথ দেখাইয়া দিবে কে? এইজন্য আমি আপনাকে কাল রাত্রি-প্রভাত পর্য্যন্ত আমার কুটীরে আশ্রয় দিতেছি। আপনার কষ্ট হইবে, কিন্তু একটা বিছানা আমি আপনাকে দিব। আপনার বোধ হয় খুব ক্ষুধা পাইয়াছে, আমার ঘরে মাত্র কিছু 'সুজনি রিওরি' * আছে—সুখাদ্য নয়, কিন্তু আমি সাদরে তাহা নিবেদন করিতেছি।"

পথিকের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছিল, ঐ আহারের প্রত্যাশায় সে প্রফুল্ল হইল। তখন তরুণী গৃহকর্ত্রী একটি ছোট আগুন জ্বালাইয়া নীরবে কয়েকটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিলেন, একটি বাটিতে মোটা চাউলের ভাত ও সেই খাদ্যগুলি অতিথির সম্মুখে স্থাপন করিয়া আতিথেয়তার ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। আহার কালে অতিথির সহিত আঁর একটি কথাও কহিলেন না, তাহাতে যুবক একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সে মাঝে মাঝে দুই একটি যে প্রশ্ন করে, ঐ

* একরূপ নিরামিষ খাদ্য—বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর আহার।

তরুণী কখনো একটু মাথা নাড়িয়া, কখনো বা একটী মাত্র কথায় তাহার উত্তর দেয়। যুবকটি আর আলাপের চেষ্টা করিল না।

এই অবসরে যুবক ঘরখানির ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। কোনোখানে একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্নমাত্র নাই, সব ঝকঝক তকতক করিতেছে। বেশবাস ও তৈজসাদি রাখিবার তোরঙ্গগুলি সাদা কাগজের তৈয়ারী, তাহাদের গায়ে সুন্দর করিয়া আঁকা চীনা-অক্ষরের সারি, ইহাও একরূপ শিল্পকর্ম্ম; যে সকল বস্তু কবি ও চিত্রকরের প্রিয়, ঐ অক্ষরগুলিতে তাহারই সঙ্কেত আছে, যথা—বসন্তের পুষ্পরাজী, পর্ব্বত ও সমুদ্র, নিদাঘের বৃষ্টিধারা, আকাশ ও তারকাপুঞ্জ, শারদ চন্দ্র, নদীস্রোত, শরতের সমীরোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি। ঘরের একপাশে একটি নাচু বেদীর মত রহিয়াছে, তাহার উপরে একটি 'বুৎসুদান'—তাহার গালার-তৈয়ারী ছোট দরজা দুইটি খোলা রহিয়াছে, ভিতরে মৃত প্রিয়জনের একখানি স্মৃতি-ফলক দেখা যাইতেছে। সেই বুৎসুদানের সম্মুখে একটি বাতি জ্বলিতেছে, বাতিটি ঘেরিয়া একরাশি বনফুলের নৈবেদ্য। পূজাবেদীর ঊর্দ্ধে, গৃহের দেওয়ালে একখানি ছবি—নিতান্ত সাধারণ সস্তা ছবি নয়; ছবিখানি 'করুণা'-দেবীর, তাঁহার মাথার পশ্চাতে কিরণ-কিরীটের মত পূর্ণচন্দ্র আঁকা রহিয়াছে।

যুবকের আহার শেষ হইলে, রমণী তাহাকে বলিলেন, "আমি আপনাকে ভাল বিছানাও দিতে পারিব না, একটি কাগজের মশারি মাত্র আছে। ঐ বিছানা আর ঐ মশারি আমিই ব্যবহার করি। কিন্তু আজ রাতে আমার অনেক কাজ, ঘুমাইবার সময় পাইব না, অতএব আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাতেই ঘুমাইবার চেষ্টা করুন; আমি আপনার আরামের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলাম না!"

যুবক তখন বুঝিতে পারিল, কোন এক অজ্ঞাত কারণে ঐ নারী অতিশয় একা ও নির্জ্জনবাসিনী। আজ কেবলমাত্র দয়ার বশে সে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, একমাত্র শয্যাও তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছে। সে আপত্তি করিল, এত যত্ন সে চাহে না, একটু বেশী হইয়া পড়িতেছে—মেঝের উপরে একটা জায়গায় সে শয়ন করিবে, মশার ভয় সে করে না। তখন সেই রমণী তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত আদেশের ভঙ্গিতে সেই শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন। তাঁহার সত্যই একটা কাজ আছে, আর দেরী করিলে চলিবে না, এইবার তাঁহাকে বিদায় দিতে হইবে; অতএব তিনিও ভদ্রলোকের মত অনুরোধ পালন করুন, নতুবা তাঁহার অসুবিধা করা হইবে। অগত্যা যুবককে তাহাই করিতে হইল। গৃহকর্ত্রী

মেঝের উপরে একখানি তোষক পাতিয়া তাহাতে একটা কাঠের বালিশ রাখিলেন, পরে একটি কাগজের মশারি টাঙাইয়া দিলেন। সবশেষে সেই বুৎস্থদানের দিকে, ঘরের অপরাংশ আড়াল করিয়া একটা পর্দ্দা টানিয়া দিয়া এমন ভাবে বিদায় লইলেন যে, যুবকটি এখনই শয্যাগ্রহণ করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এইরূপ ভাবে পরের অসুবিধা করিয়া নিজে আরাম করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও যুবক ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া বড়ই তৃপ্তি বোধ করিল; সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল যে, কাঠের বালিশটায় মাথা রাখিবা মাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

তথাপি মনে হইল, অল্পক্ষণ ঘুমাইয়াছে—এমন সময়ে একটা অদ্ভুত শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শব্দটা যেন কাহার পায়ের শব্দ—যেমন দ্রুত তেমনই উত্তেজনাপূর্ণ। ভয় হইল, ঘরে ডাকাত প্রবেশ করে নাই ত? তাহার নিজের জন্য কোন ভয় নাই, কারণ হারাইবার কিছুই নাই। কিন্তু যে দয়াশীলা রমণী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার যদি কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে? প্রথমে সে চীৎকার করিতে চাহিল, পর মুহূর্ত্তে মনে হইল তাহাতে আরও বিপদ হইতে পারে, তাহার নিজের উপস্থিতি এখন না জানানোই সঙ্গত; তা ছাড়া, যদি সত্যই ডাকাত পড়িয়া থাকে, ঐরূপ চীৎকারে কোন ফল হইবে না। কাগজের মশারিটীর দুই পাশে দুইটি ছোট চৌকা ঘুলঘুলি আছে—সূতার জাল বসানো; তাহার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বাহিরের সেই পর্দ্দা সব আড়াল করিয়া রাখিয়াছে—ওপারে কি হইতেছে বুঝিবার উপায় নাই। পায়ের শব্দ তেমনই হইতে লাগিল, সে যেন আরও রহস্যপূর্ণ, আরও ভীতিপ্রদ। শেষে যুবক আর স্থির থাকিতে পারিল না, উপকারিণী গৃহকর্ত্রীকে রক্ষা করিবার জন্য সকল বিপদ তুচ্ছ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তখন নিজের কাপড় ভাল করিয়া আঁটিয়া সে নিঃশব্দে মশারির তলদেশ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, তারপর ধীরে ধীরে পর্দ্দার কিনারাটি তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেই যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

সেই বুৎস্থদানের চারিদিকে বাতি জ্বালাইয়া, এবং অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সেই নারী তাহার সম্মুখে একা নৃত্য করিতেছে! তাহার সেই পরিচ্ছদ দেখিয়া যুবক বুঝিতে পারিল, সে একজন 'শিরাবাইওসি'—যদিও সাধারণ

নর্ত্তকীর পোষাক অপেক্ষা এ পোষাক বহুগুণে মূল্যবান। একে অসাধারণ সুন্দরী, তাহার উপর, ঐ নির্জ্জন স্থানে, রাত্রিকালে, ঐরূপ আলোকে তাহার রূপ যেন অমানুষী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তদপেক্ষা বিস্ময়কর তাহার সেই নৃত্যকলা। সহসা একপ্রকার ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গ্রামের কৃষকদের মধ্যে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে—সেই 'শিয়াল-ডাকিনী' প্রভৃতির কথা—তাহার মনে পড়িল। কিন্তু, পরক্ষণে সম্মুখে পূজাবেদী ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ভয় দূর হইল, মনে মনে লজ্জিত হইল। সেই সঙ্গে ইহাও মনে পড়িল, এইরূপ লুকাইয়া দেখা অতিশয় গর্হিত হইতেছে ইহা নিশ্চয় তাহার আশ্রয়দাত্রীর অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ঐ দৃশ্য যেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাহার চলৎশক্তি হরণ করিয়াছিল, সে যেমন বিস্মিত তেমনিই কৃতার্থ বোধ করিতেছিল। এমন বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, এমন রূপবতী নর্ত্তকী আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। যতই দেখিতে লাগিল ততই সেই নৃত্যের অসাধারণ কলাকৌশল তাহাকে যেন আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। সহসা নৃত্য বন্ধ হইল, নর্ত্তকী যেন আর নিশ্বাস লইতে পারিতেছে না; কটিবন্ধন খুলিয়া ফেলিয়া সে যেমন মুখ ফিরাইয়া তাহার ঊর্দ্ধাঙ্গের বসন খুলিতে যাইবে, অমনি যুবকের উপরে চোখ পড়িতেই সে অতিমাত্রায় চমকিয়া উঠিল।

যুবক তখনই অপরাধ ক্ষালনের জন্য সকল কথা বলিল; তাহার নিদ্রাভঙ্গের কারণ, তাহার ভয় ও দুশ্চিন্তা, শেষে তাহার দুর্ম্মতি ও দুঃসাহসের কথা—সবই অকপটে তাহাকে বলিল। শেষে অনুতপ্ত কণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। সে আরও বলিল, তাহার বড়ই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি কে—কেমন করিয়া নৃত্য-কলায় এমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। সাকিও-সহরে যত বিখ্যাত নর্ত্তকী আছে, সে তাহাদের সকলেরই নৃত্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন নৃত্য আর কোথাও দেখে নাই। তাই একবার দেখিতে আরম্ভ করিয়া সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারে নাই।

নর্ত্তকীর মুখে প্রথমে বেশ অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল, এক্ষণে সব শুনিয়া সে-ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। সে বলিল, "না, আমি রাগ করি নাই, কিন্তু এইরূপ লুকাইয়া দেখার জন্য দুঃখিত হইয়াছি, কারণ, নৃত্য যতই ভাল হোক, ঐরূপ অবস্থায় তাহা দেখিলে যে-কেহ আমাকে পাগল মনে করিবে। অতএব, এখনই তোমাকে ইহার কারণ বলি।"

এইবার সে তাহার কাহিনী শুনাইল। তাহার নাম—যে-নামে সে নর্ত্তকীরূপে সাধারণ্যে পরিচিত ছিল—সে নাম অতি বালক-বয়সেই ঐ যুবক শুনিয়াছিল। সেকালে সে-নাম রাজধানীতে কে না জানিত? গুণিগণ-সমাজে এই নর্ত্তকীর সমাদরের অবধি ছিল না। তারপর হঠাৎ একদিন সেই খ্যাতি ও পূর্ণ রূপযৌবনের কালেই সে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, ক্রমে তাহার সেই নামও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। নর্ত্তকী বলিল, এক যুবকের প্রেমে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিল, যশ ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহার আর ভাল লাগিল না—সকলই সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া গেল। তাহার প্রণয়ী বড় দরিদ্র ছিল, তবু উভয়ের সামান্য সঙ্গতি মিলাইয়া দূরে পল্লীগ্রামে তাহাদের সচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। নির্জ্জন পার্ব্বত্য-প্রদেশে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দুইজনে বড় সুখে কয়েক বৎসর কাটাইল। যুবক তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, তাহার সবচেয়ে সুখের বস্তু ছিল—প্রিয়তমার সেই নৃত্য, আর কোন কামনা তাহার ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সে তাহার 'সামিসেন' (সেতার) লইয়া প্রিয়-সঙ্গীতগুলি বাজাইত, নর্ত্তকী তাহার সহিত সঙ্গত করিয়া নৃত্য করিত। এমনি করিয়া সকল দুঃখ সুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একবার শীত আর যায় না, বড় কঠিন শীত; সেই শীত সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার প্রণয়ী অসুখে পড়িল, বহু শুশ্রূষাতেও বাঁচিল না। সেই হইতে ঐ রমণী অতিশয় নির্জ্জনে বাস করে। মৃত প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া—তাহার আত্মাকে প্রেম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার যত অনুষ্ঠান আছে—সে তাহা পরম নিষ্ঠার সহিত পালন করে। প্রতিদিন সে তাহার স্মৃতি-ফলকটির সম্মুখে পূজা-উপচার সাজাইয়া দেয়, প্রতিরাত্রে পূর্ব্বের ন্যায় সে তাহার সম্মুখে নৃত্য করে। পথিক আজ রাতে যাহা দেখিয়াছে তাহার অর্থ ইহাই। যাহাতে অতিথির নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল, নৃত্যকালে অতি ধীরে পদক্ষেপ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। এজন্য সে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।

কাহিনী শেষ হইলে রমণী অতিথির জন্য একটু চা প্রস্তুত করিয়া একত্রে পান করিল। তারপর পুনরায় নিদ্রা যাইবার জন্য তাহাকে এমনই অনুনয় করিল যে, যুবক অগত্যা আবার সেই কাগজের মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

এবার আর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না। যখন জাগিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল, পূর্ব্বরাত্রের মত তাহার জন্য তেমনই সামান্য রকমের

খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। যুবকের ক্ষুধা পাইয়াছিল, তথাপি পাছে ঐ দরিদ্র নারীর আহার-কষ্ট হয়, এই ভাবিয়া অতি অল্পই আহার করিল। এইবার বিদায় লইতে হইবে। সে যখন তাহার আহার ও রাত্রিবাসের মূল্য-স্বরূপ গৃহস্বামিনীকে কিছু দিতে চাহিল, তখন সে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি যাহা করিয়াছি তাহা অর্থের জন্য নয়, দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছি। যাহা দিয়াছি তাহা এতই সামান্য যে তাহার মূল্যই বা কি? এইমাত্র প্রার্থনা, আপনি যে কষ্ট পাইয়া গেলেন তাহা ভুলিয়া কেবল ইহাই মনে রাখিবেন যে, একজন অতিশয় দীন-দরিদ্র জন তাহার সাধ্যমত আপনার সেবা করিয়াছিল।"

যুবক কোন রকমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইল। তাহার মনের গোপনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল—সে ঐ রমণীর কাছে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে, তাহার সেই রূপ ও মধুর ব্যবহার তাহাকে যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছে সে কথা আর কাহারও কাছে সে বলিতে পারিবে না।

রমণী তাহাকে তাহার পথ বুঝাইয়া দিল, এবং যতক্ষণ না সে পাহাড়ের নিম্নভাগে অদৃশ্য হইয়া গেল, ততক্ষণ দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় একঘণ্টা চলিবার পর যুবক বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তাহার আপশোষ হইল—সে সেই রমণীকে নিজের নাম ত' বলে নাই! একবার ভাবিল, ফিরিয়া যাইবে কি না, কিন্তু তখনই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "কাজ কি? আমি ত' চিরদিন এমনই দরিদ্র থাকিব।" এই বলিয়া সে আবার পথ চলিতে লাগিল।

(৩)

কত বৎসর কাটিয়া গেছে, ইতিমধ্যে কত নূতন ফ্যাশন উঠিয়াছে ও গিয়াছে। সেই তরুণ চিত্রকর এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার অপূর্ব্ব চিত্রকার্য্যে মুগ্ধ হইয়া কত ধনী ও জমিদার, কত রাজপুরুষ তাহাকে অর্থ ও উপঢৌকন দিয়া পরস্পরে প্রতি-যোগিতা করিয়াছে। এজন্য এখন তাহার ধনৈশ্বর্য্যের সীমা নাই; জাপানের শ্রেষ্ঠ নগরী, যাহার নাম 'সম্রাট-পুরী', সেইখানে একটি মনোরম অট্টালিকা

নির্ম্মাণ করিয়া সে বাস করিতেছে। কত দেশ হইতে কত চিত্রশিল্পী আসিয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, এমন লোক নাই যে তাহার নাম শোনে নাই।

একদিন তাহার সেই প্রাসাদ-দ্বারে এক বৃদ্ধা আসিয়া দাঁড়াইল, গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিতে চায়। তাহার দীন-দরিদ্র মূর্ত্তি ও মলিন বেশ দেখিয়া, একজন সাধারণ ভিখারিণী মনে করিয়া, দ্বারী তাহাকে অতিশয় রূঢ় ভাষায় বিদায় করিয়া দিল, বলিল, তাহার মনিব গৃহে নাই, 'সাইকিও'-শহরে গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন, তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু বৃদ্ধা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, প্রতিদিন আসিয়া গৃহস্বামীর সংবাদ লয়, এবং প্রতিবারে একটা না একটা মিথ্যা কথা শুনিয়া ফিরিয়া যায়। তথাপি সে প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে আসে, তাহার হাতে ছেঁড়া কাপড়ে-বাধা একটা কিসের পুঁটুলি। শেষে ভৃত্যগণ তাহার কথা প্রভুকে না জানাইয়া পারিল না। মনিব সে কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, বলিলেন, এতদিন তাহাকে বলা হয় নাই কেন? এই বলিয়া তিনি নিজে বাহির হইয়া ফটকের নিকটে গেলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া অতিশয় সদয় কণ্ঠে, সে কি চায়, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বৃদ্ধা বলিল, সে অন্ন না অর্থ কিছুই প্রার্থনা করে না, সে কেবল একখানি ছবি আঁকাইয়া লইতে চায়। শুনিয়া সেই বৃদ্ধ চিত্রকর একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অতঃপর তাহাকে লইয়া প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এইবার মেঝের উপরে বসিয়া বৃদ্ধা তাহার সেই পুঁটুলিটি খুলিতে লাগিল; খোলা হইলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি অতি পুরাতন জীর্ণ অথচ মূল্যবান পোষাক রহিয়াছে—রেশমের উপরে সোনার কাজ-করা; বহুদিনের ব্যবহারে সুতাগুলি ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। তবু সে এক অপূর্ব্ব পোষাক—সেকালের নর্ত্তকীরা ঐরূপ পোষাক পরিত।

বৃদ্ধা বড় যত্নের সহিত ভাঁজ খুলিয়া, কম্পিত অঙ্গুলি দ্বারা তাহার খাঁজগুলি সমান করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তখন সেই পোষাকের পানে চাহিয়া মহাশিল্পীর মস্তিষ্ক মধ্যে একটা অতিদূর স্মৃতির ক্ষীণ আলোড়ন আরম্ভ হইল; পরক্ষণেই সবটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তাঁহার মনশ্চক্ষে একটা

অতীত চিত্র জাগিয়া উঠিল—সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্যভূমি, সেই নিরালা কুটির; সেই সদয় অতিথি-সৎকার; মনে পড়িল, সেই ছোট ঘরখানিতে সেই কাগজের মশারী, এবং একটিমাত্র শয্যায় অতিথির শয়ন-রচনা; সেই দীপালোকিত ক্ষুদ্র পূজাবেদী, তাহার সম্মুখে একাকিনীর সেই নৃত্য। তখন সেই বৃদ্ধ চিত্রকর—রাজগণেরও সম্মান-ভাজন সেই পুরুষ—নতজানু হইয়া বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলেন। সে তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। অতঃপর বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "আমাকে আপনি ক্ষমা করুন, কেবল মুহূর্ত্তের জন্য আমার ভুল হইয়াছিল—আমি আপনার মুখ স্মরণ করিতে পারি নাই। কিন্তু সে আজ চল্লিশ বৎসরের কথা, আপনাকে সেই একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। এখন আমি সকলই স্মরণ করিতেছি। আপনি একদিন আমাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনার একটি মাত্র শয্যা শয়নের জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। আমি আপনার নৃত্য দেখিয়াছি, আপনার কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি নৃত্যব্যবসায়িনী ছিলেন, আপনার নাম আমি ভুলি নাই।"

বৃদ্ধ শিল্পাচার্য্য যে সব কথা বলিয়া গেলেন, বৃদ্ধা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। বড় দুঃখে কষ্টে তাহার জীবন কাটিয়াছে, তাহার স্মৃতিশক্তিও ক্ষীণ হইয়াছে, তাই সে কিছুই বলিতে পারিল না। অতিশয় স্নেহার্দ্র কণ্ঠে, আবার সকল কথা—সে যাহা যাহা করিয়াছিল, সেই যুবকটির নিকটে সে নিজের যে কাহিনী বলিয়াছিল, সেই সব কথা—প্রত্যেকটি স্মরণ করাইবার পর, তাহার মনে পড়িল, চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তখন সে বলিয়া উঠিল, "যিনি ঊর্দ্ধ হইতে দীনের প্রার্থনার সাড়া দেন, তিনিই তাহা হইলে পথ দেখাইয়া আমাকে আপনার দুয়ারে লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমার কুটীরে আপনার মত মহৎ ব্যক্তির পায়ের ধূলা যখন পড়িয়াছিল তখন অভাগিনীর অবস্থা এমন ছিল না। ভগবান বুদ্ধের কি অপার মহিমা, নহিলে আমাকেই বা আপনি স্মরণে রাখিবেন কেন!"

ইহার পর, বৃদ্ধা তাহার ইতিহাস বলিল। দিন দিন তাহার দারিদ্র্য বাড়িতে লাগিল, অবশেষে সে তাহার ক্ষুদ্র গৃহখানি ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আশ্রয়সন্ধানে আসিয়াছিল। তখন সকলে তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার নামও কেহ জানে না। গৃহখানি হারাইয়া তাহার যত কষ্ট হইয়াছে তাহারও অধিক কষ্ট এই যে, জরা তাহাকে বড়ই দুর্ব্বল করিয়াছে—সে আর প্রতিরাত্রে

বুৎসুদানের সম্মুখে নৃত্য করিতে পারে না; আর সে তাহার পরলোকবাসী হৃদয়বল্লভের আত্মার তর্পণ করিতে পারে না। তাই সে তাহার নর্ত্তকীবেশ-পরিহিত মূর্ত্তির একখানি ছবি আঁকাইয়া লইতে চায়। ছবিখানি সে বুৎসুদানের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিবে। দেবতার নিকটে তাহার কেবল এই একটিমাত্র প্রার্থনা। সেইজন্য সে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের শরণাপন্ন হইয়াছে, কারণ, সে ছবি যেমন-তেমন হইলে চলিবে না, বড় কারিগরির প্রয়োজন—নহিলে মৃতজনের তৃপ্তি হইবে না। তাই সে তাহার পোষাকটিও সঙ্গে আনিয়াছে, কারণ শিল্পাচার্য্যমহাশয় হয় ত' সেই পোষাকেই তাহার ছবি আঁকিতে ইচ্ছা করিবেন।

শিল্পীপ্রবর স্মিতমুখে সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যেমনটি চান আমি ঠিক সেইরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া দিব। কিন্তু একটি কাজ বাকী আছে, আজই শেষ করিতে হইবে। আপনি যদি কাল আসেন আমি আপনার মনোমত চিত্র আমার সাধ্যমত আঁকিয়া দিব।"

তখন বৃদ্ধা বলিল, "কিন্তু একটা কথা শিল্পাচার্য্য মহাশয়কে এখনও বলা হয় নাই, তাহাই মনে করিয়া আমি কষ্ট পাইতেছি। আমি ঐ চিত্রখানির পরিবর্ত্তে আর কিছুই দিতে পারিব না, কেবল ঐ পোষাকটি আপনি রাখিবেন। উহার কোন মূল্য আর নাই জানি, কিন্তু এককালে উহা সত্যই মূল্যবান ছিল। তা'ছাড়া, পুরাকালের একটা বিচিত্র দ্রব্যহিসাবেও আপনি উহা রাখিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন—একালে আর 'শিরাবাইওসি' নাই, 'মাইকো'রা অন্যরূপ সাজ করিয়া থাকে।"

"আপনি সে জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার নিকটে যে-ঋণে ঋণী আছি তাহার সামান্য একটু পরিশোধ করিতে পারিলেও কৃতার্থ বোধ করিব। তাহা হইলে, আপনি কাল আসিবেন, আমি ঠিক ঐরূপ একখানি ছবি আঁকিয়া দিব।"

শিল্পাচার্য্যের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বৃদ্ধা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল, তারপর বলিল, "প্রভু, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমার ইচ্ছা নয় যে, আপনি আমার এখনকার এই মূর্ত্তি অঙ্কিত

করেন ; আমি একদা যেমন ছিলাম—আমার সেই যৌবনকালের মূর্ত্তি—আপনি যেমন দেখিয়াছিলেন—তাহাই যেন চিত্রিত করেন।"

চিত্রকর বলিলেন, "আমার মনে আছে, আপনি তখন পরমাসুন্দরী ছিলেন।"

বৃদ্ধার বলি-অঙ্কিত মুখমণ্ডল আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, এই কথা শুনিয়া সে আবার নত হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। তারপর একটু উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তবে আমার সকল কামনাই পূর্ণ হইবে! প্রভুর যখন স্মরণ আছে, তখন আমি অনুনয় করি, তিনি যেন আমার সেই যুবতী-বয়সের ছবিই আঁকিয়া দেন—এই জরাজীর্ণ মূর্ত্তি নয় ; কারণ, সেই বয়সে আমি যে কুশ্রী ছিলাম না তাহা আপনিও অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; শিল্পীশ্রেষ্ঠ আপনি—আমাকে আবার যুবতী করিয়া দিন! আমাকে যাহাতে সুন্দরী দেখায় আপনি তাহাই করুন! সেই একজনের জন্য আমি এই একটিমাত্র ভিক্ষা করিতেছি—তাহার চক্ষে আমি যেন সুন্দরী হইয়াই থাকি। ঐ ছবি দেখিয়া সে-ও খুসী হইবে—আর যে আমি নৃত্য করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারি না, সে অপরাধ সে ক্ষমা করিবে!"

মহাশিল্পী পুনরায় তাহাকে আশ্বাস দিলেন, "কাল আসিবেন, আমি আপনার ছবি আঁকিব ; আপনাকে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী শিরাবাইওসি, আমি তাহাই আঁকিয়া দিব। দেশের মধ্যে সবচেয়ে ধনী যে—তাহার ছবি আমি যেমন যত্ন করিয়া আঁকি, আপনার ছবি তেমনই করিয়া আঁকিব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি কাল আসিবেন।"

(৪)

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৃদ্ধা নর্ত্তকী চিত্রকরের গৃহে আগমন করিল। চিত্রকর একখানি অতি কোমল রেশমী-বস্ত্রের উপরে তাহার ছবি আঁকিলেন। আচার্য্যের শিষ্যগণ তাহার যে-রূপ দেখিয়াছিল সে-রূপ নহে ; তিনি তাঁহার স্মৃতি হইতে তাহার সেই পূর্ব্ব-রূপ পুনরুদ্ধার করিলেন। বিহঙ্গিনীর মত চঞ্চল দুইটি চক্ষু, বেণুলতার মত তন্বী, রেশম ও জরীর পোষাকে সে যেন আকাশচারিণী অপ্সরীর মতই জ্যোতির্ম্ময়ী। ওস্তাদ-শিল্পীর যাদু-তুলিকার স্পর্শে সেই বিগত যৌবন-শ্রী

যেন ফিরিয়া আসিয়াছে, অপনীত লাবণ্য উছলিয়া উঠিয়াছে। 'কাকেমোনো' খানি শেষ হইলে শিল্পী তাহাতে নিজ স্বাক্ষর মুদ্রিত করিলেন, তারপর একখানি রেশম-নির্ম্মিত পট-পীঠিকার উপরে তাহাকে বসাইয়া, দুইপ্রান্তে দুইটি উৎকৃষ্ট সিডার-কাঠের উন্মোচন-দণ্ড বাঁধিয়া দিলেন; সেই দণ্ডের ভার-বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি হস্তীদন্তনির্ম্মিত দোলকও তাহাতে সংযুক্ত করিলেন; ঝুলাইবার জন্য একটি রেশমের রজ্জুও রহিল। তারপর চিত্রখানি একটি শ্বেতবর্ণের কাষ্ঠ-পেটিকায় আবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধার হস্তে অর্পণ করিলেন, সেই সঙ্গে তাহাকে কিছু অর্থও দিতে চাহিলেন। সে কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিল না, অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়া উঠিল, "আমার আর কিছুই চাই না, আমি কেবল ঐ ছবিখানিই চাহিয়াছিলাম—উহারই জন্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল। এ জীবনে আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি আমার প্রাণে তাহা বুঝিয়াছি; ইহাও জানিয়াছি, যদি মৃত্যুকালে আমার সকল বাসনার অবসান হয়, তবে ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় আমি পাইব। কেবল একটি কথা ভাবিয়া আমি স্বস্তি পাইতেছি না, ঐ পোষাকটি ছাড়া মহাশিল্পীকে দিবার মত আমার যে আর কিছুই নাই! উহার মূল্যই বা কি? তবু ঐ নর্ত্তকীর পোশাকটি লইবার জন্য আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি! প্রতিদিন আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করিব, আপনার জীবন যেন সুখময় হয়; দুঃখিনীর প্রতি আপনার এই দয়া আমি কখনই ভুলিব না।"

চিত্রকর তাহা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, "আমি কিছুই করি নাই। তবু যদি ঐ পোষাকটা লইলে আপনি সুখী হন, আমি তাহা লইতেছি। উহা দেখিলেই আমার সেই রাত্রির কথা স্মরণ হইবে, যে-রাত্রে আপনি আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া এক দরিদ্র বিপন্ন পথিকের অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন—তজ্জন্য একটি পয়সাও লইতে স্বীকৃত হন নাই। আমি এখনও আপনার নিকটে ঋণী। এখন বলুন, আপনি কোথায় থাকেন, আমি নিজে গিয়া আপনার ঘরে স্বহস্তে এই ছবি টাঙাইয়া দিব" আসল কথা, চিত্রকর ঐ বৃদ্ধার দারিদ্র্যদুঃখ মোচন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা কিছুতেই তাহার ঠিকানা জানাইল না, বলিল, "তেমন স্থানে আপনার মত ব্যক্তির যাইতে নাই।" তারপর ভূমিষ্ঠ-প্রণাম করিয়া বহু ধন্যবাদ দিয়া, আনন্দাশ্রু মোচন করিতে করিতে, তাহার সেই সর্ব্বস্ব-ধন হাতে লইয়া প্রস্থান করিল।

চিত্রকর তাঁহার এক ভৃত্যকে গোপনে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে বলিলেন, সে যেন তাহার ঠিকানা জানিয়া আসে। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিল, এবং কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিল, "হুজুর, আমি তাহার পিছু পিছু গিয়া নগরের বাহিরে নদীর শুষ্ক খাতটার ধারে পৌছিলাম—সেই যেখানে শ্মশান আছে তাহার নিকটে। সেইখানে একটা কুঁড়ে-ঘরে ঐ বৃদ্ধা বাস করে। বলিব কি হুজুর, সে একটা পোড়ো ভিটা—জনপ্রাণী নাই, চারিদিক নোংরা।"

"সে যেমনই হোক, কাল তুই আমাকে লইয়া যাইবি। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, তাহাকে আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের কষ্ট পাইতে দিব না।"

তার পর তিনি সকলকে সেই শিরাবাইওসির কাহিনী বলিলেন, তাহা শুনিয়া কেহ আর তাঁহার এই আচরণে বিস্ময় বোধ করিল না।

(৫)

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পরে, এক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া আচার্য্য সেই শুষ্ক খাতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন—সেখানে অন্ত্যজেরাই বাস করে।

ছোট ঘরখানির প্রবেশ-পথ একটি মাত্র কাঠের পাল্লা দিয়া বন্ধ রহিয়াছে। কয়েকবার মৃদু করাঘাত করিয়া কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন তাহা ঠেলিয়া, সেই ছিদ্রপথে মুখ দিয়া তিনি ডাকিতে বলিলেন, তাহাতেও কেহ উত্তর দিল না। তখন নিজেই সেই দুয়ার ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কি যেন অনুভব করিয়া তাঁহার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইল—ঠিক যেমনটি বহুকাল আগে আর একদিন তাঁহার হইয়াছিল—যেদিন এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য-ভূমির পথভ্রান্ত পথিক আর এক কুটীরদ্বারে এমনই করাঘাত করিয়াছিল। গৃহমধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি শুইয়া রহিয়াছে, যেন ঘুমাইতেছে। তাহার অঙ্গে একখানি মাত্র বসন, যেমন সূক্ষ্ম তেমনই জীর্ণ। একখানি কাঠের তক্তার উপরে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই 'বুৎসুদান'টি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন; তখনও যেমন, এখনও তেমনই তাহার ভিতরে সেই স্মৃতি-ফলকটি রহিয়াছে—দেবমূর্ত্তির সম্মুখে একটি ছোট প্রদীপ জলিতেছে। করুণা-দেবীর সেই পূর্ণচন্দ্র-কিরীটী ছবিখানি আর নাই। পূজাবেদীর সম্মুখস্থ দেওয়ালে, ঠিক তাহার মুখামুখি, তাঁহার দেওয়া সেই অতি-যত্নের উপহার

ঝুলানো রহিয়াছে, এবং ঠিক তাহারই নীচে একটি দেবীমূর্ত্তি—'হিতো-মোতো-কোয়াম্নন'-এর বিগ্রহ। এই দেবীর নিকটে কেবল একবার একটি মাত্র প্রার্থনা করিবার বিধি আছে—দ্বিতীয়বার করিলে দেবী ক্রুদ্ধ হন। কুটীরমধ্যে আর কিছুই নাই—কেবল তীর্থযাত্রীর ধুলিমলিন কন্থা, এবং একটি দণ্ড ও কমণ্ডলু পড়িয়া আছে।

কিন্তু শিল্পাচার্য্য তখন সে সকল দেখিতেছিলেন না, নিদ্রিতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তিনি তাহাকে সুসংবাদ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; আশ্বাসপূর্ণ মৃদুকণ্ঠে দুইতিন বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

সহসা বুঝিতে পারিলেন, বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু তখনই তাহার সেই মৃত-মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না—সে মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন যেন আর নাই! তৎপরিবর্ত্তে একটি অস্ফুট মাধুর্য্য—যেন অপগত যৌবনের একটা উপচ্ছায়া—তাহাতে ভাসিয়া উঠিয়াছে; যেন তাঁহা অপেক্ষাও কোন বড় শিল্পী—কোন্ মহা-যাদুকর—সে মুখ হইতে দুঃখশোকের সকল চিহ্ন, জরার যতকিছু বলি-রেখা মুছিয়া দিয়াছে!

এই ভাল বাস?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ?
রব অচেতন রূপেরি শাসনে,
তুমি বসি' রবে আপন আসনে—
নেহারিবে শুধু চারু কারুকলা,
শত-বরণের সাজ?

দিবে কি আমারে চির-যৌবন,
হরিবে কি মোর জরা?
কণ্ঠে আমার ফুরাবে না সুর?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর?
রবে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
চিরদিন মধুভরা?

লায়লা মজনু

[ফারসী কবি নিজামীর বিখ্যাত কাব্য 'লায়লা মজনু'র ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে। য়ুরোপীয় কাব্যে সেক্সপীয়রের 'রোমিও-ও-জুলিয়েটে'র স্থান যেমন, এসিয়ার সাহিত্যে 'লায়লা-মজনু'র স্থান তেমনই। সেখানে যাহা নাটক, এখানে তাহা খাঁটী গীতি-কাব্য। ইহার আখ্যানবস্তুও একটি গীতিকাহিনী, শুধু তাহাই নয়, এই কাব্যের অন্তরালে একটি মিষ্টিক ভাব-সঙ্কেত আছে, পাঠকালে সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।]

লায়লা! আঁধার নিশীথের মুক্তাবিন্দু লায়লা!

সন্ধ্যাবেলার পূর্ণিমা চাঁদ যেমন, লায়লার রূপ ছিল তেমনই। সাইপ্রেস-তরুর মত ছিল তার সুকুমার দেহলতা—রাতের বাতাসে দুলে ওঠে, তারার আলোয় সর্ব্বাঙ্গ চিকমিক্ করে। চুল ত' না—যেন একরাশ জমাট অন্ধকার! চোখদুটি ছিল আলোর কালো, সেই আলোই যেন চাহনিখানির উপর ছায়া করে' রয়েছে। উষার অরুণিমার মত তার হাসি—ঠোঁটদুখানিকে আরও রঙীন করে দিত। শেষে যখন তার যৌবনের দুয়ারে প্রেম এসে দাঁড়াল দুঃখের পর্দাটি আড়াল করে', তখন তার সেই রূপ ফুটে উঠেছে—স্বর্গের পুষ্পোদ্যান থেকে তোলা একটি গোলাপ-ফুলের মত। সেই প্রেমই যেন তাকে বুকে চেপে দলে' ছিঁড়ে ফেললে, যেন আহ্রিমানের হাত থেকে সেই গোলাপ কেড়ে নিলে ওরমুজদ, তাই সে শীর্ণ বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে গেল।

লায়লা এসেছিল রাত্রির দেশ থেকে—রাত্রির মত ছিল তার অপরূপ রূপ, সে ফিরে গেল আলোর দেশে। তার কবরের উপর সেই সাইপ্রেস-গাছটি ছিল, তার কানে নৈশ-সমীরণ যখন সেই প্রেম-কাহিনীর মৃদু মর্ম্মর তুলত, তখন আকাশের তারারাও যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে নীচের পানে চাইত, আর ডেকে বলত—"লায়লা ত' হারিয়ে যায়নি; সে আমাদের থেকে জন্মেছিল, আমাদের মাঝেই ফিরে এসেছে। একবার উর্দ্ধে চাও—আরও উর্দ্ধে, রাত্রি যেখানে স্বচ্ছ আভাময় হয়ে উঠেছে সেইখানে লায়লা বসে' আছে, লায়লা রয়েছে বলেই জায়গাটার এত আলো!"

যেমন চাঁদের ছায়া সকল নদীর বুকে পড়ে, চাঁদ কিন্তু একটাই—তেমনি লায়লার রূপ সকল পুরুষকে সমান পাগল করেছিল। তার পিতা ছিলেন একজন বড় সর্দ্দার বা কুলপতি; লায়লার রূপের কথা শুনে' কত রাজা, কত রাজপুত্র তাঁর দ্বারস্থ হ'ল, কিন্তু কাউকে মনে ধরল না লায়লার। ধন-দৌলত রাজ-ঐশ্বর্য্যও যাকে জয় করতে পারলে না, তাকে জয় করলে শেষে এক তরুণ যুবা, নাম তার কায়েস। তার বাপ ছিল ইমেন-দেশের সর্দ্দার; সেই কায়েসকে সে তার তনু-মন আপনা হ'তেই সমর্পণ করলে।

লায়লার বাপের সঙ্গে ঐ ইমেন-কুলপতির সদ্ভাব ছিল না, দুই বংশে ছিল বহুকালের বিবাদ। যদিও এখন আর তা বাইরে প্রকাশ পেত না, তবুও কোথাও কোন উপলক্ষে দেখা হ'লে, পরস্পর অভিবাদন করবার সময় চোখের দৃষ্টিতে সেই শত্রুতা চেপে রাখা যেত না। এর ব্যতিক্রম হয়েছিল শুধু একবার —যখন ঐ কায়েস এক উৎসবের দিনে লায়লাকে প্রথম দেখতে পায়; দু'জনেই দু'জনের পানে চেয়ে রইল, দুজনেই বাক্যহারা; চোখের সাথে চোখ মিলতেই দুজনেরই প্রাণ থর-থর করে' কেঁপে উঠল।

সেই মুহূর্ত্ত থেকে কায়েস যেন একেবারে বদলে গেল। সে আর ঘোড়ায় চড়ে' শিকার করতে যায় না; যখন ভোজে বসতে হয় সকলে মিলে, কিম্বা যখন দলপতিদের দরবারে হাজির থাকতে হয়, তখন সে কারো সঙ্গে কথা কয় না, দূরে একধারে বসে' থাকে; তার চোখে সর্ব্বদাই যেন কেমন একটা আলো! তাকে কোন খেলায় যোগ দেওয়াতে পারে না তার বন্ধুরা, কোন তরুণী তাকে আর খুসী করতে পারে না। তার প্রাণ এখন যে বাড়ীতে বাস করছে, সে তার নিজের বাড়ী নয়।

আর লায়লা? সেও যখন তার সখীদের মাঝখানে বসে থাকে,—কারো সঙ্গে কথা কয় না, চোখদুটি চেয়ে থাকে মাটীর পানে। একদিন এক তরুণী সহচরী তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে, বীণা তুলে নিয়ে একটি গান গাইলে; এ সেই ফোয়ারার গান, গভীর অরণ্যের মাঝখানে যে ফোয়ারা আছে; যার ধারে চাঁদনী-রাতের রূপালী জ্যোৎস্নায় প্রেমিকের সাথে প্রেমিকার মিলন হয়। গান শেষ হ'লে সে একবার মাথাটি তুলে সখীর পানে চাইলে, সেই গান আবার গাইতে বললে, তারপর আবার। এর পর প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায়, সূর্য্য পাটে বসতেই, সে বেরিয়ে পড়ত তার পিতার প্রাসাদ-ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান-

বাটিতে ; যত দিন যায় ততই তার ভ্রমণের পরিধিটাও বড় হ'তে থাকে ; শেষে একদিন—সে দিন জ্যোৎস্নায় যেন ফিনিক ফুটছে—সে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পড়ল, তার পরেই অরণ্য। কিন্তু জ্যোৎস্নার যে শেষ নেই, যতদূর চাও জ্যোৎস্না! সেইখানে দাঁড়িয়ে সে চেয়ে রইল সামনের দিকে—বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে ; হঠাৎ তার চোখে পড়ল, দূরে একটা খোলা-জায়গায় চাঁদের আলো পড়েছে, তার ঠিক মাঝখানে এক ফোয়ারা—সেই আলোয় তার সর্ব্বাঙ্গ ঝকমক করছে। তখনই মনে পড়ল তার সেই সখীর গান, এ সেই ফোয়ারা—গানের কথায় বীণার সুরে যা' অবিস্মরণীয় হয়ে আছে! ঐখানে কতকাল হ'তে কত প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন-মিলন হয়েছে, তারা পরস্পরকে চির-প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সে কি তাহ'লে না-জেনে এরি সন্ধানে এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে? মনে হতেই তার সারাদেহে একটা শিহরণ হ'ল, গাল দুখানি যেন তেতে উঠল, বুকের ভিতর দুর-দুর করতে লাগল। তখনই সে ফিরে দাঁড়াল, তারপর ছুটে চলে গেল তার পিতার সেই প্রাসাদে—বড় লজ্জা হ'ল তার।

সে প্রাসাদ যেমন বড় তেমনই উঁচু, সে যেন কোন সুলতানের রাজপ্রাসাদ। তারই একটা উচ্চ কক্ষে একটি জানলার ধারে প্রায়ই বসে' থাকে লায়লা ; তার নীচে বাগানের গাছগুলির কেবল মাথাই দেখা যায়। সেই ঘরে সে থাকত, আর থাকত একজোড়া বড় সুন্দর সাদা-রঙের পায়রা। এই কপোত-কপোতী তার অনেকদিনের সাথী ; তারা কখনো তার কাঁধের উপর বসে' আস্তে আস্তে ঠোঁট দিয়ে গালে টোকা দিত, আর সোহাগ ভরে ডাকত—কূ-কূ ; কখনো বা ঐ কাঁধের উপরেই কত রকম করে' তাদের ডানা ঘ'ষত, আর ঐ এক সুরে কূজন করত—কূ-কূ-কূ। ডাকলেই তারা হাতের উপর এসে বসে, হাত থেকে খাবার খুঁটে নেয়। লায়লা যখন একটিকে বুকে চেপে রেখে অপরটিকে জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিত, তখন সেই ছাড়া পাখীটা বুঝতে পারত, এবার তাকে উড়ে গিয়ে বসতে হবে ঐ গাছের ডালটিতে। সেখান থেকে সে তার বন্দী সাথীটার উদ্দেশে যখন কাতর কণ্ঠে কূ-কূ করে' ডাকত, তখন অপর পাখীটা লায়লার বুকের কাছে ছটফট করত ; লায়লা আরও কিছুক্ষণ তাকে ধরে' রেখে' শেষে আর পারত না—ছেড়ে দিত। কপোতী যেই তার সাথীর পাশে উড়ে গিয়ে বসত, অমনই লায়লা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে' উঠত—"আহা! প্রেমের যদি পাখা থাকে, তবে এমনি করেই একজন অপর জনের কাছে উড়ে যায়। আমার যে পাখা নেই!" তবু ঐ পায়রার পায়ে বেঁধেই একদিন যে আকুল-করা

প্রেম-লিপি পাঠিয়েছিল তার মনোচোর, তাতেই সে আশায় আশঙ্কায় অধীর হয়ে অভিসার করেছিল সেই মিলন-তীর্থে—সেই নির্জ্জন ফোয়ারার ধারে।

কায়েস এখন কেবলই নির্জ্জনে বসে' চিন্তা করে, সে চিন্তার শেষ নেই। একদিন হঠাৎ তার মনে পড়ল লায়লার সেই শাদা পায়রা দুটির কথা—সে কথা ওদেশের সকলেই জানত। মনে পড়তেই সে কনুইএর উপর ভর করে' উঠে বসল তার পালঙ্কে, তারপর আপন মনে বলতে লাগল "আমি যদি নিজেই তার বাপের কাছে গিয়ে বলি, আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও, তার কি জবাব পাব আমি? যদি নিজে না গিয়ে আর কাউকে দূত করে পাঠাই, তবে তারই বা অভ্যর্থনা হবে কি রকম—কে জানে? তার চেয়ে যদি ওই পায়রা-দুটির একটিকে—শোনা যায়, তারা জান্‌লা দিয়ে লায়লার ঘরের ভিতরে উড়ে যায়, একেবারে তার বুকের কাছটিতে ঘেঁসে বসে।" পায়রার কথা একমনে চিন্তা করতে করতে কায়েস একবার তার অনুগত ভৃত্য জায়েদকে ডেকে পাঠালে। জায়েদ বড় প্রভুভক্ত, ডাকবামাত্র ছুটে এল।

তখন কায়েস বললে, "আচ্ছা, জায়েদ, তুই ত' জানিস—বসরা-সর্দ্দারের ঘরে একজোড়া শাদা পায়রা আছে? তাদের একটা, মনিব-কুমারীর আদেশে বাইরে উড়ে যায়, তারপর যখন সে দূর থেকে ক্রমাগত কূ-কূ করে ডাকতে থাকে, তখন ঘরের ভিতরে সেই আরেকটাও ছাড়া পায়, উড়ে চলে যায় তার সাথীর কাছে।"

"খুব ভাল করেই জানি, হুজুর! সে দু'টি যে পোষা-পায়রা, তারা ঐ মনিব-কন্যার হাতের উপরে আপনি এসে বসে।"

"তোর হাতেও অমনি করে' উড়ে এসে বসবে বলে' মনে হয়?"

জায়েদ চাকর হ'লেও মনিবের বন্ধুর মত ছিল; কায়েসের সেই গোপন ব্যথা সে জানত, তাই এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে নিজেই আর একটা প্রশ্ন করলে,

"ঐ পায়রা-দুটী কি আপনার চাই, হুজুর? আমার বাপ ছিল একজন বনচর, আমিও বনে-বনেই মানুষ হয়েছি; পায়রার চেয়ে অনেক না-ধরা-দেওয়া পাখী আমি ধরেছি গাছে গাছে ফাঁদ পেতে; একেবারে হাতে করে' ধরার বিদ্যাও আমি জানি।"

"তা' হ'লে তুই ওর একটাকে ধরে' এনে দে—দেখিস, খুব সাবধান! যেন তার কোথাও একটুও না লাগে—একখানি পালকেও না।"

জায়েদ মিথ্যা বড়াই করে নি; তিনদিনের দিন সন্ধ্যাবেলায় সে লায়লার সেই পায়রার একটাকে ধ'রে এনে তার প্রভুর হাতে দিলে। কায়েস তার গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়ে ভয় ভাঙিয়ে দিলে। তারপর জায়েদকে ধরতে বলে, আর একটা পায়ে একটুকরো কাগজ জড়িয়ে বেঁধে দিলে। তাতে এই কবিতাটি লেখা ছিল—

"অমল-কোমল কপোতী এ নয়—তোমারি হৃদয়খানি
ধরা দিল বুঝি? আজ পাইয়াছি তাকে;
আনিয়াছে বহি' সবটুকু প্রেম, তোমার বুকের বাণী—
বসেছিল সে যে অদূর তরুর শাখে।

ফিরে আর তুমি পাবে না তাহারে, দিব না ফিরায়ে আর,
আমারি আলয়ে চিরদিন যেন থাকে;
তবু সে পশিবে শ্রবণে তোমার কাতর কূজন কার?
কে ঐ কাঁদিছে অদূর তরুর শাখে!

প্রেমের তীর্থ আছে এক ঠাঁই—বিজনে ফোয়ারা ঝরে,
আমি যাব সেথা আজিকে নিশির ডাকে;
এসো মোর পাশে, উড়ে এসো প্রিয়া—প্রেমেরি পাখার ভরে,
কপোতী যেমন অদূর তরুর শাখে।"

এদিকে লায়লা সেই জানালাটিতেই বসেছিল—বসন্তের আতপ্ত রাত্রির মধ্যে কপোত-দম্পতির একটিকে ছেড়ে দিয়ে, অপরটিকে বুকের 'পরে চেপে ধরে' বসেছিল সে; কান পেতে শুনছিল দূর থেকে সেই কূ-কূ-রব আসে কি না। কিন্তু গাছের সেই ডালটি থেকে আজ আর কেউ ডাকলে না, বুকের পাখীটা ঝটপট করছে; লায়লা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে জানলার বাহিরে মাথা বাড়িয়ে শুনতে লাগল, কই কেউ ত' ডাকে না! এ কেমন হ'ল? কোথায় গেল সে? এমন ত' আগে কখনো হয় নি! পাখীটা গাছের ডালের উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল না কি?

চাঁদ ক্রমেই গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে আকাশের আরও উপরে উঠেছে, চারদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। লায়লা বসেই আছে, তবুও পায়রার সেই কাতর কূজন ভেসে এল না। শেষে এর কারণ বুঝতে না পেরে, সে তার সেই বুকের পায়রাটিকে ধীরে ধীরে চাপড়াতে লাগল, কত মিষ্টি কথা বলতে লাগল

তাকে। তারপর তাকেও ছেড়ে দিলে সেই রাত্রির আকাশে, যেন তার সাথীকে খুঁজে আনতে পাঠিয়ে দিলে।

পাখীটা সোজা গাছের দিকে উড়ে গেল। সেই ডালটির উপর বসে সেও তার সাথীর উদ্দেশে কাতর স্বরে ডাকতে লাগল—কু-কু-কু। তবু কোন সাড়া নেই। শেষকালে পাখীটা সেখান থেকে উঠে প্রাসাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। কতবার সে লায়লার সমুখ দিয়ে যেন একটা চমকের মত মিলিয়ে গেল, কেবল পাখার স্পন্দনটুকু শোনা যায়। কতক্ষণ পরে আবার ফিরে এল জানলা দিয়ে, লায়লা তখনই তাকে বুকের উপর চেপে ধরলে; তার মনে হ'ল পাখীটার বুক বড় কাঁপছে—সত্যিই কাঁপছে, তার বুকখানি যেন ভেঙ্গে গিয়েছে!

তখন লায়লা তার গায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে বললে—"আহা মরে যাই! যাকে ভালবাসি সে যদি আর না বাসে তার বাড়া কষ্ট নেই; কিন্তু সে যদি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে কষ্ট যে আরও অসহ্য!" এমনি করে' লায়লা তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। এমন সময় এ কি! সেই পলাতক পায়রাটা পাখার শব্দ করে' ঘরে এসে ঢুকল, ঢুকেই তার কাঁধের উপর এসে বসল। লায়লা একটি অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে' দুটোকেই একসঙ্গে বুকে নিয়ে চেপে ধরল। তাদের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিবে আদর করছে সে, এমন সময়ে আঙুলে কি একটা ঠেকল সেই পলাতক পাখীটার পায়ে। এক টুকরা কাগজ! কাগজখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ে দেখলে—সে তার প্রিয়তমের সেই চিঠি। এখন কি করবে সে? সেও কি যাবে সেই ফোয়ারার ধারে, যেখানে চিরদিন চাঁদের আলোয় প্রেমিকারা প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা করে? যখন কিছুই ঠিক করতে পারছে না, তখন হঠাৎ একে একে সেই পায়রাদুটোকে ধ'রে সে চুমু খেলে। তাদের ছেড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা খুব বড় আংরাখায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে, নিঃশব্দে সিঁড়িগুলো পার হ'য়ে, নীচেয় নেমে সে প্রাসাদের একটা পাশ-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রেম তাকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে—সেই যেখানে ঘনবনের মধ্যে নির্জ্জন ফোয়ারার ধারে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে মাটির উপর—যেন আঁধারের উপর আলোর ডোরা! তারই উপর দিয়ে একটি চলন্ত ছায়া দ্রুত পার হয়ে চলেছে—আলোয় দেখা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। এমনি চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গার কিনারায় এসে পৌছল সে; সেই জায়গার ঠিক মাঝখানে একটি

ফোয়ারা খেলছে চন্দ্রালোকে। যেন একটি জলের স্তম্ভ উঠেছে আকাশপানে! তার রং ঠিক রূপোর মত; ভেঙে পড়বার মুখে সেই রূপোর গায়ে যেন অসংখ্য হীরা-মাণিক চকমক করে' উঠছে। সেই ফোয়ারার চারিধারে অনেকখানি জমি শেহালায় ভরে' গেছে- যেন একখানি সবুজ সাটিনের বিছানা, আর তারি উপর রাশি রাশি চূর্ণ-জলকণা নূপুরের মত শব্দ করে' ছিটিয়ে পড়ছে।

সেই ছায়াবীথির মাঝখানে এসে লায়লার পা দুখানি থেমে গেল। যে তার পায়রাটিকে চুরি করেছিল, পরে তাকেই তার দূত করে পাঠিয়েছিল—সে কোথায়? হঠাৎ চোখ পড়তেই বলে উঠল—

"তুমি কে? কে গো তুমি?"

তার পর দুজনেই চোখে চোখে চেয়ে রইল,—দু'জনের মুখেই চাঁদের আলো, কথা নেই কারো মুখে।

সকলের সমবয়সী আকাশের সেই আদ্যিকালের চাঁদ ছাড়া আর কেউ তাদের হঠাৎ-আলিঙ্গন দেখতে পায়নি—চাঁদ এমন কত জিনিষ কতবার দেখেছে! ফোয়ারার মধ্যে যে পরী বাস করে, সেই পরী ছাড়া আর কেউ তাদের প্রেম-বিহ্বল কলকথা শুনতে পায়নি; সেই পরীই ত' ফোয়ারার প্রথম কুলুকুলু-ধ্বনিতে প্রেমিক-কণ্ঠের সকল কল-কাকলি ধরে' রেখেছে, সেই আদি-কাল থেকে!

কায়েস আর লায়লা এমনি ক'রেই সেই গভীর বনে নির্জ্জনে ফোয়ারার ধারে দেখা করতে লাগল; তাদের ভালবাসা কখনো কিছুতে হার মানবে না, এই কথাই তারা বার বার পরস্পরকে জানাতো। শেষে একদিন যখন বিদায় নেওয়া আর শেষ হয় না—কায়েস লায়লাকে বললে—

"আমার প্রাণ যে কি করে—কেমন করে' বলব? ওগো আমার প্রাণ-প্রতিমা! লোকালয় থেকে দূরে যদি কোন মরু-প্রান্তরে আমাদের ঘর হ'ত, মাটিতে আপনি জন্মায় যে দানা—তারি রুটি তৈরী করে দিতে তুমি নিজ হাতে, ঝরণার জল ছাড়া আর কিছুই থাকত না পান করবার, আর, কোন গাছতলায় শুয়ে আমরা রাত কাটাতাম—সেও আমার পরম সুখ! তোমার আত্মীয়-স্বজনের শত্রুতা ভুলে'—তোমাকে সাথী করে', তোমায় ভালবেসে আমি সারা-জীবন কাটিয়ে দিতাম একটা একটানা স্বপ্নের মত!"

"আমিও তাই, প্রিয়তম !"

"তবে এসো, আমরা পালিয়ে যাই, সেই মরুপ্রান্তরে—"

"আজ এখনই ?

"না না, এখনই নয়। তোমাকে একটু তৈরী হয়ে নিতে হবে। কাল ঠিক এই সময়ে এইখানে আমি দুটি বিদ্যুৎগামী ঘোড়া নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তারপর, ঘোড়া যেমন ছুটবে তার খুরের ধূলো ঝেড়ে ফেলে—আমরাও তেমনি দু'জনে চলে যাব এই সংসারটাকে ঝেড়ে ফেলে।"

সে রাত্রে লায়লা স্বপন দেখলে, যেন সে তার প্রিয়তমের সঙ্গে চলেগেছে এক বিজন মুক্তপ্রান্তরের দেশে। সেখানে তারা গাছের তলায় গিয়ে বসে দুজনে, পান করে ঝর্ণার জল ; আর বনে আপনা হ'তে জন্মায় যে শস্য, তারি রুটি সে তৈরী করে আপন হাতে তার প্রিয়তমের জন্য। শুধু তার সঙ্গে, তার বুকের কাছটিতে থাকতে পাওয়া—তার মত সুখ কি রাজপ্রাসাদেও আছে ?

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। লায়লার পরিজনদের মধ্যে একজন ছিল—তার কাণও যেমন একজোড়ার বেশী, চোখও ছিল তেমনি পিছন দিকে আর একজোড়া। সে ছিল ইব্‌নে সালামের গুপ্তচর। ইব্‌নে সালাম ঐ দেশের আর এক সর্দ্দার, তরুণ সুশ্রী যুবা সে-ও—লায়লাকে পাবার জন্যে অধীর। তার সেই চর একদিন লায়লার পিতার কাণে কি একটা সংবাদ দিলে ভারি চুপিচুপি। পরদিন কেউ রইল না সেই প্রাসাদে ; গৃহপতি, তাঁর কন্যা লায়লা, আর যত পরিজন—সব একসঙ্গে যাত্রা করলে এক দূর পার্ব্বত্য-নিবাসের দিকে। সেইখানে থাকলে লায়লার শরীর নাকি সেরে উঠবে পাহাড়ের তাজা হাওয়ায়, তার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। লায়লার পিতার এ কথা কেউ বুঝতে পারলে না, কারণ লায়লার এমন রূপ এমন স্বাস্থ্য এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

কায়েস প্রথম ক'দিন এ সংবাদ পায়নি, তাই ফোয়ারার ধারে এসে ফিরে যেতে লাগল সে। ক্রমে যখন তার হৃদয় ভেঙে পড়েছে, তখন একদিন সে শুনলে—ইবনে সালামই খবরটা বেশ করে সাজিয়ে দিয়েছিল—লায়লা আপন ইচ্ছায় চলে' গিয়েছে সেই দূর পাহাড়-ঘেরা বাড়ীতে, আর সঙ্গে গেছে তার প্রেমাস্পদ ইব্‌নে সালাম। কায়েস তাই শুনে পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই পাহাড় যেদিকে তারই পানে মুখ করে' সে ঝাঁপ দিলে মরুভূমির দিশাহীন শূন্যতার মাঝে। মুখে কেবল এক শব্দ—লায়লা ! লায়লা ! সমস্তদিন

[illegible] সেই নাম প্রতিধ্বনিত হ'ল প্রত্যেক গাছ, পাথর, প্রত্যেক [illegible] থেকে। ভোরের বেলায় দেখা গেল, সে পড়ে' আছে অবসন্ন হয়ে এক তৃণহীন তরুহীন বালুভূমির বুকে।

তার সেই ভৃত্য জায়েদ, আর তার মনিবের কয়েকজন বন্ধু, বহু সন্ধানের পর তাকে দেখতে পেলে সেইখানে এই অবস্থায়—শোকে কাতর, আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কেবলই ভুল বকছে। তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেল সবাই মিলে, সেবা-যত্ন করে' একটু সুস্থ করে' তুললে। কিন্তু যেই একটু সুস্থ হয় অমনি সে আকুল হয়ে ডাকতে থাকে—লায়লা! লায়লা! তখন সকলে বুঝতে পারলে, সে পাগল হয়ে গেছে। তাই তার নাম হ'ল—'মজনু' অর্থাৎ 'প্রেমে-পাগল'; এর পর ঐ হ'ল তার একমাত্র নাম।

তার পিতা তাকে অনেক বোঝালেন, শত্রুর মেয়েকে ভালবাসা একটা মোহ—ত্যাগ করা উচিত। যখন দেখলেন, ঐ একটা ছাড়া তার আর কোন রোগই নেই, তখন স্থির করলেন—ক্ষতি কি? যদি তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলেও বাঁচে, সেই সঙ্গে বহুকালের শত্রুতাও দূর হয়—সেই ত' ভালো। বহু দলবল নিয়ে তিনি তাঁর চিরশত্রু সেই বসরা-সর্দ্দারের পর্ব্বত-পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অনেক পথ চলে' লায়লার পিতার প্রাসাদে পৌছলেন তিনি। বসরা-সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা ক'রে, বেশ একটু উদ্ধত ভাবেই তিনি তার মেয়েটিকে চাইলেন নিজের ছেলের জন্যে; সম্মতি ও অসম্মতির ফল কি হবে তাও জানিয়ে দিলেন তাকে। লায়লার পিতাও তেমনি উদ্ধতভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন—

যত দূরই হোক, সব সংবাদ এসে পৌছয় তাঁর কাছে; ইমেন-সর্দ্দারের পুত্র যে উন্মাদ হয়ে গেছে, এ সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই পেয়েছেন। আগে সে আরোগ্য লাভ করুক, পরে এ প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে।

মজনু'র পিতা ইমেন-সর্দ্দারের স্বভাব ছিল যেমন গর্ব্বিত, মেজাজও ছিল তেমনি ভীষণ। তিনি ফিরে এলেন যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে; মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার আসবেন সসৈন্যে, বসরার দম্ভ চূর্ণ করবেন তিনি।

এ সংকল্প কিন্তু স্থগিত রাখতে হ'ল—দেশে ফিরে এসে তিনি শুনলেন, মজনু তার ভৃত্য জায়েদকে সঙ্গে করে' মক্কায় গেছে হজ করতে। শুনে তিনি

বলে' উঠলেন, "ঠিক বটে! কাবার মন্দিরে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলে, আর পবিত্র জমজমের জল পান করলে, সকল ব্যাধি আরাম হয়ে যাবে। ঐ জলের মত আর কি আছে? নীরস্ মরুর বুক ফেটে উথলে উঠেছিল যে জল, হাজেরা ও হাজেরা-তনয়ের জীবনরক্ষার জন্য, সে জল যে আমার ছেলেকেও বাঁচিয়ে তুলবে, তাতে সন্দেহ কি?" তিনি নিজেও যাত্রা করলেন সেই মক্কার উদ্দেশে—তিনিও ছেলের পাশে নতজানু হয়ে খোদার আশিস প্রার্থনা করবেন।

কিন্তু পথে ঘটল আরেক ঘটনা। মাত্র দু'দিনের পথ পার হয়েছেন, এমন সময়ে তাঁর দেখা হ'ল সেই মরুদেশের এক বেদুইন সর্দ্দারের সঙ্গে, তার নাম, ন্যুফল। তার মুখে শুনলেন, মজনু ঐ পথে যেতে যেতে হঠাৎ আবার ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সে-ই তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে রেখেছে। সে যে তাঁরই ছেলে মজনু, তা সে বুঝতে পেরেছিল তার মুখের সেই ক্রমাগত 'লায়লা-লায়লা' ডাক শুনে,—কারণ, রূপের খবর আর ভালবাসার খবর ঐ নিঃসংবাদের দেশেও শীঘ্র পৌছয় দূরে দূরান্তরে।

"এখন তা হলে কি করতে বল, ন্যুফল?"

"আমি বলি, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চাও, এসো আমরা দুজনে মিলে সেই বসরা-সর্দ্দারকে গিয়ে বলি, তার মেয়েকে আমাদের চাই-ই। যদি না দেয়, কেড়ে নেব যুদ্ধ করে'; তাতে তোমার ইজ্জত আরও বেড়ে যাবে। যদি দেয়, আমাদের মধ্যে আর বিবাদ থাকবে না। তখন তিন জনেই সমানভাবে এই মরুরাজ্য ভোগ-দখল করব।"

মজনুর পিতা রাজি হলেন, বললেন, 'তুমি আগে যাও, বসরা-সর্দ্দারকে তুমিই গিয়ে বল, তার মেয়েকে দিতে হবে। আমি তোমার পিছনে থাকব; যদি দেখি, তুমি লায়লাকে নিয়ে ফিরে আসছ নিরাপদে, তা'হলে ত' চুকেই গেল, নইলে একসঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করব। তার ব্যবস্থা এখনই করে' রাখা যাক। ডাক দাও তোমার সৈন্য-সামন্তদের; জমায়েত হবার একটা জায়গা ঠিক করে' খবর পাঠাও চারিদিকে; আমিও এখনই পাঠাচ্ছি আমার সৈন্যদলকে ডাক দিতে।" ন্যুফল তখনই চলে গেল; ইমেন-সর্দ্দার সেইখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন, যতক্ষণ তাঁর দূতেরা ফিরে না আসে।

এদিকে তার পিতার সেই পর্ব্বতনিবাসে বড় দুঃখে দিন কাটছিল লায়লার। তার পিতার পরম প্রিয় পাত্র ইব্‌নে সালাম ক্রমাগত লায়লার পাণি-প্রার্থনা করে' তার বাপের কাছে যাওয়া-আসা করছিল। কেবল মেয়ের মুখপানে চেয়ে, তার অনিচ্ছা আর কান্না দেখে, তিনি অনুমতি দিতে পারছিলেন না—তাকে কেবল এই বলে' শান্ত করছিলেন যে, লায়লার এখনও বয়স হয় নি, আর কিছুদিন যাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ তরুণ যুবাটির উপরে বসরা-সর্দ্দারের একটু বিশেষ নজর ছিল; এর কারণ, তার ধন-দৌলতও যেমন প্রচুর, তেমনই তার অধীনে সৈন্যও ছিল অনেক। লায়লা দিনের আলোয় আর বার হত না, রাত্রে নক্ষত্র-ভরা আকাশের তলে সে এসে বসত, মনে মনে বলত, "আমি চিরকুমারী থাকব সেও ভালো তবু মজনু্ঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি পতিত্বে বরণ করব না; আহা, মজনু্ঁরও অবস্থা আমারই মত, সেও পাগল হয়ে গেছে।"

লায়লার পায়রাদুটি এখন আর তার কাছে নেই—তারা সেই দেশের বাড়ীতে সেই গাছটির ডালে বাস করছে; বাড়ীর ভৃত্যরাই তাদের দেখাশোনা করে। তবু তাদের দেখেও সে প্রাণে একটু শান্তিবোধ করত, তাদের একটিই ত' একদিন তাদের প্রেমের দূতিয়ালী করেছিল। এখানে তার জন্য একটা ছোট বাঘের বাচ্ছা পোষা হয়েছে—একটা কাফ্রী ক্রীতদাসী ছাড়া আর কাউকে সে মানে না; কিন্তু পায়রাদের মত সে তো' আর তার সঙ্গে প্রেমের কথা বলতে পারবে না। একদিন এক বাঁদী তাকে একটা ময়না-পাখী এনে দিলে, বললে,—"আমার যে এক বালক-প্রণয়ী আছে, সে পাহাড়ের বন থেকে এটাকে ধরে' এনেছে, তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর বলে' এটা তোমাকেই দিতে বলেছে।"

সেই নির্জ্জন-বাসে এই পাখীটা লায়লার বড় আদরের বস্তু হয়ে উঠল; দুদিন পরেই দেখলে—পাখীটা তার গলার স্বর নকল করতে পারে। অমনি সে তাকে একটি মাত্র কথা শিখিয়ে দিলে—একটি মাত্র। তারপর পাখীটাকে হাতের উপর বসিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত—সেও অতি মৃদুমধুর স্বরে সেই একটি শব্দ উচ্চারণ করত—মজনু্ঁ, বার বার সে ওই একটি নাম—জগতে তার কাছে সব চেয়ে যা মিষ্টি—সেই নামের সুধা তার কানে বর্ষণ ক'রত—মজনু্ঁ, মজনু্ঁ। তখন তার প্রাণখানি যেন দেহ ছেড়ে জনহীন দিশাহীন মরুপ্রান্তরে খুঁজে বেড়াত সেই একজনকে—সেই তার মজনু্ঁকে।

যখন তার প্রাণ-মনের অবস্থা এমনই, তখন একদিন ভোরের বেলায় ন্যূফল তার বিরাট সৈন্যবাহিনী সঙ্গে করে' সেই দেশে উপস্থিত হ'ল, তাদের প্রাসাদের কবাটে তলোয়ার হেনে সে বসরাপতিকে ডাক দিলে তার সামনে এসে দাঁড়াতে।

যখন দূরে পাহাড়গুলার পিছনে প্রভাত-সূর্য্যের আলো ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সময়টুকুর মধ্যে দুইপক্ষে সংক্ষেপে কথাবার্ত্তা হ'ল। সূর্য্য যখন হঠাৎ একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠে দুর্গের প্রাকারদ্বারে করাঘাত করলে, তখন ন্যূফল কথা শেষ করে' দলবল নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—পিছনে যে সৈন্যদল আসছিল ইমেন-সর্দ্দারের, তার সঙ্গে যোগ দিতে। সূর্য্যকে আড়াল করে' সেই যে ধূলার মেঘ উঠলো, বসরা-সর্দ্দার তার পানে চেয়ে বুঝতে পারলেন যে, এ যুদ্ধেরই নিশানা; বড় অতর্কিতে বাধল এই যুদ্ধ।

ইব্‌নে সালামের রাজ্য ঠিক পাশেই। যেমন সে শুনল যে, তাকেই কন্যাদান করবে বলে' বসরা-সর্দ্দার ন্যূফলের প্রস্তাবে রাজী হয়নি, সেইজন্যই হঠাৎ বজ্রভরা অকাল-মেঘের ঝড় উঠেছে, তখনই সে বসরা-সর্দ্দারকে সাহায্য করবার জন্যে এক হাজার যোদ্ধা পাঠিয়ে দিলে—ঐ হাজার জন কিন্তু তার মোট সৈন্যদলের এক তৃতীয়াংশ হবে না।

দুপুর না হতেই ইব্‌নে সালামের অশ্বারোহী সৈন্য দলে দলে এসে পৌঁছল। লায়লা তার জানলাটিতে বসে' দেখলে—তাদের সেই বীরবেশ ও বীর-ভঙ্গি। তার-পর দূর মরুপ্রান্তরের দিকে চেয়ে সে দেখতে পেলে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এইদিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে—তাদের ঘোড়ার খুরে আকাশ ধূলিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

তাই দেখে লায়লা কেঁদে উঠল, "হা অদৃষ্ট আমার! এই কলিজাটার যে বস্তু ধাক্কা দিচ্ছে তারই কারণে এই বিপত্তি! একদিকে পিতা আর দিকে মজনু, আমার প্রাণ যে কাউকেই ছাড়তে চায় না! ভাগ্যই এ দুয়ের মধ্যে যাকে হয় একজনকে জয়ী করবে।"

ভাগ্যও ভারি বিপরীত খেলা খেলতে লাগল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার কাণে পৌঁছতে লাগল ভীষণ যুদ্ধের ঝঞ্ঝনা—আশা ও হতাশার মধ্যে তার প্রাণখানি ক্রমাগত দুলতে লাগল; পরে সে স্পষ্টই দেখতে

[illegible] ইব্‌নে সালামের সৈন্ত হঠতে সুরু করেছে। তার পিতার শত্রুদল ক্রমাগত তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে, শেষে হতাবশিষ্টের দল দুর্গের ভিতর এসে আশ্রয় নিলে। দুর্গের দরজাও ভেঙ্গে গেল, এবার সবই বুঝি যায়—অথবা সব রক্ষা হয়! একজন দূত এগিয়ে এসে জানিয়ে দিলে, কি সর্ত্তে তারা আত্মসমর্পণ করতে পারে। লায়লা তার সেই জানালা থেকে ঝুঁকে কাণ পেতে শুনতে লাগল। প্রথমে কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, শেষে এই পরাজয়েও অপরাজিত তার পিতার তেজোদৃপ্ত উচ্চ কণ্ঠস্বর কাণে এল, তিনি বলছেন—

"আমি যদি নিজে হ'তে আমার কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ না করি, তবে তোমরা তাকে জোর করে' কেড়ে নেবে। বেশ; কিন্তু তোমরা তাকে জীবিত পাবে না। আমার সব গেছে, তবু আমার ভৃত্যগণ আমার আদেশ পালন করবে। আমি যদি হুকুম করি, তবে তার মৃতদেহ তোমরা চাইবামাত্র পাবে।"

এই কথা শুনে ইমেন-সর্দ্দার তাঁকে এমন ভয়ানক কাজ করতে নিষেধ করলেন, বললেন—

"শোন, বসরা-সর্দ্দার, আমি তোমাকে একদিনের সময় দিচ্ছি, তুমি চিন্তা করে' দেখ। দুই দিকই দেখবার আছে,—এক, তুমি আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য তোমার কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করতে পারো, তা'তে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন হবে; আর এক—তুমি তোমার কন্যাকে আপন অধিকারে রাখ, কিন্তু তোমার রাজ্য ও রাজশ্রী আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, তোমাকে আমার অধীন হয়ে থাকতে হবে।"

এই বলে' ইমেন-সর্দ্দার ন্যুফলকে নিয়ে সরে গেলেন, পরদিন রাত্রি-প্রভাতে বসরা-সর্দ্দারকে জবাব দিতে হবে।

এদিকে ইব্‌নে সালামও চুপ করে বসে' ছিল না, সে একটা বড় কৌশল করেছিল। সে চারিদিকে যে সব চর পাঠিয়েছিল তাদের একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল, সে যেন খানিক দূর পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বলে যে, সে ইমেন থেকে আসছে, সে দেখে এসেছে, মজনুঁ পথে এক জায়গায় মরে' পড়ে রয়েছে—রাত্রিকালে সে তার রক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল লায়লার সন্ধানে।

কথা সত্যি না হলেও শীঘ্রই সত্যি হয়ে উঠবে, কারণ, ইব্‌নে সালাম তাকে খুন করবার জন্য অনেক চর পাঠিয়েছিল। এই খবর খুব শীঘ্র প্রচার হওয়া দরকার; সেই সঙ্গে সে বসরা-সর্দ্দারকে সাহায্য করবার জন্যে আরও বড় একদল সৈন্য পাঠানোর প্রস্তাব দূতমুখে করে' পাঠালে; তাতে দুই কাজই হবে, মজনু'র মৃত্যু-সংবাদে লায়লার রাজী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না; লায়লার পিতাও এই বিপদে আবার ঐ রকম সাহায্য পেলে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে আর বিলম্ব করবেন না।

বিজেতার দল যেই দূরে সরে' দাঁড়াল, ঠিক সেই সময়ে ইব্‌নে সালামের সেই দূত উভয় পক্ষকে শুনিয়ে তার সেই সংবাদ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'রে দিলে। ইমেন-সর্দ্দার তাই শুনে শোকার্ত্ত হয়ে রোদন করতে লাগলেন। ন্যফাল বললে, "এখন আর লায়লাকে আমাদের কি প্রয়োজন? কাল ভোরে আমরা আমাদের দাবী জানাবো।" কেবল লায়লার পিতা আর ইব্‌নে সালাম এই সংবাদে কাতর হল না। ইব্‌নে বললে, "এখন আর তোমার কন্যার সম্মতিতে কোন বাধা রইল না—নারীর পক্ষে মৃতের চেয়ে জীবিতই অধিক বাঞ্ছনীয়। আমি তোমাকে একবার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছি, আবার তার তিনগুণ সৈন্য আমি তোমার পক্ষে দাঁড় করাতে পারি, আমার হুকুম পেলেই তারা মরুভূমি থেকে বেরিয়ে আসবে—কেবল তোমার কন্যার ঐ একটি কথা পেলেই আমি তা' করব। অর্দ্ধেক তোমার এইখানে থেকে যুদ্ধ করবে, বাকি অর্দ্ধেক মরুভূমির দিকে এসে পিছন থেকে ইমেনের সেনাদলকে আক্রমণ করবে। তা' হলেই তোমার ঐ শত্রুসৈন্য ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে যাবে। এখন তবে তোমার মেয়েকে গিয়ে বল যে, মাত্র তার একটা কথায় তুমি সর্ব্বনাশ থেকে রক্ষা পাবে, শুধু তাই নয়, তোমার মান-মর্য্যাদা আগের চেয়ে আরও বেড়ে যাবে।"

বসরা-সর্দ্দার তাঁর মেয়ের কাছে গেলেন; নারীকণ্ঠের হাহাকার-রব শুনে ইব্‌নে সালাম বুঝতে পারলে যে, মজনু'র মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে কাজ হয়েছে—লায়লা বিশ্বাস করেছে। বসরা-সর্দ্দার তাকে কতরকম করে' বোঝাতে লাগলেন, কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগলেন। ইব্‌নেকে বিবাহ করলে তাঁর প্রাণ ও মান দুইই রক্ষা পায়, নইলে আর রক্ষা নেই—একসঙ্গে সব যাবে। লায়লার চক্ষু দুটি জলে ভেসে যেতে লাগল, সে বুঝতে পারলে—তার পিতার জন্যে এই আত্মবলি তাকে দিতে হবে; সে কর্ত্তব্যের বশে, ধর্ম্মের ভয়ে, ইব্‌নে সালামকে পতিরূপে বরণ করতে সম্মত হ'ল—তাতে প্রেমের লেশমাত্র রইল না।

এর পর যা' হবার তাই হ'ল। ইব্‌নে সালাম যা স্থির করেছিল, সে যুদ্ধের যে কৌশল করেছিল, তার সবই ফলে' গেল। পরদিন সকালে বসরা-সর্দ্দার যখন দ্বিগুণ সাহসে বিপক্ষের কোন দাবী গ্রাহ্যমাত্র করলে না, তখন তারা আশ্চর্য্য হয়ে গেল; কিন্তু ভিতরের চক্রান্ত না জানতে পেরে তারাও নিজেদের জয়লাভে নিঃসংশয় হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। এ পক্ষের সেনাদল বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধ যেমন কঠিন হয়ে উঠল, তেমনই উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবু ন্যুফল ও ইমেনের তখনও জয়লাভ নিশ্চিত; পরে যখন প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করে' বসরা-সর্দ্দারকে প্রায় সম্পূর্ণ পরাজিত করবে, সেই গুরুতর সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে অসংখ্য সওয়ারের অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল, এবং তার কিছু পরেই সেই নূতন সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে তারা যেন নিমিষে বিধ্বস্ত হয়ে গেল—যারা বাকি ছিল তারা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতই উড়ে গেল।

ইমেন-সর্দ্দার যুদ্ধে হত হলেন। ন্যুফল কিছুদূর পর্য্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকে তুচ্ছ করে, শেষে ছুটন্ত ঘোড়ার উপর ব'সেই আত্মহত্যা করলে—জীবনেও সে যেমন ঘোড়ার পিঠ কখনো ত্যাগ করেনি, মরণেও তা' করতে হল না।

বসরার জয় হ'ল। সেই রাত্রেই লায়লাকে তাঁর পিতা ইব্‌নে সালামের হাতে সঁপে দিলে। বসরা-সর্দ্দারও সেই রাত্রে মারা গেলেন—যুদ্ধে তিনিও বিষম আহত হয়েছিলেন। এখন থেকে ইব্‌নে সালাম তিনটি রাজ্যের অধিপতি হ'ল—ঐ রাজ্যের সেও যেমন রাজা, লায়লাও তেমনি রাণী হল।

বছরের পর বছর যায়। ইব্‌নে আর লায়লার রাজ্যে আর কোন অশান্তি নেই। লায়লা তার পিতার সেই প্রাসাদেই বাস করে, সেই ময়নাপাখীটি আর তার সেই দুটি শাদা পায়রা এখনো তার সাথী। যে-প্রেম সে কখনও ভুলতে পারবে না, যাকে সে চিরজীবনের মত হারিয়েছে—এরা সেই প্রেমের সাক্ষী, এরাই তার স্মৃতিকে জীইয়ে রেখেছে। মজনুঁর সেই প্রভুভক্ত ভৃত্য জায়েদ তার মনিবের সন্ধান করেছিল অনেকদিন, শেষে তাকে না পেয়ে সে এখন লায়লার কাছে থেকে তারি সেবা করে।

একদিন জায়েদের কাছে খবর এল, যাকে মৃত মনে করে' এতদিন তারা শোক করেছে সেই মজনুঁ দূরদেশ থেকে ফিরে এসেছে সওদাগরের বেশে; সে ঐ মরুস্থানের এক প্রান্তে সূর্য্যাস্তের সময়ে জায়েদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে

প্রতীক্ষা করে' থাকবে। তার কর্ত্রীকে সে এ সংবাদ জানালে না, বরং তার অজ্ঞাতসারেই সেই পায়রাদুটির একটিকে নিয়ে সে যথাস্থানে দেখা করতে গেল; পায়রাটিকে সঙ্গে নেওয়ার কারণ—তার মনে হয়েছিল, একবার তাকে দিয়ে যে কাজ হয়েছিল, আর একবার তা না হবে কেন? সূর্য্য যখন ডুবে যাচ্ছে সেই সময়ে তাদের দুজনের আবার দেখা হ'ল; বড় আনন্দ হ'ল দুজনেরই।

এদিকে লায়লা যখন সন্ধ্যাকালে তার সেই উচ্চ কক্ষে প্রবেশ করে' দেখলে একটা পায়রা নেই, তখন আশ্চর্য্য বোধ হল তার। সে তখনই অপরটিকে সেই গাছটির দিকে উড়িয়ে দিলে, ভাবলে—একসঙ্গে দুটিতে ফিরে আসবে। কিন্তু তা' হল না, কিছুক্ষণ পরে সেই একটাই ফিরে এল। তখন, কিছু বুঝতে না পেরে সে কেমন একটু অন্যমনা হয়ে, সেই জানালাটিতে বসে' অতীতের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল। তার মনে পড়ল, তিন বৎসর আগে আর একদিন এম্নি করেই তার একটা পায়রা হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই আবার ফিরে এসেছিল মজনুঁর প্রেম-লিপি নিয়ে; মনে পড়ল, কতদিন কতবার তারা বনমধ্যে সেই ফোয়ারার ধারে অভিসার করত,—প্রেমের মিলন-তীর্থ সেই ফোয়ারা! হায়, সে সব কোথায় কি হয়ে গেল! মজনুঁ বেঁচে নেই, সে-ও অপরের বিবাহিতা। তার চোখদুটি জলে ভরে' উঠল, বাহুর উপরে মাথা রেখে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ এমনি কেটে গেল। হঠাৎ একসময়ে একটা শব্দ শুনে তার সেই কান্না ভেঙ্গে গেল। এ সেই হারানো কপোতটিরই কূজনধ্বনি—সেই কু-কু-কু; সেই গাছের ডাল থেকেই সে ডাকছে। তখনই অপর পায়রাটি উড়ে চলে' গেল তার সাথীর পাশে—তার পাখার হাওয়ায় লায়লার চুল কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। তাই দেখে লায়লার প্রাণে আবার সেই কামনা অধীর হয়ে উঠল—অমনি করে' সেও তার প্রেমাস্পদের কাছে উড়ে যায়।

একটু পরেই দুটা পাখীই ঝটপট করে' জানালা গলিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। ওমা! ওটা আবার কি! আর একদিনের সেই সন্ধ্যার যেমন, আজও তেমনি—তার পায়ে এক টুকরো কাগজ জড়ানো রয়েছে। খুলতে গিয়ে তার আঙুল কাঁপতে লাগল, চিঠিখানা সে পড়লে। মজনুঁর লেখা! সে বেঁচে আছে, ভাল আছে। আগের মতই সে তাকে যেতে বলেছে সেই ফোয়ারার ধারে—ঠিক চাঁদ ওঠবার সময়ে।

এই আচম্বিত সুসংবাদের আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ল সে। মজনু বেঁচে আছে, এত কাছে রয়েছে সে! লায়লা সব ভুলে গেল। আকাশের কিনারায় চাঁদ সবে উঠেছে—এমন সময়ে সে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে' প্রাসাদের সিঁড়িগুলি নিঃশব্দে পার হয়ে নেমে গেল; পিছনের দিকের সেই দরজায় এসে দাঁড়াল—কেউ দেখতে পায়নি তাকে। তারপর দরজা খুলে সে বেরিয়ে পড়ল। তার প্রাণ যেন দেহটাকে পিছনে ফেলে ছুটে যেতে চায় মজনুঁর পাশে। যেতে যেতে হঠাৎ বুকটায় যেন কিসের ধাক্কা লাগল, বুকের স্পন্দনও থেমে গেল। তার পা কাঁপতে লাগল, একটা গাছের ডাল ধরে' সে নিজেকে সাম্‌লে নিলে। তার স্বামী! তার সতীধর্ম্ম! একদিন সে ত' সর্ব্বস্ব দান করে' দিয়েছে তার পিতার অনুরোধে—তার ত' আর কিছুই নেই! জীবনের যা-কিছু—সে ত' আর একজনকে নিঃস্বত্ব হয়ে দান করেছে, এখন কি সেই দান সে ফিরিয়ে নিতে পারে? তা'ও এমনি করে'! সে কেমন দেখাবে? মজনুঁর হাত-দুটি যখন তার গলা জড়াবে, তখন কি তার আর কোন জ্ঞান থাকবে? তখন যে তার স্বামী, তার ধর্ম্ম, তার সমাজ—সব ভেসে যাবে, আর ত' সে ফিরে আসতে পারবে না! এ তো বিবাহিতা পত্নীর কাজ নয়; দেশের রাণীর কাজও এ নয়। গাছের শাখাটি ধরে' সে তার বুকের সেই হাহাকার চাপতে চেষ্টা করলে, তারপর যখন তার সেই বিরাট দুঃখকে স্বীকার করে' বরণ করে' নেবার সংকল্পই স্থির করলে, তখন প্রাণের রুদ্ধ আবেগে তার দেহটিও টল্‌তে লাগল।

সেই ফোয়ারার ধারে—চিরপ্রেমের সেই তীর্থস্থানে—মজনুঁ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে' রইল, তারপর যখন জায়েদের মুখে শুনলে যে, লায়লা পথে বেরিয়ে অনেক দূর এসে আবার ফিরে গেছে, তখন সেও চলে' গেল সেখান থেকে। যে-প্রেম একটি চাহনিতেই সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলে, আর কিছু থাকে না তার—সেই প্রেমকে সে মনে মনে প্রণাম করলে। তার কারণ, জায়েদের কথা শুনে সে সবই বুঝতে পেরেছিল। লায়লাও যেমন তার বুকটাকে আরও কঠিন করে' নীরবে সেই রাজপ্রাসাদেই ফিরে গেল, মজনুঁও তেম্‌নি দূর দেশান্তরের উদ্দেশে যাত্রা করলে। তার একমাত্র কামনা হ'ল এই যে, কালে যেন এই দারুণ দুঃখের শান্তি হয়। প্রেমের সেই বাঁধ-ভাঙ্গা অকূল আনন্দ যদি ভাগ্যে নাই থাকে, এই অসীম দুঃখের জ্বালা যেন কালে শান্ত হয়।

আরও দু'বছর কেটে গেল, এইবার ভাগ্য-দেবতা স্বয়ং দেখা দিলেন। ইব্‌নে সালাম জ্বর-রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষে মারা গেল। সংবাদটা বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। একদিন এক অতিদূর শহরে মজনুঁর কানে গেল—ইমেন ও বসরার রাণী লায়লা এখন বন্ধনমুক্ত হয়েছে—সে এখন একা। অতিশয় দ্রুত-গামী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে ইমেনে এসে পৌঁছল। কিন্তু তার স্মরণ হ'ল লায়লা দু'দুবার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের বশে কতবড় আত্মত্যাগ করেছে, তাই বৈধব্য-যাপনের যে কাল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, তা' পালন করতে হবে তাকে,—চান্দ্র মাসের সাড়ে-চার মাস। ঐ সময়টা সে একা অজ্ঞাতভাবে কাটাবার জন্যে এমন একটি স্থানে বাস করেছিল যেখান থেকে লায়লার প্রাসাদ-কক্ষের বাতি-গুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তার প্রাণের ব্যাকুলতা এত বেড়ে উঠল যে, তাতে যেন সে ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল; যে অবস্থায় তার নাম হয়েছিল 'মজনুঁ'—এ যেন তারও চেয়ে অসহ্য। সেবারেও যেমন সেই যন্ত্রণা তাকে একেবারে ভেঙে ফেলতে পারে নি, এবারেও—স্বর্গের দুয়ারে এসেও এমনি ভাবে বসে থাকার—এই দীর্ঘ যাতনা সে অতিশয় ধীরভাবে সহ্য করে রইল।

এতদিন জায়েদ লায়লার সব সংবাদ মজনুঁকে এনে দিচ্ছিল, কিন্তু মজনুঁর কোন সংবাদ সে লায়লাকে দিতে পারেনি। কিন্তু যেদিন সেই নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গেল সেইদিনই সে লায়লাকে গিয়ে জানালে যে, মজনুঁ তার সঙ্গে সেইদিন দুপুরে তার প্রাসাদে এসে দেখা করবে, কিম্বা সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে সেই ফোয়ারার ধারে তার জন্যে অপেক্ষা করবে—যেটা তার পছন্দ হয়।

জায়েদ এর জবাব নিয়ে এল অনেক বিলম্বে; লায়লা বলে' পাঠিয়েছে—"দুপুর এবারকার মত অতীত হয়েছে, কিন্তু আবার আসবে—রাত্রি-আঁধারের পর।"

এই ভাগ্যহত প্রেমিক-যুগলের প্রেম-কাহিনীর মর্ম্মান্তিক অংশটুকুই বলতে এখনো বাকি আছে। সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে মজনুঁ তার কথা অনুসারে সেই সঙ্কেতস্থানে এসে হাজির হ'ল; লায়লাও সূর্য্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে সেই আগের মত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে' প্রাসাদের পশ্চাৎ-দ্বার খুলে বেরিয়ে এল—তার চোখে বহুদিনের নিরুদ্ধ হৃদয়-বহ্নির একটা অস্বাভাবিক আভা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। চাঁদ ওঠেনি সেদিন, কেবল তারাগুলোর অস্ফুট কোমল আলো ছড়িয়ে পড়েছে

[illegible] উপর। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সে চলেছে, তার বুক [illegible] করছে—নিশ্বাস পড়ছে বড় ঘন ঘন। তার পা' দু'খানির সেই গতিতে যেন তার সারাজীবনের গতিবেগ অধীর হয়ে উঠেছে—পা' দু'খানি যেন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বনের যেখানে আরম্ভ সেইখানে এসে সে দাঁড়ালো, দুইহাতে বুকখানা চেপে ধরলে সে। মজনুঁকে জানতে দেওয়া হবে না—সে কি রকম আকুল হয়ে ছুটে এসেছে। একটু দম ফিরে পেযেই সে আবার তেমনি ছুটে চলল। যেটুকু স্থির হয়ে নিয়েছিল, তা আর বেশিক্ষণ রইল না, বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে উঠল। এ সেই ফোয়ারা, যার ধারে চিরদিন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হয়েছে,—গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, তারার আলোয় তার সেই জলরাশির ঝকমকানি। এইবার সে এসে দাঁড়াল সেই খোলা জায়গাটার এক প্রান্তে; তার বেশবাস বিস্রস্ত হয়ে গেছে, কাকের পালকের মত তার কালোচুলের বাশ খুলে পড়েছে, তার বুক দুলছে ঢেউয়ের মত।

ফোয়ারার পাশ থেকে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে এল তীরের মত। লায়লার গা দুলছে, তার পা ঠিক থাকছে না। মজনুঁ যখন তাকে পাগলের মত বুকের ভিতর চেপে ধরলে তখন তার বুক থেকে কেবল একটা দীর্ঘ কাতর-ধ্বনি বেরিয়ে এল।

সে কি একটি মুহূর্ত্ত-কাল, না শতসহস্র যুগ? প্রেমে কি কালের মাপ আছে? কিন্তু সেই অনন্ত-মুহূর্ত্ত—সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরের সেই ক্ষণটি—তাদের জীবনের চরম-ক্ষণ হয়ে দাঁড়ালো, তাতেই সব শেষ হয়ে গেল। অধরে অধর স্পর্শ করতেই মজনুঁর চৈতন্য লোপ হল, সে পাগল হয়ে গেল। লায়লাও সেই একটি চুম্বনে মজনুঁর বাহুপাশের মধ্যেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। মজনুঁ তখন তাকে মাটীর উপর ফেলে দিয়ে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেল বন পার হয়ে মরুভূমির মাঝে; বহুদূর পর্য্যন্ত তার সেই চীৎকার শোনা যেতে লাগল—সে লায়লার নাম ধরে' ডাকছে!

লায়লা! লায়লা! লায়লা! তার সেই উন্মাদ-রব চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হ'তে লাগল, শেষে মরুভূমির সেই নৈরাশ্য-ভীষণ নিঃশব্দ নির্জ্জনতার মধ্যে সে লুটিয়ে পড়ল অবসন্ন হয়ে'। জায়েদ তার সেই ডাক শুনে অনুসরণ করেছিল—শেষে সে-ই তাকে খুঁজে বার করলে। কত দিন কত রাত তার সেবা করলে সে;

কিছুতেই কিছু হল না। দুঃখ যা করতে পারে নি, আনন্দ তাই করলে—এইবার সে সত্যিই পাগল হয়ে গেল।

লায়লার মূর্চ্ছাভঙ্গ হল। মরুভূমির দূর দূরান্তর থেকে তার নাম ধরে' উন্মাদের কণ্ঠে অনবরত সেই চীৎকার যখন সে শুনতে লাগল, তখন সেও এর আসল কারণ বুঝতে পারলে—শেষে শোকে দুঃখে মর্ম্মাহত হয়ে সেও ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার প্রাসাদে।

মাঝে মাঝে জায়েদ লায়লাকে মজনুঁর খবর এনে দিত, পাগল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার প্রেম যে কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি—এই সংবাদই সে পাঠাতো।

দিন-দিন লায়লার চোখদুটির দীপ্তি যেমন বাড়তে লাগল তেমনি তার গাল-দুখানি পাণ্ডুর হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে সে শুকিয়ে যেতে লাগল, শেষে একদিন তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে মজনুঁকে তার শেষ কথা জানাতে বলেছিল, সে কথা—মৃত্যুহীন প্রেমের কথা; এই মাটিতে-গড়া সুন্দর দেহের ঘরে সে যত দুঃখই পা'ক প্রেমের মৃত্যু নেই। লায়লা বললে—

"তাকে বোলো, আমার দেহটাকে সেই ফোয়ারার ধারে কবর দেওয়া হবে—সেই যেখানে সে আমায় প্রথম তার দুই বাহু দিয়ে বুকে বেঁধেছিল। আর ঠিক এই কথাগুলি তাকে ভালো করে ডেকে বোলো—মজনুঁ, ঐ উপরের পানে চোখ তুলে চাও, ঐ দেখ, হোথায় আলোর দেশ! আর ঐ দেখ সূর্য্যালোকে ঐ যে ফোয়ারা উথলে উঠছে, ওর জলেরও যেমন শেষ নেই, তেমনই ওর ধারে প্রেমিক-প্রেমিকাদের যে মিলন হয় সে মিলনে বিচ্ছেদ নেই। ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে'।" এই তার শেষ কথা, এই কথাই ধ্যান করতে করতে তার আত্মা চলে' গেল সেই প্রেমের তীর্থে, সেই আরেক ফোয়ারার ধারে, যার থেকে নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে চির-মিলনের অমৃতনিঃস্যন্দী বারিধারা।

মরুভূমিতে তখন ভোর হয়ে আসছে—এমন সময়ে তার উপর দিয়ে কারা দুজনে ছুটে চলেছে ওই? দুজনেরই হাতে হাত বাঁধা; একজনের মুখ দেখলেই বোঝা যায়, প্রেমের আতিশয্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। শেষে মজনুঁ জায়েদকে

পিছনে ফেলে দৌড়তে লাগল—দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ করলে সেই গভীর অরণ্যে। একটু পরেই সে পৌঁছল এসে সেই খোলা জায়গাটিতে—যেখানে ফোয়ারা হ'তে জলধারা উৎসারিত হচ্ছে। ঠিক যেখানটিতে সে লায়লাকে প্রথম বুকে চেপে ধরেছিল, তার খুবই চেনা ছিল সে জায়গাটি; এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি সদ্যনির্ম্মিত কবর। এই স্থানটির উপরে সে আছড়ে পড়ল বুক দিয়ে—এতদূর ছুটে আসার জন্যে অবসন্ন হয়ে নয়, এর কারণ—তার উন্মাদ-ব্যাধি, আর তার অসীম দুঃখ। "লায়লা! লায়লা!"—বুক-ফাটা স্বরে গুমরে গুমরে সে ডাকতে লাগল। "আমি যাচ্ছি—এই যাই! রাত্রির মতো কালো পর্দ্দা দিয়ে তুমি তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ফ্যালো, আলোর অসীম প্রান্তরে তুমি তোমার সুন্দর দেহ লুকিয়ে রাখো—দেখ আমি তোমাকে খুঁজে পাই কি না!"

ক্রমে সূর্য্যোদয় হ'লে জায়েদ এসে দাঁড়াল সেই কবরটির পাশে—তার চোখ জলে ভরে' উঠেছে, সেই চোখ-ভরা জলের ভিতর দিয়ে সে চেয়ে রইল মাটির উপর লুটিয়ে-পড়া প্রভুর পানে। দরদর ধারে জল পড়ছে তার দুই চোখ বেয়ে—সেই মৃতদেহের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল শোকার্ত্ত জায়েদ।

ক্রৌঞ্চ-মিথুন

'আর্তোয়া' আর ফ্লাণ্ডার্সের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা গিয়েছে, সে যেন আর শেষ হ'তে চায় না—কী একঘেয়ে একটানা! কোনখানে একটি গাছ নেই, রাস্তার দু'পাশে পয়নালাও নেই—কেবল মাঠ আর মাঠ! আর আগাগোড়া লালরঙের কাদা। ১৮১৫ সালের মার্চ্চ মাসে এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা আজও ভুলতে পারিনি।

আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছিলাম। আমার গায়ে বেশ চটকদার শাদা ওভার-কোট আর লালকুর্ত্তি; মাথায় কালো রঙের উঁচু-টুপি, কোমরে গোটা-দুই পিস্তল, আর একখানা লম্বা তলোয়ার। চার-দিন চার-রাত্রি অবিশ্রাম বৃষ্টি মাথায় ক'রে পথ চলেছি। বেশ মনে পড়ে, আমি খুব চীৎকার ক'রে একটা গান ধরেছি—গানের ধুয়োটা হচ্ছে "বাহবা কি বাহবা!"—বয়সটা তখন খুবই কাঁচা কিনা! রাজার পক্ষে তখন আছে কেবল বাচ্ছা আর বুড়োর দল—সম্রাটের (নেপোলিয়ন) কল্যাণে জোয়ানেরা বড় একটা কেউ আর বেঁচে নেই।

আমার দলের লোকেরা তখন রাজা 'লুই'-এর পিছন-পিছন অনেকখানি এগিয়ে পড়েছে—সামনের দিকে আকাশের কিনারার কাছে তাদের লাল কুর্ত্তি তখনো দেখা যাচ্ছে। আর পিছন পানে আকাশের অপর পারে বোনাপার্ট-সৈন্যের বর্শার মাথায় ত্রিবর্ণ নিশানগুলো থেকে থেকে চোখে পড়ছে—তারা আমাদের পিছু নিয়েছে, খুব সাবধানে একটু একটু ক'রে অগ্রসর হচ্ছে। আমার ঘোড়ার একটা নাল খু'লে যাওয়ায় আমি পিছিয়ে

পড়েছিলাম। ঘোড়াটা ছিল যেমন জোয়ান তেমনি তাজা; সঙ্গীদের ধ'রে ফেল্‌বার জন্যে খুব জোরে হাঁকিয়ে চলেছি। একবার ট্যাঁকে হাত দিয়ে প্রাণটা খুশী করে নিলাম—থলিটি গিনি-মোহরে ভরা! তলোয়ারের লোহার খাপখানা যখন থেকে-থেকে রেকাবের উপর লেগে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠছিল, তখন বুকটা সত্যিই খুব চওড়া হ'য়ে উঠছিল।

জলও থামে না, আমার গানেরও বিরাম নেই। তবু নিজের গলা নিজে শুন্‌তে কতক্ষণ ভালো লাগবে? কাজেই শেষটা চুপ কর্‌তে হ'ল। ঝুপ-ঝুপ ক'রে ত বৃষ্টি হচ্ছে, আবার, গাড়ীর চাকা চ'লে চ'লে রাস্তার মাঝ-খানে যেসব খানা-খন্দ হয়েছে, তার ভিতরে ঘোড়ার পা ঢু'কে গিয়ে কেবলি ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ হচ্ছে। শেষকালে, 'আর পারিনে'—ব'লে রাশ টেনে ধ'রে একটু আস্তে-আস্তে চল্‌তে লাগ্‌লাম। হাঁটু-পর্য্যন্ত উঁচু বুট-জোড়াটার গায়ে গেরী-মাটির মতন লাল কাদা পুরু হ'য়ে উঠেছে—জুতোর ভিতরটা ত' জলে টইটুম্বুর! আমার কাঁধের উপরে সোনার কাজ-করা তক্‌মা-খানার দিকে একবার চেয়ে একটু সোয়াস্তি বোধ হ'ল; কিন্তু তা'র অবস্থা দেখে' একটু দুঃখও হ'ল—ক্রমাগত জলে ভিজে' ভিজে' সেগুলো শক্ত কাঠ হ'য়ে উঠেছে!

ঘোড়া একবার মাথাটা নীচু কর্‌লে, আমিও সেইসঙ্গে ঘাড় হেঁট করলাম, অম্‌নি হঠাৎ—সেই যেন প্রথম মনটায় কেমন হ'ল! একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগ্‌লাম—এ যাচ্ছি কোথায়? কোথায় যে চলেছি এ ভাবনা ত' একবারও মাথায় ঢোকেনি! আমার দল যাচ্ছে আমিও চলেছি—ব্যস! সেটা আমার কর্ত্তব্য কাজ। হাঁ কর্ত্তব্যই বটে!—প্রাণের ভিতর কেমন একটি গভীর স্বস্তি বোধ করলাম—কর্ত্তব্যের নামে বেশ যেন শান্তি পেলাম! তখনই মনে হ'ল, এই ত চারিদিকে দেখছি কত বড়ঘরের ছেলে—যারা কখনো কষ্ট করেনি তা'রাই হাসিমুখে এই দারুণ অনভ্যাসের দুঃখ সহ্য কর্‌ছে; কত সম্ভ্রান্ত বংশের লোক ধনদৌলত সুখ-সুবিধা—যা নিশ্চিত, তাই ছেড়ে এই অনিশ্চিত অদৃষ্টকে বরণ ক'রে নিয়েছে। আমিও তেমনি—নিজের বিশ্বাস ও পৌরুষের খাতিরে, মান-রক্ষার জন্যে, কর্ত্তব্য মনে ক'রে—নিজের সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তি পাচ্ছি! এ কাজের দস্তুরই এই। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হ'ল, লোকে আত্ম-বলিদান জিনিষটাকে যতটা শক্ত

ব'লে মনে করে; কাজটা আসলে তা'র চেয়ে ঢের সোজা—সেজন্যে অনেকেই ওটা করে, দেখা যায়।

আবার ভাবতে লাগলাম—আচ্ছা এই আত্ম-বিসর্জ্জন করার প্রবৃত্তিটা মানুষের সহজ ধর্ম্ম কি না? এই যে পরের আদেশ মেনে চলা—পরবশ হওয়া—এর অর্থ কি? নিজের ইচ্ছে ব'লে কিছু রাখ্‌ব না, নিজের বুদ্ধিটাও পরকে সঁপে দেবো—সেটা যেন একটা মস্ত ভার, একটা বোঝা! এই বোঝা ঝেড়ে ফেলে যেন হাঁফ ছাড়ার মতন নিশ্চিন্ত হওয়া—এভাব আসে কোথা থেকে? মানুষের অভিমানে ঘা লাগে না? আমি বেশ ক'রে বু'ঝে দেখ্‌লাম, জীবনে প্রায় সর্ব্বত্রই মানুষ এই অন্ধ প্রেরণার বশে, অনেক দিকে অনেক কাজ করছে বটে, কিন্তু সৈনিক জীবনে এই প্রবৃত্তি যে রকম পূর্ণ ও দুর্দ্দম হ'য়ে ওঠে, এমন আর কোথাও নয়—এ অবস্থায় মানুষ যেন সর্ব্ব-সমর্পণ ক'রে বসে! আপনার ব'লে তা'র যেন কিছুই নেই—কাজ, কথা, ইচ্ছা, এমন কি চিন্তাটি পর্য্যন্ত! সমাজে বা সংসারে যে-শাসন মেনে চলতে হয় তার মধ্যে বুদ্ধি-বিচারের অবকাশ আছে—এমন অবস্থা প্রায়ই হয় যাতে নিয়ম ভঙ্গ করাও চলে। এমন ত দেখা যায়, কোন একটা কাজ করার সময় খুব অনুগত স্ত্রীও স্বামীর অবাধ্য হয়, আইনেও সে অবাধ্যতা দণ্ডনীয় নয়। কিন্তু সৈনিক যখন উপরওয়ালার হুকুম তামিল করে, তখন তা'কে একটি অসম্ভব কাজ করতে হয়—হুকুমটি মেনে নেবার সময় নিজের ইচ্ছেটা একেবারে মু'ছে' ফেল্‌তে হয়, আবার সেই একই মুহূর্ত্তে হুকুম তামিল করার সময়, নিজের অসীম ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুল্‌তে হয়! সে যখন যুদ্ধ করে, তখন যেন নিয়তির মত অন্ধ হয়েই তাকে অস্ত্রচালনা করতে হয়। এই অন্ধ আত্মবিসর্জ্জনের ফলে সৈনিকের জীবনে যে কতরকমের ভীষণ ঘটনা ঘটে—তা'কে যে কি কঠোর, কি নির্ব্বিকার হয়ে উঠতে হয়, আমি তাই মনে-মনে ভেবে দেখছিলাম।

এম্‌নি ভাবতে ভাবতে চলেছি। রাস্তাটা সোজা সাম্‌নে প'ড়ে আছে—একটা বাড়ী নেই, গাছ নেই—যেন পাঁশুটে রঙের ক্যাম্বিসের উপর একটা লাল ডোরা! এই ডোরাটা বেশ ক'রে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। প্রায় তিন-পোয়া পথ দূরে একটা কালো দাগ নড়ছে বলে বোধ হ'ল। একটু আহ্লাদ হ'ল—একজন কেউ ত'

বটে! দেখলাম এই কালো দাগটা আমারই মতন "লীল"-সহরের দিকে চলেছে! ঘোড়াটা আবার একটু জোরে হাঁকিয়ে জিনিষটার অনেকটা কাছে এসে পেঁছিলাম। দেখে মনে হল, একটা গাড়ীর মত কি চলেছে। বড় ক্ষুধা পেয়েছিল—ভাবলাম হয় ত' কোনো খাবার-ওয়ালীর গাড়ী, তাই ঘোড়াটাকে আরও একটু জোরে হাঁকিয়ে দিলাম।

প্রায় একশো হাত কাছাকাছি এসে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, একটা শাদা-রঙের কাঠের গাড়ী—তিন ধনুকের ছই, কালো অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা; যেন ঢাকা-দেওয়া একটি শিশুর বিছানা বসানো রয়েছে দু'খানি চাকার উপর; একটা টাটুঘোড়ার লাগাম ধ'রে একটি লোক অতি কষ্টে কাদার উপর দিয়ে সেটাকে টেনে নিয়ে চলেছে। আরও কাছে এসে লোকটাকে বেশ ক'রে দেখতে লাগ্‌লাম।

তা'র বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি ব'লে বোধ হ'ল—শাদা গোঁফ, দেহ বেশ মজবুত ও লম্বা। পোষাকটা পদাতি-সৈন্যের সর্দ্দারদের মতন—অতিশয় জীর্ণ নীলরঙের খাটো ওভার-কোটের ভিতর থেকে মেজরের তক্‌মা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। চেহারা রুক্ষ হ'লেও প্রাণটা কঠোর ব'লে মনে হ'ল না—সৈন্যদলে এমন ধরণের চেহারা অনেক দেখা যায়। লোকটা আমার পানে একবার আড়চোখে চেয়েই গাড়ীর ভিতর থেকে থপ্‌ ক'রে একটা বন্দুক বার ক'রে ঘোড়া টান্‌লে—টেনেই গাড়ীটার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল, সেইটেই হ'ল তার আড়াল। কিন্তু তার পোষাকের এক জায়গায় ফাঁসের মতন ক'রে একটু শাদা ফিতে আটকানো রয়েছে দেখে আমার কোনো চিন্তা কর্‌তে হ'ল না, তখ্‌খুনি আমার লালকোর্ত্তার হাতাটা তা'কে দেখিয়ে দিলাম। লোকটা তখন বন্দুকটা গাড়ীর ভিতর রেখে ব'লে উঠ্‌ল—

"ওঃ, তাহলে ত আর কথাই নেই। আমি মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি ও-দলের—ওই যারা পিছু নিয়েছে। একটু মদ্যপান কর্‌বে?"

তা'র গলায় বোতলের-মতো-করা একটা নারকেলের মালা ঝুলছিল—বেশ কাজ-করা, মুখটা রূপোয় বাঁধানো; সেটি যেন তা'র একটা

দেখাবার জিনিষ। আমার হাতে তুলে' দিতেই আমি একরকম শাদা-রঙের পান্‌সে মদ বেশ এক চুমুক টেনে নিয়ে সেটা আবার তা'কে ফিরিয়ে দিলাম।

সে পান কর্‌তে কর্‌তে ব'লে উঠ্‌ল—"রাজার জয় হোক!—তাঁর দয়াতেই ত আজ মেজর হয়েছি। এই তক্‌মাখানা বই আর কি আছে আমার? আবার যাচ্ছি সেই পল্‌টনটির ভার নিতে—কাজের বেলায় কাজ করতে হবে ত?"—এই ব'লে সে তা'র টাট্টুটাকে তাড়া দিতে লাগ্‌ল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে একটু জোরে হাঁকিয়ে চললাম। আমি কেবল ক্রমাগত তা'র দিকে চাইতে লাগ্‌লাম, কথা একটিও কইলাম না।

প্রায় মাইল-খানেক এই রকম নিঃশব্দে চলেছি; তারপর সে যেমন টাট্টুটাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে একটু দাঁড়াল, আমিও থেমে গেলাম। আমার বুটজোড়াটা নিংড়ে জল বার কর্‌ছি দে'খে সে বল্‌লে,

"তোমার বুট যে পায়ে কামড়ে ধরেছে হে!" আমি বললাম, "চার রাত্রি পা থেকে খোলা হয়নি কিনা!"

"ছোঃ! আর হপ্তাখানেক পরে ওসব আর লক্ষ্যই থাক্‌বে না। আর দেখ, যে-রকম সময়-কাল পড়েছে, তোমার সঙ্গে যে আর কেউ নেই এও একটা বাঁচোয়া। আমার ওটাতে কি আছে বল্‌তে পারো?"

আমি বললাম "না।"

"একটা স্ত্রীলোক।"

আমি যেন কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইনি এমনিভাবে বল্‌লাম—"বটে?"—ব'লে যেমন যাচ্ছিলাম তেম্‌নি চল্‌তে লাগ্‌লাম, সেও আমার পিছু-পিছু আস্‌তে লাগ্‌ল।

ভয়ানক ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে দেখে তা'কে আমার ঘোড়াটায় উঠ্‌তে বললাম। সে তাই শুনে আমার রেকাবের কাছে স'রে এসে আমার হাঁটুতে এক থাপ্পড় মেরে ব'লে উঠ্‌ল—

"আরে, তুমি ত বেশ ছোকরা হে!—তবু ত তুমি লাল-যাত্রীর দলে।"

আমাদের মতন লাল-কোর্ত্তার বাবু-কর্ম্মচারীদের এই নাম দেওয়ায়, এবং তা'র কণ্ঠস্বরের তিক্ততায় আমি বেশ বুঝ্তে পারলাম, এইসব সাধারণ সৈনিকের চক্ষে আমাদের নবাবী চাকরি কি-রকম বিষ হ'য়ে উঠেছে!

সে বলতে লাগল—"আমি তোমার ঘোড়ায় চড়তে চাইনে—আমার ত ঘোড়ায়-চড়া অভ্যেস নেই, আর ও আমার কাজও নয়।"

"কেন, মেজর? তোমাদেরও ত' ঘোড়ায় চড়তে হয়?"

"তুমিও যেমন! বছরে সেই একবার তদারকের সময় একটা ভাড়াটে ঘোড়ায় চড়ি বইত নয়! আমি বরাবর জাহাজে ছিলাম, এই শেষের দিকে পদাতি-সৈন্যে কাজ করছি। ওসব ঘোড়ায় চড়া-টড়া আমার কর্ম্ম নয়।"

এর পর সে প্রায় আরও কুড়ি পা চ'লে এল; এক একবার আমার দিকে আড়ে-আড়ে তাকায়, ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে, শেষটা আপনিই বল্‌তে লাগ্‌ল,

"আরে বাঃ! তোমার যে দেখছি কিছুই জান্‌তে ইচ্ছে করে না! এই একটু আগে তোমাকে যা বল্‌লাম তা'তে তোমার একটুও তাক লাগ্‌ল না?"

"আমি অবাক্ বড় একটা কিছুতে হইনে।"

"বটে? আমার জাহাজ ছেড়ে-আসার গল্পটা যদি বলি ত, কেমন অবাক্ হও না দেখি।"

আমি বল্‌লাম, "আচ্ছা, ব'লেই দেখ না কেন,—তাতে তুমিও একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে, আমিও কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে পারবো যে, বৃষ্টির জল আমার পিঠের দাঁড়ায় পর্য্যন্ত বস্‌ছে, আর জম্‌ছে এসে আমার গোড়ালির তলায়।"

মেজর লোকটা বড় ভালো। আমার কথায় তা'র প্রাণটা ছোটো ছেলেদের মত খুসী হ'য়ে উঠ্‌ল; গল্পটা বল্‌বার জন্যে বিশেষ করে তৈরী হয়ে নিলে; মাথার টুপিটার অয়েলক্লথখানা ঠিক ক'রে নিয়ে কাঁধটা একবার ঝাড়া দিলে; তার পর নারকেলের মালা থেকে আর এক চুমুক

টেনে নিয়ে টাট্টুটার পেটে আর একটা খোঁচা দিয়ে, সে তার গল্প জুড়ে দিলে।

"তোমাকে প্রথমেই একটা কথা ব'লে রাখি। আমার জন্ম হয় ব্রেষ্ট-শহরে। আমার বাপ ছিল সৈনিক; আমিও ন' বছর বয়সে, আধা-ভাতা আর আধা-মাইনের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হই। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই আমার সমুদ্দুর বড় ভালো লাগ্‌ত। তাই, একদিন—ভারি পরিষ্কার রাত্রি—আমি তখন ছুটিতে—পালিয়ে গিয়ে এক মহাজনী জাহাজে উঠে' তারই খোলের মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। মাঝ-সমুদ্দুরে পাড়ি দেবার সময় কাপ্তেন আমায় দেখ্‌তে পেলে; তখন আর কি করে! জলে ফেলে না দিয়ে আমাকে তার ক্যাবিনের চাকর ক'রে নিলে। দেশে যে-সময়টা রাজ্যিসুদ্ধু ওলট-পালট হ'য়ে গেল, তখন আমার বেশ একটু উন্নতি হয়েছে; প্রায় পনেরো বছর সমুদ্দুর পারাপার ক'রে, তখন নিজে একটি ছোটোখাটো জাহাজের কাপ্তেন হয়েছি। আগে যে সব খাস-সরকারী যুদ্ধ-জাহাজ ছিল—খুব উঁচু-দরের বস্তুর ছিল সে!—হঠাৎ তাতে লোকের অভাব হ'ল; তখন মহাজনী জাহাজ থেকে লোক নিতে লাগ্‌ল; সেই সময় আমাকেও একখানা ছোটো যুদ্ধের জাহাজে কাপ্তেন ক'রে দিলে। জাহাজখানার নাম ছিল 'মারা'।

"১৭৯৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর হুকুম এল—আমেরিকার 'কাইয়েন'-দেশে যাত্রা কর্‌তে হবে। সঙ্গে যাবে ষাটজন সৈন্য,—আর একটি লোক যাবে, তা'র নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েছে; এই লোকটিকে বিশেষ নজরে রাখতে হবে—শাসন-পরিষদের যে-চিঠিতে এই হুকুম ছিল, তা'র ভিতরে আর-একখানা লেফাফা ছিল, এই লেফাফার উপরে তিনটি লাল শীল-মোহরের ছাপ; এই ভিতরের চিঠিখানা উপস্থিত খুলতে মানা ছিল,—বিষুবরেখা পার হবার এক ডিগ্রির মধ্যে খুলতে হবে, তা'র আগে নয়।

"কোনো আজগুবি বিশ্বাস বা কুসংস্কার কোনো কালেই আমার ছিল না। তবু এই খামখানা দেখলেই কেমন ভয় হ'ত। আমার কামরায় বিছানার ঠিক্ উপরেই একটা কম দামের ইংরেজী ক্লক্-ঘড়ি ছিল, তারই কাঁচের ডালার ভিতর চিঠিখানা রেখে দিয়েছিলাম।

"জাহাজের কামরার ভিতরটা কেমন, জানো ত? জান্‌বেই বা কি ক'রে, কিই বা জানো! তোমার বয়েস্‌ই বা কি!—বড় জোর ষোলো? প্রত্যেক

জিনিষটির একটি ক'রে পেরেক আছে, তাইতে আট্‌কে রাখতে হয়; কোনো-কিছু নড়বার চড়বার যো নেই,—জাহাজ যতই দুলুক না কেন, একটি জিনিষও একটু স'রে যাবে না। একটা সিন্দুক ছিল আমার শোবার জায়গা, সেইটে খু'লে তা'র মধ্যে আমি ঘুমোতাম; আবার বন্ধ কর্‌লেই সেইটে হ'ত আমার আরাম-চৌকি—তা'র উপর ব'সে তোফা চুরুট টান্‌তাম। কামরার মেজেটা ছিল মোম দিয়ে মাজা, ঘ'সে ঘ'সে মেহাগিনির মতন চক্‌ চক্‌ কর্‌ত—যেন একখানা আয়না। এই ঘরটুকুতে ব'সে আমোদের অন্ত ছিল না। গোড়ার দিকে খুব ফুর্ত্তিতেই থাকা গিয়েছিল, কেবল যদি—কিন্তু সে-কথা এখন নয়।

"ক'দিন ধ'রে বেশ সুবাতাস ব'চ্ছিল। আমি ক্লক-ঘড়িটার মধ্যে চিঠিখানা আট্‌কে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, এমন সময় নির্ব্বাসন-দণ্ডের যাত্রীটি একটি বছর-সতেরোর সুন্দরী মেয়ের হাত ধ'রে আমার কামরায় ঢুক্‌ল। ছোক্‌রার বয়স বল্‌লে, উনিশ; খাসা চেহারা! কেবল মুখখানা যা একটু ফ্যাকাশে, আর রংটা—পুরুষ মানুষের পক্ষে একটু যেন বেশী ফুটফুটে। তা হ'লেও সে যে একটা মরদ-বাচ্ছা—দরকার হ'লে সে যে অনেক পুরুষের বাবা হতে পারে, তা'র পরিচয় সে পরে দিয়েছিল। তা'র সেই ছোটো বউটির বাহুতে তা'র নিজের বাহু বাঁধা,—আহা, বউ ত' নয়, যেন ছেলে-বেলার খেলার সাথী! বড় সরল, বড় মন-খোলা তার ভাবখানি, চোখে-মুখে হাসি উছ্‌লে উঠছে! তাদের দুটিকে দে'খে মনে হ'ল, যেন এক-জোড়া বনের পায়রা। আমার বড় ভালো লাগল, বল্‌লাম—

'বলি, বাচ্ছারা—কি মনে ক'রে? বুড়ো কাপ্তেনটার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে এসেছ?—এস, এস। আমি তোমাদের অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু সে এক-রকম ভালোই হয়েছে—খুব আলাপ জমাবার সময় পাওয়া যাবে। এই কোট-খোলা অবস্থাতেই মহিলাটির অভ্যর্থনা কর্‌তে হ'ল, এজন্যে ভারি লজ্জিত হচ্ছি।—আরে, এই এক চিঠি নিয়ে বড় হাঙ্গামায় পড়েছি, এটাকে পেরেক মেরে ঐখানটায় আট্‌কে রাখ্‌তে হবে; এস না, তোমরাও একটু দেখ না।'

"দু'জনেই বড় লক্ষ্মী। ছেলেমানুষ বরটি তখুনি হাতুড়ি ধর্‌লে, আর ছোট্ট বৌটি আমার কথামতন পেরেকগুলো তু'লে দিতে লাগ্‌ল। জাহাজের

দোলা লেগে ক্লকটা একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ কর্‌ছে দেখে, মেয়েটির হাসি দেখে কে! বলে, 'রাইট্—লেফ্ট্! কেমন কাপ্তেন!' আজও আমি তা'র সেই ছোটো কণ্ঠের আওয়াজ যেন পরিষ্কার শুন্‌তে পাচ্ছি—'রাইট্—লেফ্ট্!—কেমন কাপ্তেন?'—সে আমাকে ঠাট্টা কর্‌ছিল। আমি বললাম, 'দাঁড়াও ত' দুষ্টু! তোমার বরকে দিয়ে এখ্‌খুনি বকুনি খাওয়াচ্ছি, দেখবে?'— তাই শু'নে সে তা'র হাত-দু'খানি দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে তা'কে চুমু খেলে—ভারি চমৎকার! সত্যি!—এম্‌নি ক'রে আমাদের প্রথম পরিচয় হ'ল, এক নিমেষেই ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেল।

"সে-বার মাঝ-সমুদ্রে পাড়ি জমাতে কোনো কষ্ট হয়নি, জল-বাতাস খুব ভালো ছিল। আমি রোজ খাবার সময় এই দুটি প্রণয়ীকে নিয়ে খেতে বস্‌তাম। বিস্কুট ও মাছ খাওয়া শেষ হ'লে পর, এই দুটি অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী এম্‌নি ক'রে এ ওর পানে চেয়ে থাক্‌ত, যেন এর আগে কেউ কাউকে আর কখনো দেখেনি। তখন আমি খুব জোর হাসি-ঠাট্টা কর্‌তাম, তা'রাও সঙ্গে-সঙ্গে হাস্‌ত। তাদের সুখের ব্যাঘাত যেন কিছুতেই হয় না—যা করো তা'তেই খুসী! সে ভালোবাসা একটা দেখবার জিনিষ! একটি দড়ির দোলা-বিছানায় তা'রা দুটিতে শুয়ে ঘুমোত—আমার ওই গাড়িতে ঝোলানো ভিজে রুমালখানায় ওই যে আপেল-দুটো বাঁধা রয়েছে, ওরা যেমন গায়ে-গায়ে গড়াগড়ি কচ্ছে - জাহাজের দোলানিতে তাদেরও ওই রকম অবস্থা হ'ত। আমিও তোমার মতন ছিলাম, কিছু জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌বার ইচ্ছে হ'ত না। কি দরকার?— আমি পারাপারের মাঝি বই ত নয়! লোকের নাম-ধামের খবরে আমার কাজ কি বাপু?

"মাস খানেক যেতে না যেতে, তাদের দুটির উপর আমার সন্তানের মতন মায়া প'ড়ে গেল। দিনের মধ্যে যখনি ডাকি, দু'টিতে মিলে আমার কাছে এসে বসে। ছোকরাটি আমার হিসেব-পত্তরের কাজ করে' দেয়.— অল্পদিনেই একাজে সে আমারই মতন লায়েক হ'য়ে উঠেছিল, আমার ত দেখে' তাক লাগ্‌ত। ছেলেমানুষ বউটি একটা পিপের উপর ব'সে-ব'সে সেলাইএর কাজ কর্‌ত।

"একদিন ক'জনে মিলে' এইরকম ব'সে আছি, মাঝখান থেকে হঠাৎ আমি ব'লে ফেল্‌লাম—

'আচ্ছা, এই যে আমরা ব'সে আছি—এ দেখে' মনে হয় না কি যে, আমরা ক'টিতে মি'লে যেন একই পরিবার! আমি কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাইনে, তবু একথা বোধ হয় ঠিকই যে, তোমাদের হাতে পয়সা-কড়ি বিশেষ-কিছু নেই; আর, তোমাদের দুজনের এমন সুখী শরীর—তোমরা কি 'কাইয়েনে' গিয়ে দিন-মজুরের মত কোদাল-কুড়ুল ধ'রে দিন গুজরান কর্‌তে পার্‌বে? আমি হ'লে অবিশ্যি সব পার্‌তাম, আমার শরীর জলে ভিজে, রোদ্দুরে পুড়ে' একেবারে ঝুনো হ'য়ে গিয়েছে। আমাকে তোমাদের বোধ হয় ভালোই লাগে? যদি বলো ত, জাহাজ-ফাহাজ ছেড়ে দিয়ে, সেখানে গিয়ে তোমাদের নিয়ে সংসার পাতি। আমার ত থাক্‌বার মধ্যে একটা কুকুর আছে; আপনার বলতে কেউ নেই—তা'তে সুখ পাইনে। তবু যাহোক তোমাদের পেয়ে এমন একা থাক্‌তে হবে না। আমি তোমাদের অনেক কাজে লাগ্‌ব; তা-ছাড়া কিছু সঞ্চয় করিনি এমন নয়—তা'তেই চ'লে যেতে পারে। যখন শেষের ডাক আস্‌বে, তখন তোমাদেরই সব দিয়ে যাবো।'

"আমার কথা শু'নে তা'রা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল—যেন বিশ্বাসই কর্‌তে পার্‌লে না। মেয়েটির যেমন অভ্যেস—ছু'টে গিয়ে তা'র স্বামীর গলাটি জড়িয়ে ধরে' কোলের উপর গিয়ে বস্‌ল, তা'র মুখ রাঙা হ'য়ে উঠেছে, একেবারে কাঁদো-কাঁদো! স্বামীর চোখেও জল, সে তা'কে বুকে চেপে ধর্‌লে। স্ত্রী তখন কানে-কানে কি বল্‌তে লাগ্‌ল; তার খোঁপাটি কাঁধের উপর লতিয়ে পড়েছে—দড়ির পাক হঠাৎ খু'লে গেলে যেমন হয়, তা'র চুলগুলি তেম্‌নি আলগা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়্‌ল।—সে কি চুল!—একেবারে সোনার রং! দুটিতে চুপি-চুপি কথা কইতে লাগ্‌ল। ছোকরাটি মাঝে-মাঝে তার স্ত্রীর কপালে চুমু খাচ্ছে, মেয়েটির চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে। আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না, শেষে ব'লে উঠলাম, 'কি গো, তোমাদের সুবিধে হবে না বুঝি?'

"স্বামীটি বললে, 'কিন্তু—কিন্তু—তোমার বড় দয়া, কাপ্তেন! তবে কিনা—তুমি কি কয়েদী নিয়ে ঘর করতে পার্‌বে? তা-ছাড়া—!' ছোকরা মুখ হেঁট কর্‌লে।

"আমি বল্‌লাম, 'তোমরা কি এমন অপরাধ করেছ যার জন্যে দ্বীপান্তরের হুকুম হয়েছে, সে আমি জানিনে,—এর পরে কখনো আমায় বলতে ইচ্ছে হয় বোলো, না বল্‌তে হয় বোলো না। আমার ত মনে হয় না, তোমরা

একটা ভয়ানক পাপের বোঝা বইছ; বরং একথা আমি বল্‌তে পারি যে, আমার জীবনে আমি এমন অনেক কাজ করেছি যার তুলনায় তোমরা নিষ্পাপ। অবিশ্যি তাই ব'লে যতক্ষণ এই জাহাজে আমার হেপাজতে তোমরা আছ, ততক্ষণ আমি যে তোমাদের ছেড়ে দেবো, তা ভেবো না, —বরং দরকার যদি হয়, ত তোমাদের ওই মাথা-দুটো একজোড়া পায়রার মুণ্ডুর মতন অনায়াসে উড়িয়ে দেবো। কিন্তু এই সারেঙের পোষাক যখন খু'লে ফেল্‌ব, তখন কেই বা মানে হুকুম, আর কেউ বা মানে হাকিম!'

"সে বল্‌লে, 'কি জানো কাপ্তেন, আমাদের সঙ্গে পরিচয় থাকাটাই তোমার পক্ষে এক বিপদ্‌। আমরা যে এত হাসি—সে আমাদের বয়সের গুণে। আমাদের সুখী ব'লে মনে হয়, তা'র কারণ—আমরা দু'জনা দু'জনকে ভালোবাসি। সত্যি বল্‌তে কি, এক-একসময় বরাতে কি আছে তাই ভেবে আমি আকুল হই—কি জানি আমার 'লরা'র শেষটা কি হবে!'

"এই ব'লে সে তা'র বালিকা-স্ত্রীর মাথাটি বুকে একবার চেপে ধর্‌লে, ধ'রে বল্‌লে, 'কাপ্তেনকে কথাটা ব'লেই ফেল্‌লাম; তুমিও কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌তে, লরা?'

"আমি চুরুটটা হাতে ক'রে উ'ঠে দাঁড়ালাম, চোখ দুটো ভিজে আস্‌-ছিল—ওটা আবার আমার সয় না। বল্‌লাম, 'ওসব কথা এখন রাখো। ক্রমে সব কেটে যাবে। তামাকের ধোঁয়া যদি মহিলাটির সহ্য না হয় তবে অনুগ্রহ ক'রে উনি কেন একটু স'রে যান না। তাই শু'নে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল; তা'র মুখখানি লাল হ'য়ে উঠেছে, চোখের জলে ভাস্‌ছে—ছোটো ছেলেদের ধমকালে যেমন হয়। সে তখন ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'যাই বলো, তোমাদের মতন লোকেরও মাথা গুলিয়ে যায়!—বলি, চিঠিখানার কি হ'ল?' কথাটায় আমার বড় লাগ্‌ল, আমার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত টন্‌ টন্‌ ক'রে উঠ্‌ল। বল্‌লাম,

'কি সর্ব্বনাশ! আমি ত সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম! আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি ত! এর মধ্যে যদি বিষুবরেখার এক ডিগ্রি পেরিয়ে গিয়ে থাকে,

তা হ'লে ত নিস্তার নেই,—জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া গতি নেই। ভাগ্যিস মনে ক'রে দিয়েছ! বাঁচালে, লক্ষ্মীটি!'

"তাড়াতাড়ি জলপথের ছকখানা খুলে দেখ্‌লাম, এখনো সে-জায়গায় পৌছতে এক হপ্তা লাগ্‌বে। আমার মাথাটা হাল্কা হ'য়ে গেল, কিন্তু কি জানি কেন, বুকটা ভারি হ'য়েই রইল। বল্‌লাম, 'আর ত কিছু নয়, কর্ত্তাদের কাছে হুকুমের একটুখানি এদিক ওদিক হবার জো নেই। এবার থেকে আমি ঠিক হ'য়ে রইলাম, আর ভুল হবে না।'

তিন জনেই চিঠিখানার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম—যেন সেটা কখন কথা ক'য়ে ওঠে! একটা ব্যাপাব দে'খে আশ্চর্য্য হলাম। ঠিক সেই সময়ে ছাদের উপরকার ঘুলঘুলি দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ল ঠিক চিঠিখানার উপর, সেই আলোতে লাল শীলমোহর-তিনটে যেন কি-রকম দেখাচ্ছিল!—যেন আগুনের ভিতর থেকে একখানা মুখ আমাদের পানে চেয়ে রয়েছে! আমি একটু আমোদ করে' বল্‌লাম, 'চোখগুলো যেন কপাল থেকে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌ছে, নয়?'

"মেয়েটি ব'লে উঠ্‌ল, 'ওগো, দেখ দেখ, ঠিক যেন টক্‌টকে রক্তের দাগ!'

"তা'র স্বামী তখন তা'র একটি বাহু নিজের বাহুতে পরিয়ে জবাব দিলে, 'ছি, লবা! ও আবার কি কথা! রক্ত হবে কেন? ও যেন ঠিক বিয়ের চিঠির উপরকার লাল রঙ্‌। এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বে এস দিকি। ঐ চিঠিখানা দে'খে অমন মন খারাপ হ'ল কেন?'

"তা'রা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে ডেকের উপর বেরিয়ে পড়্‌ল। আমি একা সেই লেফাফাটার সাম্‌নে ব'সে-ব'সে পাইপ টান্‌তে লাগ্‌লাম। শেষটা চিঠিখানার পানে চেয়ে-চেয়ে আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গেল, আমার একটা জামা দিয়ে ঘড়িটা ঢেকে দিলাম, চিঠিখানা যাতে আর চোখে না পড়ে—ঘড়ি দে'খেও আর কাজ নেই।

"খানিক পরে আমিও ডেকের উপর এসে দাঁড়ালাম, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাইরেই কাটালাম। আমরা তখন 'ভার্দ্দ'-অন্তরীপের সামনে দিয়ে চলেছি;

পিছনে বাতাস পেয়ে জাহাজ বেশ জোরে ছুটেছে। পৃথিবীর যে অংশটাকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে, আমরা তখন তা'র মধ্যে রয়েছি। এমন সুন্দর রাত্রি গ্রীষ্মমণ্ডলেও বড়-একটা পাইনি। সূর্য্যের মতন বড় হ'য়ে চাঁদ উঠ্‌ছে, তখনো অর্দ্ধেকটা জলের নীচে; সমুদ্রের অনেকখানি বরফে-ঢাকা মাঠের মতন শাদা হ'য়ে গেছে, মাঝে-মাঝে যেন হীরের কুচি ছড়ানো। জাহাজের কর্ম্মচারী থেকে মাল্লারা কেউ একটি কথা কইছে না, সবাই আমারই মতন চুপ ক'রে জাহাজের ছায়ার পানে চেয়ে রয়েছে। এইরকম শান্তি ও শৃঙ্খলা আমি বড় পছন্দ করি; আলো-জ্বালা বা কোনো-রকম শব্দ করা বারণ ছিল। হঠাৎ কিন্তু—প্রায় আমার পায়ের কাছে একটি সরু লাল আলোর রেখা দেখ্‌তে পেলাম; আর কেউ হ'লে একটা কাণ্ড বাধিয়ে দিতাম, কিন্তু এ যে আমার বাচ্ছা-কয়েদীদের কামরার আলো! কি করছে তা না দেখে কি রাগ করতে পারি? একটু হেঁট হ'লেই হয়, আকাশ-মুখো ঘুলঘুলিটার ভিতর দিয়ে তাদের ছোট ঘরখানির সবটুকু দেখা যায়। আমি চেয়ে দেখ্‌লাম—

"মেয়েটি হাঁটু পেতে ব'সে উপাসনা করছে। একটি বাতির ছোটো আলো তা'র মুখের উপর পড়েছে, তা'র পরনে রাতের কাপড়। উপর থেকে আমি তা'র আদুল গা, খালি পা, আর একরাশ এলোচুল দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। একবার ভাবলাম স'রে যাই, আবার ভাব্‌লাম হ'লই বা, দোষ কি? আমি একটা বুড়ো সেপাই বই ত' নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

"তার স্বামী দুই হাতে মাথা দিয়ে একটা ট্রাঙ্কের উপর ব'সে আছে—তা'র উপাসনা-করা দেখ্‌ছে। বৌটি একবার তা'র ডাগর নীল চোখ-দুখানি তু'লে উপর পানে চাইলে—চোখ জলে ভাস্‌ছে, যেন যীশুর পদসেবিকা কৃপা-ভিখারিণী মাগ্‌ডেলেন! যখন সে জোড়হাতে প্রার্থনা করতে লাগ্‌ল, তখন স্বামীটি তা'র সেই খোলা লম্বা চুলের ডগাগুলি হাতে ক'রে তু'লে, আস্তে আস্তে ঠোঁটে ঠেকাচ্ছিল। উপাসনা শেষ হ'লে, মেয়েটি তা'র হাত-দুখানি ক্রুসের মতন ক'রে বুকের উপর ধর্‌লে, তা'র মুখে যেন স্বর্গের হাসি ফুটে উঠ্‌ল, ছোকরাটিও তা'র দেখাদেখি হাত-দুখানি সেইরকম কর্‌লে। তা'র যেন একটু লজ্জা কর্‌ছিল—করবেই ত, পুরুষ মানুষের কি ওসব পোষায়!

দাঁড়িয়ে উঠেই 'লরা' তা'র স্বামীকে চুমু খেলে। যেমন শিশুকে দোলনায় শুইয়ে দেয়, তা'র স্বামী তা'কে তেমনি ক'রে কোলে তুলে' আস্তে-আস্তে দড়ির দোলা-বিছানায় শুইয়ে দিলে। জাহাজের দোলায় দোল খেতে-খেতে তা'র তখনি ঘুম আস্‌ছিল। দোলনায় তা'র মাথাটি আর ছোট্ট পা-দুখানি উঁচু হ'য়ে আছে, মাঝখানটি নীচু; দেহখানি একটি সাদা শেমিজের মতন কাপড়ে আগাগোড়া ঢাকা। আধ-ঘুমে সে ব'লে উঠ্‌ল,—

'প্রিয়তম, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে না? রাত যে অনেক হ'ল!'

"তার স্বামী তখনো মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আছে, কোনো উত্তর দিলে না। এতে সে যেন একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে, তা'র ছোট্ট মাথাটি দোল্‌না থেকে একটু বের ক'রে স্বামীর পানে চেয়ে রইল; ঠোঁটদুখানি একটু ফাঁক কর্‌লে মাত্র, কথা কইতে সাহস হ'ল না। শেষে তার স্বামী আপনিই বল্‌লে, 'তাই ত' লরা! যতই আমেরিকার কাছে আস্‌ছি ততই যেন প্রাণের ভিতর কেমন ক'রে উঠ্‌ছে! কেন জানিনে, মনে হচ্ছে জীবনের যে ক'টা সবচেয়ে সুখের দিন তা এই জাহাজেই কাট্‌ল।'

লরা বল্‌লে, 'আমারও তাই মনে হয়। সেখানে পোঁছতে একটুও মন সর্‌ছে না।'

"এই কথা শুনে তা'র যেন আনন্দ ধরে না। নিজের হাত দু'খানা জোরে মুঠো করে সে ব'লে উঠ্‌ল,—

'দেবী আমার!—তবু ত' তুমি রোজ প্রার্থনার সময় কাঁদো! ওতে আমার ভারি কষ্ট হয়। কারণ, তোমার মনে সে-সময় যে কি হয় তা আমি বুঝ্‌তে পারি। বোধ হয়, যা' ক'রে ফেলেছ তা'র জন্যে তোমার এখন দুঃখ হয়।'

"শুনে লরা বড় ব্যথা পেলে, বল্‌লে, 'কি বল্‌লে?—আমার দুঃখ হয়! তোমার সঙ্গে চ'লে এসেছি ব'লে দুঃখ হয়! প্রাণের প্রাণ আমার!—তোমার কি মনে হয়, তোমায় আমি অল্পদিন মাত্র পেয়েছি ব'লে, এখনো তেমন ভালোবাস্‌তে পারিনি? আমি কি মেয়েমানুষ নই! সতেরো-বছর বয়স ব'লে আমার ধর্ম্ম আমি বুঝিনে? আমার মা, আমার দিদিরা—সবাই যে

আমায় বলেছে, তুমি যেখানে যাচ্ছ 'আমার সেইখানে যাওয়া উচিত। এটা বেশী কথা কি! বরং আশ্চর্য্য হচ্চি যে, তুমি এটাকে এত বেশী মনে কর্‌ছ। তুমি কি ক'রে বল যে, আমি এর জন্য দুঃখ কর্‌ছি! আমি জীবনে-মরণে তোমার সাথী, তোমার সঙ্গে থাক্‌ব ব'লে এসেছি।'

"এত আস্তে-আস্তে, এত মিষ্টি ক'রে কথাগুলি সে বল্‌ছিল, যে আমার মনে হ'ল যেন গান শুন্‌ছি। আমার প্রাণ গ'লে গেল, আমি মনে-মনে বল্‌লাম, 'তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে—বড় লক্ষ্মী!'

"ছোকরা স্বামীটি কেবল নিঃশ্বাস ফেল্‌তে লাগ্‌ল, আর পা দিয়ে মেজেটা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল। বউটি তা'র হাতখানি সবটা আদুল ক'রে বাড়িয়ে দিলে, সে কেবল তাইতে একটু চুমু খেলে।

'লরেট! রাণী আমার! বিয়েটা যদি আর চারটে দিন পিছিয়ে দিতাম, তা' হ'লে একাই গ্রেপ্তার হ'তাম, তোমাকে সঙ্গে আস্‌তে হ'ত না—একথা ভাব্‌লে আমার যে কি আফ্‌শোস হয়, তা কি বল্‌ব!'

"বউ তখন বিছানা থেকে একেবারে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বরের মাথাটি এমনি ক'রে জড়িয়ে ধর্‌লে, যেন সেটিকে নিয়ে বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখবে। সে তা'র কপাল, চোখ, মাথা আস্তে-আস্তে চাপড়াতে লাগ্‌ল। শিশুর মত সরল হাসিতে তা'র মুখখানি ভ'রে গেল; ভারি মিষ্টি-মিষ্টি সব কথা বল্‌তে লাগ্‌ল, সে-সব চমৎকার মেয়েলি কথা আমি এর আগে কখনো শুনিনি!—কেবল নিজেই কথা কইবে ব'লে আঙুল দিয়ে বরের ঠোঁট চেপে ধরেছে। নিজের বড়-বড় চুল গোছা-ক'রে ধ'রে, তাই দিয়ে রুমালের মতন ক'রে চোখ মুছাতে লাগ্‌ল, আর বল্‌তে লাগ্‌ল, 'আচ্ছা বল, ভালো-বাসার লোক একজন কেউ সঙ্গে থাকা ভালো নয়? আমার সেখানে যেতে কোন দুঃখ নেই,—কত বুনো মানুষ দেখ্‌ব, নারকেল-গাছ দেখ্‌ব—কত কি! তুমি তোমার গাছ আলাদা পুঁতো, আমার গাছ আমি আলাদা পুঁত্‌ব—দেখ্‌ব কে মালীর কাজ ভালো জানে! দুজনে মি'লে কেমন একটি ঘর বাঁধ্‌ব, দর্‌কার হয় দিনরাত্রি খাট্‌ব। আমার গায়ে জোর আছে! দেখ, আমার হাত দুখানা দেখ! আচ্ছা, আমি তোমাকে ধ'রে তু'লে ফেল্‌তে পারি কি না দেখ্‌বে?—হাসছ যে! আমি ছুঁচের কাজ জানি—কাঁচে

কোনো শহর নেই কি? ভালো সেলাইয়ে কাজ কেউ কিন্‌বে না? যদি গান বা ছবি-আঁকা কেউ শেখে ত' তাও শেখাতে পারি। আর যদি লেখাপড়া-জানা লোক সেখানে থাকে, তা হ'লে তুমিও লিখে' রোজগার কর্‌তে পারবে।'

"এই শেষ-কথাটা শুনে' বেচারী একেবারে পাগলের মতন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল,

'লেখা! আবার লেখা!'—ডান হাতখানা বাঁ হাত দিয়ে মোচ্‌ড়াতে লাগ্‌ল, আর বল্‌তে লাগ্‌ল, 'হায়, হায়, কেন মর্‌তে লিখ্‌তে শিখেছিলাম! —লেখা! সে ত উন্মাদের বৃত্তি! নিজের বিশ্বাস মতন লেখ্‌বার অধিকার নাকি সকলেরই আছে! আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম!—এমন বুদ্ধি আমার কেন হ'ল? আর তাই বা এমন কি অপরাধ!—পাঁচটা কি ছ'টা অতি সাধারণ লেখা লিখে ছাপিয়েছিলাম, যার ভালো লাগে পড়্‌বে, না হয় উনুনের ভিতর ফেলে দেবে—এই ত লাভ! এর জন্যে এত শাস্তি! আমার নিজের জন্যে ভাবিনে,—কিন্তু তুমি! প্রেমের পুতলি! লক্ষ্মীর প্রতিমা! তখন সবে বারোদিন—তুমি বালিকা ছিলে, নারী হয়েছ!—বলো দেখি, আমি তোমার হাত ধ'রে বল্‌ছি, তুমি উত্তর দাও—আমি কোন্ প্রাণে তোমায় সঙ্গে আস্‌তে দিতে রাজী হলাম—এত ভালো তোমাকে হ'তে দিলাম কি ক'রে! হা হতভাগিনী! তুমি এখন কোথায়, তা ভেবে দেখছ কি?—কোথায় যাচ্ছ জানো? আর ক'দিন পরেই তুমি তোমার মা ও দিদির কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল দূরে গিয়ে পড়বে। তোমার এ দুর্গতি কেন?—সে ত আমারি জন্যে!'

মেয়েটি একটিবার মাত্র তার মুখখানি বিছানার মধ্যে লুকিয়ে নিলে—উপর থেকে দেখ্‌তে পেলাম, সে কাঁদছে, তার বর তা দেখ্‌তে পেলে না। একটু পরেই স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে হাসি-হাসি মুখ ক'রে ফিরে' তাকালে।

'হ্যাঁ, উপস্থিত টাকাকড়ি কিছু নেই বটে'—বলেই সে হেসে উঠল, 'আমার কাছে একটি টাকা আছে—তোমার?'

"এবার সেও ছেলেমানুষের মত হাস্‌তে লাগল, বললে, 'আমার শেষ পর্য্যন্ত একটি আধুলিতে ঠেকেছিল; তাও—তোমার বাক্সটি যে বয়ে এনেছিল সেই ছেলেটিকে দিয়েছি।'

বউ বল্‌লে, 'বেশ করেছ, তাতে কি হয়েছে? হাতে কিছু না থাকাই ত সবচেয়ে মজার! ভাবনা কি? আমার মা যে হীরের আংটি-দুটি আমাকে দিয়েছিলেন, তা আমার তোলা আছে; যখন দরকার বোঝো বিক্রী কর্‌লেই হবে। আরো একটা কথা আমার মনে হয়। ওই বুড়ো কাপ্তেন বড় ভালো লোক—তিনি সব কথা জানেন, এখনো কিছু খুলে' বলেন নি। চিঠিখানা বোধ হয় আর কিছু নয়—আমাদের যাতে সুবিধে হয় সেইরকম কিছু ক'রে দেবার জন্যে 'কাইয়েন'-এর শাসনকর্ত্তাকে অনুরোধ করা হয়েছে।'

"ছোক্‌রা বল্‌লে, 'হবে বা! কে বল্‌তে পারে?' বউটি ব'লে উঠ্‌ল, 'তা নয় ত কি? তুমি এত ভালো, তোমার উপর গবর্ণমেণ্ট কি সত্যিই রাগ করতে পারে? নিশ্চয় দিনকতকের জন্যে তোমাকে স্থানান্তর করেছে মাত্র।'

বেশ কথাগুলি কিন্তু! আবার আমাকেও ভালো লোক ব'লে জানে,—শুনে আমার প্রাণটা যেন গ'লে গেল। শীলমোহর-করা চিঠিখানার কথা যা বল্‌লে, তা শু'নেও আমার আহ্লাদ হ'ল। এখন দেখি, তা'রা দুজনেই দুজনকে চুমু খাচ্ছে। এইবার তাদের চুপ করাবার জন্যে আমি ডেকের উপর খুব জোরে পায়ের শব্দ কর্‌তে লাগ্‌লাম, তারপর চেঁচিয়ে ডেকে বল্‌লাম,

'বলি, শুন্‌ছ!—ও গো ক্ষুদে বন্ধুরা! আর নয়! জাহাজের সব আলো নিবিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে, তোমাদের আলোটা নিবিয়ে ফেল দেখি।'

তখনি আলো নিবিয়ে ফেল্‌লে, তবু অন্ধকারে স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েদের মতন চাপা গলায় হাসি-গল্প চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি একাই ডেকের উপর পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লাম, আর চুরুট টান্‌তে লাগ্‌লাম। গ্রীষ্মমণ্ডলের আকাশ! সব তারাগুলি ফু'টে উঠেছে,—তারা ত নয়, যেন এক-একটা ছোটো-ছোট চাঁদ! বাতাসটিও বেশ মিঠে লাগছিল।

"ভাব্‌লাম, বাচ্ছারা যা মনে করেছে তাই বোধ হয় ঠিক, একটু ভরসা হ'ল। খুব সম্ভব, শাসন-বৈঠকের পাঁচজন কর্ত্তার মধ্যে অন্ততঃ একজনেরও মনটা শেষে গলেছে, তিনিই বোধ হয় ওদের সম্বন্ধে আমাকে একটু পৃথক্ আদেশ দিয়ে থাক্‌বেন। এসব ব্যাপারের অর্থ আমি আগে বুঝতে চেষ্টা

[illegible]মি, রাজনীতির ভিতর কত মারপ্যাঁচ আছে—কে জানে? মোট কথা, বুঝি আর নাই বুঝি, আমার এইটেই বিশ্বাস হ'ল, আর মনটাও একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

"নীচে নেমে গেলাম। কামরায় ঢুকে আমার কোটের তলা থেকে চিঠিখানা বের ক'রে একবার তাকিয়ে দেখ্‌লাম। মনে হ'ল যেন তা'র মুখখানা বদ্‌লে গিয়েছে, যেন হাস্‌ছে। শীল-মোহরগুলো গোলাপী দেখাচ্ছে। তা'র মতলব যে ভালোই—সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না, তাই একটু ইঙ্গিত ক'রে তা'কে জানিয়ে দিলাম যে, সে আমার বন্ধু।

"এর পর দিনকতক চিঠিখানার কথা আমার মনেই হয়নি, সকলে বেশ আনন্দেই ছিলাম; কিন্তু সেই এক ডিগ্রির যেই নিকট হ'তে লাগ্‌ল, আমাদের কথাবার্ত্তাও কেমন বন্ধ হ য়ে এল।

"একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু আশ্চর্য্য বোধ করলাম—জাহাজখানা একটুও দুল্‌ছে না। আমি ঘুমোতাম—এক চোখ খুলে; যেই জাহাজের দোলাটি থাম্‌ল, অম্‌নি দু'চোখ খুলে ফেললাম। সমুদ্দুর একেবারে নিথর নিঝ্‌ঝুম—বিষুবরেখার প্রথম ডিগ্রির ভিতরে এসে পড়েছি। বাইরে এসে দেখি, সমুদ্দুর ত' নয়, যেন একবাটি তেল! তখনি ঘাড় ফিরিয়ে চিঠিটার উদ্দেশে বল্‌লাম, 'এইবার তোমার বিষ্যে বার কচ্ছি, দাঁড়াও!' তবু কিন্তু সূর্য্য-ডোবা পর্য্যন্ত চুপ ক'রে রইলাম। শেষে কি করি, না খুল্‌লে নয় যে! তাই ক্লক-ঘড়িটা খুলে' কাঁচের ভিতর থেকে ফস্ ক'রে লেফাফাটা টেনে নিলাম। বল্‌তে কি বাপু!—আমি ত' প্রায় পনেরো মিনিট চিঠিখানা হাতে ক'রেই ব'সে রইলাম, খুল্‌তে আর সাহস হয় না!—শেষকালে, 'দুত্তোর' ব'লে বুড়ো-আঙুলটা দিয়ে মোহর তিনটে ভেঙে ফেল্‌লাম—বড়টাকে ত' গুঁড়িয়েই ফেল্‌লাম! চিঠি পড়ে' আমি চোখ-দুটো একবার রগ্‌ড়ে নিলাম, ভাবলাম আমার পড়ারই ভুল!

"আবার সবটা পড়লাম—ফের পড়লাম। তার পর শেষের দুই ছত্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রথম ছত্রে ফিরে এলাম। আমার বিশ্বাস হ'ল না; শেষে পা'দুটো কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, ব'সে পড়্‌লাম। মুখের উপরকার চামড়াটা যেন তির্‌-তির্ করতে লাগ্‌ল। একটু ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে গাল দুটো বেশ

ক'রে ঝর্গড়ে নিলাম, হাতের তেলোতেও খানিকটা মাখালাম। মনটা এত দুর্ব্বল দেখে নিজেকেই নিজের দয়া হ'ল—কিন্তু সে একবারটি! তখনি খোলা বাতাসে এসে দাঁড়ালাম।

"সে দিন 'লরা'কে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, তার কাছে আর যেতে ইচ্ছে হ'ল না। একটি শাদা ফ্রক্ পরেছে, খুব সাদাসিদে—হাত দু'খানি কাঁধ পর্য্যন্ত আদুল—একঢাল চুল এলিয়ে দিয়েছে! একটা ছোটো পোষাকে দড়ি বেঁধে, সেইটে জলের উপর ঝুলিয়ে দিয়ে সে খেলা করছিল। এই জায়গায় আঙুরের মতন থোলো-থোলো ফল-ওয়ালা একরকম গাছ জলে ভেসে যায়—সে তাই ধরবার চেষ্টা করছিল, আর কেবলই হাসছিল।

'ওগো, শীগ্‌গীর!—দেখ, দেখ! কেমন আঙুর দেখ!'—বলে' সে চেঁচাচ্ছিল। তা'র বর তখন তা'র কাঁধের উপর দিয়ে মাথাটা হেঁট ক'রে তাকিযে দেখছিল—জলের দিকে নয়, বউএর মুখখানি,—বড় করুণ মধুর চোখে চেয়ে দেখছিল।

"আমি ছোকরাকে ইসারায় ডেকে আমার সঙ্গে উপর-তলায় দেখা করতে বল্লাম। মেযেটা ফিরে দাঁড়াল। আমার মুখের চেহারাটা তখন ঠিক কেমন হয়েছিল বল্‌তে পারিনে,—তার হাত থেকে দড়িটা প'ড়ে গেল। সে তা'র স্বামীকে জাপটে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল,

'ওগো, যেয়ো না, যেয়ো না! ওর মুখটা কি ফ্যাকাশে দেখ!'

"তা আর হবে না! মুখ ফ্যাকাশে হওয়ার মতনই ব্যাপার কিনা! তবু ছোকরা এক কথাতেই আমার কাছে চ'লে এল, সিঁড়ির ধারের ছাদটায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটা বড়-মাস্তুলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের পানে চেয়ে রইল। দু'জনে অনেকক্ষণ পায়চারি করলাম—কথা আর বেরোয় না! আমার মুখে একটা সিগার ছিল, সেটা তেতো লাগছিল—থু' ক'রে জলে ফে'লে দিলাম। সে তখন আমার চোখের পানে চেয়ে রইল, আমি তার হাতখানি হাতে নিলাম, কিন্তু আমার যেন বাক্‌রোধ হয়েছিল—সত্যি, যেন বাক্‌রোধ! কতক্ষণ পরে বল্লাম,

'আচ্ছা, কি হয়েছিল বলো ত? সেই পাঁচ-পাঁচটা খাপ্পাখাঁ বাদ্‌শা—সেই আইন-ওয়ালা ডালকুত্তাদের সঙ্গে তুমি কি করতে গিয়েছিলে? তা'রা যে বিষম খাপ্‌পা হ'য়ে উঠেছে? ব্যাপার কি বলো ত?'

"সে একবার কাঁধটা নাড়া দিলে, তার পর মাথাটা একটু হেঁট ক'রে বল্লে,

'তোমাকে যথার্থ বলছি, কাপ্তেন, সে এমন কিছুই নয়। শাসন-বৈঠকের মন্ত্রীদের লক্ষ্য ক'রে গোটা তিনেক ছড়া লিখেছিলাম—আর কিছু নয়!'

"আমি বল্লাম, 'হতেই পারে না—অসম্ভব!'

'হ্যাঁ, তাই। আমি দিব্যি ক'রে বলছি, আর কিছু করিনি। ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি গ্রেপ্তার হই, ১৬ই বিচার হয়—প্রথমটা মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, পরে দয়া ক'রে দ্বীপান্তরের হুকুম দিলে।' আমি বল্লাম, 'আশ্চর্য্য বটে! শাসন-সভার মন্ত্রীদের একটুতেই এত অসহ্য!—সেই যে চিঠিখানা দেখেছ, তা'তে তোমাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলতে হুকুম দিয়েছে।'

"শুনে সে চুপ ক'রে রইল। মুখের ভাবে নিজেকে যে-রকম সাম্‌লে নিলে, তা একজন উনিশ বছরের ছোক্‌রার পক্ষে কম বাহাদুরি নয়! এক-বারটি তা'র স্ত্রীর পানে চাইলে, চেয়ে হাত দিয়ে কপালখানা মুছে নিলে—কপালে পিন্‌পিন্ ক'রে ঘাম বেরুচ্ছিল। আমার কপালেও তাই আমার চোখ-দুটো আর-একরকমের ফোঁটায় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠেছিল। আমি বল্লাম, 'এখন দেখা যাচ্ছে, কর্ত্তারা দেশের মধ্যে তোমার সদ্‌গতি কর্‌বার ইচ্ছে করেন নি—ভেবেছেন, এইরকম জায়গায় সমুদ্রের উপর সে কাজটা সেরে ফেললে, কেউ আর তত্তটা লক্ষ্য করবে না। কিন্তু আমার এ যে ভারি মুস্কিল হ'য়ে পড়ল হে!—তুমি যতই ভালো হও না কেন, আমার ত' আর উপায়ান্তর নেই! পরোয়ানাখানা একেবারে আইন-মাফিক পাকা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে; হুকুমনামায় যে সই আছে, তা'র তলায় টানটি পর্য্যন্ত নির্ভুল! আবার মোহরের ছাপও আছে - কিছুই বাদ যায়নি!'

"ছোক্‌রার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠল; সে আমাকে খুব ভদ্রভাবে অভিবাদন ক'রে ভারি নরম-সুরে বিনয় ক'রে বললে,

'আমি কিছুই চাইনে, কাপ্তেন! আমার জন্যে তোমার কর্ত্তব্যহানি হয়—সে আমার দরকার নেই। আমি কেবল লরার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইতে চাই, আর,—বোধ হয় তা হবে না—যদি এর পরেও সে বেঁচে থাকে, তবে তা'কে তুমিই দেখো, কাপ্তেন!'

"আহা! সে-সব ঠিক হ'য়ে যাবে এখন, বাবা!—তা'র জন্যে ভেবো না! তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, ফ্রান্সে ফি'রে গিয়ে তা'র আপন-জনের কাছে তা'কে রেখে আস্‌ব; যতদিন না সে নিজে আমাকে বলবে, ততদিন তা'কে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তবে, আমার মনে হয়, এ-বিষয়ে কোনো ভাবনাই করতে হবে না, এ-শোক কি সে সাম্‌লাতে পারবে মনে করো?—আহা, বাছা আমার!"

"আমার হাত দু'খানা বেশ ক'রে চেপে ধ'রে সে বলতে লাগল,

"কাপ্তেন, এ ব্যাপারে তোমার অবস্থা আমার চেয়েও কষ্টকর তা বুঝতে পার্‌ছি, কিন্তু উপায় ত নেই! তোমার উপর আমি এইটুকু ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই যে, আমার যা-কিছু আছে তা'র থেকে যেন লরা বঞ্চিত না হয়; তা'র বুড়ো মা তা'কে যদি কিছু দিয়ে যায়, তা যেন সে পায়। তা'র প্রাণ আর মান,—দুই-ই রক্ষার ভার তুমি নেবে ত? দেখ, ওর স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়, সেদিকে বরাবর চোখ রাখতে হবে, কাপ্তেন!' গলাটা একটু নামিয়ে আস্তে আস্তে বল্‌তে লাগল, 'তোমায় তবে বলি। ওর শরীর বড়ই পল্‌কা। বুকটা সময় সময় এমন ক'রে ওঠে যে, দিনের মধ্যে চার-পাঁচ বার মূর্চ্ছা হয়; ওকে সর্ব্বদা ঢেকে-ঢুকে রাখ্‌তে হবে কিন্তু! আসল কথা, তোমাকে ওর বাপ, মা, আমি—এই তিনেরই যত্ন একা কর্‌তে হবে,—নয় কি? ওর মা ওকে যে আংটি দুটি দিয়েছেন, তা যদি ওর থাকে ত' বড় ভালো হয়। তবে ওর জন্যেই যদি বিক্রী করা দর্‌কার হয়, কর্‌বে বৈ কি! আহা, বেচারী লরা আমার!—দেখ কাপ্তেন, কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!'

"ব্যাপারটা যেমন বুক-ফাটা-রকমের হ'য়ে আস্‌তে লাগল, তা'তে আমার বড়ই অস্বস্তি হ'তে লাগল—মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে উঠল। পাছে মনটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, তাই তা'র সঙ্গে এতক্ষণ যতদূর সম্ভব সহজভাবে কথা ক'চ্ছিলাম, কিন্তু আর সে ভাবনা নিষ্প্রয়োজন দেখে আমি একেবারে ব'লে ফেল্‌লাম,

'আচ্ছা, হয়েছে!—আর নয়! যারা খাঁটি লোক, তাদের মধ্যে বোঝাপড়া সহজেই হ'য়ে যায়। এখন যাও, ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে নাওগে। চট্‌পট সেরে নেওয়া চাই!'

"তা'র হাতটা হাতে নিয়ে একটু চেপে দিতে গিয়ে দেখি, সে আর আমার হাত ছাড়ে না, কেমন একরকম ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। তখন বল্‌লাম,

'আচ্ছা, দেখ, তোমাকে তা হ'লে একটি সুপরামর্শ দিই—ওকে এ বিষয়ে একটি কথাও বোলো না। কাজটা এমনভাবে সেরে নেওয়া যাবে, যাতে আগের থেকে ও কিছু টের না পায়। বুঝলে? তুমিও জান্‌তে পার্‌বে না, সে ভার আমি নিলাম।'

'সে হ'লে ত ভালোই হয়। ওই বিদায়-নেওয়ার ব্যাপারটা আমার বড় কাবু করে কিন্তু!'

"আমি বল্‌লাম, 'না, না, কোনোরকম ছেলেমানুষি না করাই ভালো। দেখো বন্ধু, যদি পারো ত চুমু খেয়ো না বল্‌ছি—তা হ'লেই গিয়েছ!'

"আমি আর-একবার তা'র হাতখানি চেপে ধ'রে তা'কে ছেড়ে দিলাম। ওঃ! ব্যাপারটা সত্যিই ভারি সঙ্গীন হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কথাটা সে গোপন রাখতে পেরেছিল; কারণ, দেখলাম দুটিতে হাতে হাত বেঁধে, প্রায় পনেরো মিনিট কাল পায়চারি কর্‌লে, তারপর —সেই দড়ি-বাঁধা জামাটা আমার একটা খালাসী জল থেকে তু'লে নিয়েছিল— সেইটে নেবার জন্যে তারা জাহাজের পিছন দিকে ফিরে গেল। দেখতে দেখতে রাত্রি এসে পড়ল—অন্ধকার রাত্রি! এই সময়েই কাজ হাসিল কর্‌ব ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই সন্ধ্যার অন্ধকার আমার চোখে আর ঘুচল না! যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, সেই রাত্রির সেই-ক্ষণটাকে একটা ভারী শিকলে-বাঁধা পাথরের মতন আমাকে টেনে-টেনে নিয়ে বেড়াতে হ'বে।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে বুড়ো মেজর আর পার্‌লে না, চুপ ক'রে গেল। পাছে তা'র ঘোরটা কেটে যায়, তাই আমি খুব সাবধান হ'লাম,—পাছে কথা ক'য়ে ফেলি! একটু পরেই দেখি, সে বুক চাপড়াতে-চাপড়াতে বল্‌তে লাগল,

"সে-সময়টাতে আমার যে কি হয়েছিল, তা এখনো বুঝলাম না! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত গা'টা রাগে রী-রী কর্‌ছিল, তবু কিসে যেন আমাকে ধ'রে-বেঁধে সেই হুকুম তামিল কর্‌বার জন্যে ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছিল। আমি আমার লোকদের ডাক্‌লাম, ডেকে একজনকে ব'লে দিলাম,

'দেখ হে, একখানা বোট এখ্‌খুনি জলে নামিয়ে দাও ত!—এখন আমাদের জল্লাদ হ'তে হবে।—ওই মেয়েটাকে নৌকোয় ক'রে খানিকটা দূরে নিয়ে যাও, তারপর যখন বন্দুকের আওয়াজ শুন্‌তে পাবে, তখন ফিরিয়ে এনো।'

"একটুকরো কাগজের হুকুম এম্‌নি ক'রে মান্‌তে হ'ল!—কাগজের টুকরো বই আর কি? সেদিনকার হাওয়াটাই কেমন ছিল!—আমাকে যেন কিসে পেয়েছিল! দূর থেকে ছোক্‌রার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওঃ সে কি দৃশ্য! মেয়েটের সাম্‌নে হাঁটু পেতে ব'সে সে তার পা-দুখানিতে আর হাঁটুতে চুমু খাচ্ছে! বলো দেখি, আমার প্রাণটায় তখন কি হচ্ছিল!

"আমি ঠিক পাগলের মতন চীৎকার ক'রে উঠলাম—'ওদের দুজনকে তফাৎ ক'রে দাও, তফাৎ ক'রে দাও!—আমরা সবাই পাজী, বদ্‌মায়েস!—ফরাসীর গণতন্ত্র আর বেঁচে নেই, মরে প'চে উঠেছে! এখন যারা শাসন কর্‌ছে, তা'রা সেই পচা-মড়ার পোকা! আমি আর জাহাজের কাজ কর্‌ব না, ইস্তফা দেবো! যারা আইনের ভয় দেখায়, তাদের আমি থোড়াই কেয়ার করি! শোনে শুনুক, ব'য়ে গেল!'—আহা, তাদের আমি বড় কেয়ার কর্‌তাম কিনা! একবার যদি পেতাম তাদের—পাঁচ-পাঁচটা রাস্কেলকে গুলি ক'রে মারতাম। এইত' আমার জীবন, এর জন্যে ভারি মায়া কি না?—সত্যি, আমি বড় দুঃখী!"

মেজরের কণ্ঠস্বর ক্রমেই নেমে এল, শেষকালে কথা অস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। লোকটা কেবলই এগিয়ে চল্‌তে লাগল—একেবারে যেন উন্মাদের ভঙ্গি, কেমন একটা অধীর অন্যমনস্ক ভাব। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরেছে, থেকে-থেকে ভীষণ ভ্রূভঙ্গি কর্‌ছে। এক-একবার ঝাঁকি মেরে উঠছে, কখনো বা তলোয়ারের খাপখানা দিয়ে ঘোড়াটাকে এমন মার্‌ছে, যেন তা'কে মেরেই ফেল্‌বে! সব চেয়ে দে'খে আশ্চর্য্য হলাম—তা'র ফ্যাকাশে হল্‌দে মুখখানা কেমন যেন কালচে-লাল দেখাচ্ছে! জামার বোতামগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলে বুকটা ঝড়-বৃষ্টিতে আদুল ক'রে দিলে। এইভাবেই আমরা পথ চল্‌তে লাগলাম, কারো মুখে কথাটি নেই। আমি দেখলাম, এবারে আর নিজে হ'তে কিছু বলবে না, কথাটা কোনো-রকমে আমাকেই পাড়তে হবে। যেন গল্প শেষ হয়ে গেছে—এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বল্‌লাম, 'হ্যাঁ, এমন কাণ্ডর পর জাহাজের কাজ কি আর ভালো লাগে!'

অম্‌নি সে ব'লে উঠ্‌ল, "কাজের কথা বল্‌ছ? তুমি পাগল! কাজের দোষ কি? জাহাজের কাপ্তেনকে কি কখনো জল্লাদের কাজ কর্‌তে হয়? সে কর্‌তে হয় কখন?—যখন রাজ্যের যারা মালিক তা'রা হয় খুনে-ডাকাত! গরীব চাকর—যার স্বভাবই হ'য়ে গেছে চোখ বুজে' হুকুম তামিল করা,

তা সে যে হুকুমই হোক্—একেবারে কলের পুতুলের মতন!—নিজের প্রাণটা দলে' ফেলে যে কেবল হুকুমই মানে—তাকে দিয়ে এই কাজ করানো!"—বল্‌তে বল্‌তে পকেট থেকে একখানা লাল রুমাল বের করে' তাইতে মুখ ঢেকে সে একেবারে ছোট-ছেলের মতোই হাউ-হাউ করে' কাঁদতে লাগ্‌ল। পাছে আমি সাম্‌নে থাকায় তার এই কান্না দেখে ফেলি, আর তার অপমান বোধ হয়—তাই আমি আমার ঘোড়াটা একবার থামালাম,—যেন রেকাবটা ঠিক করে নিচ্ছি, এই ভান করে' একটু সরে' গিয়ে কিছুক্ষণ তার পিছন-পিছন যেতে লাগ্‌লাম।

যা ভেবেছিলাম তাই! মিনিট-কতক পরে সেও গাড়ীখানার পিছন দিকে ফিরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমার পোর্টম্যাণ্টোতে ক্ষুর আছে কি না। আমি বল্‌লাম, 'ক্ষুর আমি কি জন্যে রাখব?—আমার ত দাড়ী গোঁপ কিছু হয় নি।' কথাটা শুনে সে কিন্তু নিরাশ হ'ল না। সে ত' সত্যিই ক্ষুর চায়-নি—কেবল এতক্ষণকার কথাবার্ত্তা পাল্‌টে নেবার জন্যে ওটা জিজ্ঞাসা করেছিল। একটু পরেই আবার গল্পটা সুরু কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে দেখে ভারী খুসী হয়ে উঠ্‌লাম। হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি কখনো জাহাজ দেখনি বোধ হয়?" আমি বল্‌লাম, "একবার প্যারী-শহরের প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম বটে, সে দেখা কোনো কাজের নয়।"

"তা হ'লে জাহাজের কোন্ জায়গাটাকে 'বিড়াল-মুখ' বলে, জানো না?"

"একেবারেই না।"

তখন গলাটা একটু খাটো করে' সে বল্‌লে,

"জাহাজের গলুইয়ের মুখে, কড়ি-কাঠ দিয়ে ছাদের মতন একটু জায়গা করা আছে, সেটা জলের উপর বেরিয়ে থাকে। সেইখান থেকে নোঙ্গর ফেলা হয়। কোনো লোককে যখন গুলি করা হয়, তখন তাকে সেইখানে দাঁড় করিয়ে দেয়।"

"ও! বুঝেছি, লোকটা তখন একেবারে জলের মধ্যে পড়ে যায়?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে কেবল—জাহাজে কত রকমের নৌকো থাকে, কোন্‌টা কোন্ জায়গায় থাকে—তাই বলে' যেতে লাগ্‌ল। তারপর হঠাৎ কথার মধ্যে কোনো যোগ না রেখে, আবার গল্প সুরু

কর্‌লে। অনেক দিন সৈনিক-বিভাগে কাজ কর্‌লে, সব বিষয়ে একটা কুছ্-পরোয়া-নেই-ভাব আসে, সকলের কাছে দেখাতে হয়—বিপদ বল, মানুষ বল, মরা-বাঁচার কথা বল, কিছুরই তোয়াক্কা রাখিনে, এমন কি আপনার মনটাকেও গ্রাহ্য করিনে! এবার সে এই রকম ভঙ্গীতেই গল্পটা ব'লে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু যেখানে উপরের ভাবটা এমনি নির্ম্মম, সেখানে প্রায়ই ভিতরে গভীর মমতা লুকিয়ে থাকে। সৈনিকের এই নির্ম্মমতা যেন একটা লোহার মুখোস মাত্র, ভিতরের চেহারাটা ঠিক উল্টো,—যেন পাথরের পাতাল-পুরীতে রাজপুত্র বন্দী হ'য়ে আছে! সে তখন বল্‌তে লাগ্‌ল,

"এ-সব নৌকোয় দু'জন ক'রে লোক ধরে। লরাকে তা'রা ধ'রেই একটা নৌকোয় তুলে ফেল্লে, তাকে কথা কইবার বা চীৎকার করবার সময়টুকু দিলে না। আহা! এমন কাজ যাকে করতে হয়, তার যদি এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান থাকে, তবে কি আর রক্ষে আছে? তার আফশোস কি কখনো ঘোচে? একথা বার বার ব'লেই বা কি ফল? ভোলাও যে যায় না!......উঃ আজকের দিনটা কী দিন গো! কী ভূতে পেয়েছে আমায়!—কেন বল্‌তে গেলাম? না শেষ ক'রে' যে থাক্‌বার যো নেই! আমাকে যেন মাতাল ক'রে তুলেছে! আকাশেও কী দুর্যোগ!—আমার জামাটা ভিজে সপ্ সপ্ কচ্ছে দেখ?

"হ্যাঁ, সেই মেয়েটির কথা বল্‌ছিলাম, না? তার বয়েসই বা কি! আহা, ম'রে যাই! সংসারে এত আকাট মুখ্যুও আছে! আমার সেই লোকটা এমন নিরেট যে, নৌকোখানাকে জাহাজের সমুখ দিকেই নিয়ে চল্‌ল! এইজন্যেই বলেছে, মানুষ যা ভাবে তার উল্টোটাই হয়। আমি ভেবেছিলাম অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়বে না। এ বুদ্ধি হ'ল না যে—একেবারে বারোটা বন্দুক আওয়াজ করলে, তার সে আলো যাবে কোথায়? স্বামীর প্রাণহীন দেহ যখন সমুদ্দুরের জলে প'ড়ে গেল, লরা যে তা' দেখতে পেয়েছিল—তার আর কথা!

"এইবার যে ঘটনার কথা বল্‌ব তা যে কেমন করে' ঘট্‌ল, তা' উপরে ঐখানে ভগবান বলে' যদি কেউ থাকে, কেবল সেই জানে, আমি তার কিছুই জানিনে, আমি কেবল দেখেছি আর শুনেছি মাত্র। আমার লোক-গুলো যেই বন্দুক আওয়াজ কর্‌লে, অমনি লরা তার মাথাটা দুই হাতে

একদিনের জন্যেও ওকে কাছ-ছাড়া করি নি। যেখানে গিয়েছি সেখানেই ওকে আমার পাগল মেয়ে বলে' পরিচয় দিয়েছি—সবাই ওকে তাই ব'লেই জানে। সৈনিকদের সমাজে সব ব্যবস্থাই কেমন সহজে হ'য়ে যায়!—তোমাদের পারী-সহরেও তেমনটি হয় না। আমি ওকে নিয়ে সম্রাটের সব যুদ্ধে ঘুরেছি,—ওর গায়ে আঁচড়টি লাগে নি! আগে মাইনেও বেশী পেতাম, তার উপর 'ভাতা' ছিল, আবার 'লীজন-অব-অনার'-এর দরুণ পেন্‌সনটাও ছিল, কাজেই তখন ওকে আরো ভালো পোষাক পরিয়ে রাখতাম,—বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই রেখেছিলাম। এখনো যত্নের ত্রুটি করি নে; একখানা গাড়ী আর চারটি খড় বইত নয়—এ আর হবে না কেন? ওকে নিয়ে কখনো আমার মুস্কিলে পড়তে হয়নি। বড়-বড় অফিসার্‌রা ওর ছেলেমানুষী খেলা দেখে বরং কত আমোদ করেছে!"

এই বলে' কাছে গিয়ে তার কাঁধের উপর দু'বার টোকা দিয়ে সে তাকে বল্‌লে, "কেমন লক্ষ্মী-মেয়ে আমার! এসো ত', লেফ্‌টনাণ্টের সঙ্গে একটা কথা কও দেখি?" সে তার খেলাতেই মগ্ন হ'য়ে রইল। তখন মেজর বল্‌লে, "ওঃ, তাও ত' বটে! আজ জলবৃষ্টি হচ্ছে কি না, তাই একটু বেশী চুপচাপ। ওর কিন্তু ঠাণ্ডা লাগে না—ওই এক সুবিধে!—পাগলদের অসুখ-বিসুখ বড় একটা করে না!—না, না, তুমি খেলা কর, লক্ষ্মীটি! আমরা কিছু বল্‌ব না, লরেট, তোমার যা' ভালো লাগে তাই করো!"

মেজরের সেই শক্ত শীর্ণ প্রকাণ্ড হাতখানা এতক্ষণ তার কাঁধের উপরেই ছিল; এবার দেখি সেই হাতখানা সে নিজের হাতে নিয়ে যেন কত সন্তর্পণে মুখের কাছটিতে নিয়ে গেল, তারপর, বড় দীন—বড় অনাথার মত, ভক্তিভরে নিজের ঠোঁট দুখানি তার উপর ঠেকালে,—দেখে আমার বুক যেন ফেটে গেল, খুব জোরে টান মেরে ঘোড়াটাকে ফিরিয়ে সরে' দাঁড়ালাম। বল্‌লাম, "এবার চল্‌তে সুরু করা যাক, কি বল সর্দ্দার? বেথুন-শহরে ফির্‌তে রাত হয়ে যাবে।"

সে তখন তলোয়ারের মুখটা দিয়ে তার বুটের উপরকার লাল কাদাগুলো চাঁচতে লেগেছে; সেকাজ শেষ করে', লরার মাথায় ঘোমটার মতন টুপিটা টেনে দিয়ে, নিজের সিল্কের চাদরটা তার গলায় জড়িয়ে দিলে। সবশেষে টাটুটাকে একটা খোঁচা মেরে বল্‌লে, "চল্ এখন,—তুই বেটা বড় অপদার্থ!" আমাদের চলাও সুরু হ'ল।

তখনো সেই একভাবে বৃষ্টি হচ্চে। ওপরে আকাশটা যেমন ঘোলাটে, নীচেও তেমনি বরাবর পাঁশুটে রঙের জমি, তার যেন আর শেষ নেই! পশ্চিমে সূর্য্যি পাটে বসেছে চারিদিকে যেন একটা ম্লান রুগ্ন আলো, এমন কি সূর্য্যিটাও যেন পাণ্ডুবর্ণ—স্যাঁৎসেতে!

মেজর খুব বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। মাঝে-মাঝে তার মাথার টোকাটা তুলে',—টাক-পড়া মাথার যে ক'গাছি পাকাচুল ছিল তার থেকে—আর সাদা গোঁপজোড়াটা থেকে—বৃষ্টির জল মুছে ফেল্‌ছে। গল্পটা আমার কেমন লাগল, তার নিজের সম্বন্ধে আমার মতামত কি—এ সব ভাবনা তার আছে বলে' মনে হ'ল না। নিজের সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ উদাসীন—যেন, সে যা'—তাই,—তার আর বলাবলি কি আছে? এসব কথা যেন তার মাথায় আসেই না। প্রায় মিনিট-পনেরো যেতে না যেতেই, সে আর একটা গল্প জুড়ে দিলে। মার্শাল মাসেনা একবার কি রকম করে' যুদ্ধ করেছিলেন, তারি কথা,—সে যুদ্ধে নাকি মেজর তার পদাতিক-সৈন্য নিয়ে কোন্ এক অশ্বারোহী সেনার গতিরোধ করেছিল। মেজর বল্‌তে চায়, ঘোড়-সোয়ারের চেয়ে পদাতিক ঢের ভালো যুদ্ধ করে। সে সব কথা আমার কানে ভালো করে' যাচ্ছিল না।

ক্রমে রাত্রি এল। আমরা খুব জোরে চল্‌তে পারছিলাম না। পথের কাদা আরও গভীর, আরও পুরু হয়ে উঠতে লাগল। এক জায়গায় রাস্তার ধারে একটা খুব বড় শুক্‌নো গাছ প'ড়ে ছিল, আমি তারি তলায় এসে দাঁড়ালাম। আমার মতন মেজরও প্রথমেই ঘোড়ার তদ্‌বির কর্‌লে। তারপর, মা যেমন মাঝে-মাঝে বিছানার ঢাকা খুলে' ছেলে কি ক'চ্ছে দেখে, তেমনি করে' গাড়ীর ভিতরে একবার চেয়ে দেখ্‌লে।—শুন্‌লাম, বল্‌ছে, "এসো ত, মাণিক আমার! এই জামাটা পায়ের উপর দিয়ে রাখো—একটু ঘুমোও দিকিন্! হ্যাঁ, এইবার হয়েছে! না!—গায়ে একটুও বৃষ্টি লাগেনি। আরে, এ কি! ঘড়িটা গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম, ভেঙ্গে ফেলেছ! আমার অমন রূপোর ঘড়িটা গেল?—তা যাক্‌গে! তুমি ঘুমোও ত এখন, লক্ষীটি!—ভাবনা কি? আকাশ শিগ্‌গির ফর্সা হয়ে যাবে এখন। আশ্চর্য্য কিন্তু!—গায়ে অষ্টপ্রহর যেন জ্বর লেগে রয়েছে!—পাগলদের ঐ এক দশা! চকোলেট খাবে, মা? আচ্ছা, এই নাও, খাও।"

এর পর সে গাড়ীখানাকে সেই মরা-গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখ্‌লে; তারি চাকার তলায় ব'সে আমরা সেই অবিশ্রান্ত ধারার মধ্যে

কতকটা আশ্রয় পেলাম। তার কাছে একখানা, আর আমার কাছে এক-খানা—এই দু'খানা রুটি ছিল, তাই ভাগ করে' আমরা সে দিনের মত আহার শেষ কর্‌লাম। খেতে খেতে সে বল্‌লে,

"আজকের দিন এর চেয়ে ভালো কিছু জুটল না, এতে দুঃখ কর্‌বার কি আছে? একগাদা ছাই সরিয়ে, সেই আগুনে ঘোড়ার মাংস পুড়িয়ে,—আর তাইতে নুনের বদলে বারুদ দিয়ে খাওয়ার চেয়ে ত ঢের ভালো!—রাশিয়াতে তাই খেয়েছিলাম। ও বেচারীকে অবিশ্যি তাই খেতে দিই-নি! কারণ, আমার ক্ষমতায় যত দূর হ'য়ে উঠে, ওকে ভালো জিনিষই দিতে হবে যে! দেখ্‌তেই পাচ্ছ, আমি ওকে সব বিষয়ে আলাদা করে'—একটু আড়াল করে' রাখি। সেই কাণ্ড'র পর থেকে ও' আর মানুষ হ'তে পার্‌লে না! আমি ত' এখন বুড়ো হয়েছি, আর ওর এখন বিশ্বাস হয়ে গেছে—আমিই ওর বাপ, তবু ওর কপালে একটি চুমু খেতে যাই দিকি!—তা'হলে কি আর রক্ষে থাক্‌বে? একেবারে গলা টিপে' আমার দফা রফা করে' দেবে!—ভারী আশ্চর্য্য! নয়?"

তার সম্বন্ধে এইরকম আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় শুন্‌তে পেলাম, লরা একটি গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীর ভিতর থেকে বলে' উঠ্‌ল, "ওগো, আমার মাথা থেকে গুলিটা বার করে' দাও না গো!"—আমি উঠে দাঁড়াতেই মেজর আমাকে বসিয়ে দিলে, বল্‌লে, "চুপ করে' বস', ও কিছু নয়। ও ত সর্ব্বদাই ওই কথা বলে, ওর বিশ্বাস—ওর মাথার ভিতর একটা গুলি ঢুকে রয়েছে,—ওর মাথায় সর্ব্বদাই একটা যন্ত্রণা হয়।—তবু যখন যেটি বল, তখনি করে, বেজার হয় না।" আমি চুপ করে' শুনে গেলাম, বড় কষ্ট হ'ল। হিসেব করে' দেখ্‌লাম, ১৭৯৭ সাল থেকে আজ এই ১৮১৫ সাল—এই আঠার বচ্ছর লোকটার এমনি করে' কেটেছে! অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে' বসে' মানুষটার অদৃষ্ট আর তার কর্ম্মের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ, কি মনে হ'ল জানি নে, তার হাতটা চেপে ধরে' খুব নেড়ে দিলাম। সে অবাক হ'য়ে গেল। আমি খুব আবেগের ভরে বলে' উঠ্‌লাম, "তুমি মহাপ্রাণ!" "তার মানে?……ওঃ, ওই মেয়েটার জন্যে বুঝি? তুমি ত জানোই ভায়া, ও যে আমার কর্ত্তব্য! আর নিজের সুখ-দুঃখ?—সে ত অনেক দিন হ'ল চুকিয়ে দিয়েছি!"—এই ব'লে খানিক পরে আবার মাসেনার গল্প আরম্ভ কর্‌লে।

পরদিন ঠিক ভোরে আমরা বেথুন-সহরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে তখন চারিদিকে হুলুস্থুল—আসন্ন বিপদের সাড়া পড়ে' গেছে। চারিদিকে 'সাজ সাজ-রব—রণভেরী আর ঢাকের শব্দ। রাজার দলের বন্দুকধারী অশ্বারোহী-সেনার সঙ্গে যেই দেখা, অমনি আমি আমার দলে ভিড়ে গেলাম; ভিড়ের মধ্যে আমার সাথীদের আর দেখতে পেলাম না। দুঃখ এই—সেই যে ছাড়াছাড়ি হ'ল, আর দেখা হ'ল না।

জীবনে সেই প্রথম, আসল সৈনিকের প্রাণটা যে কি বস্তু, তা ভালো করে' দেখে নিয়েছিলাম। এই পরিচয়ের ফলে, এক রকমের মনুষ্য-চরিত্র আমার কাছে খুব স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এ আমি আগে ভালো বুঝতাম না, দেশের লোকও বোঝে না, তাই এ জিনিসের আদর নেই। প্রায় চোদ্দ বচ্ছর আমি সেনাবিভাগে কাটালাম, এমন চরিত্র আমি আরও দেখেছি, কিন্তু সে কেবল ওই নিম্নতম পদাতিক সৈন্যের মধ্যে। এদের প্রাণটা প্রাচীন-যুগের মানুষের মতন; কর্ত্তব্য-বোধটাই এদের ধর্ম্মবিশ্বাস, সেটাকে এরা চূড়ান্ত করে' ছেড়েছে। আদেশ পালন করার দরুণ কোন দুঃখ নেই, গরীব বলে' এরা লজ্জা করে না। এদের কথাবার্ত্তা চাল-চলন খুব সাদাসিদে; নিজে যশ চায় না, চায় দেশের গৌরব; সারা জীবনটা লোকচক্ষুর আড়ালেই কাটিয়ে দেয়—খায় পোড়া রুটি, আর দাম দেয় গায়ের রক্ত!

অনেকদিন এই মেজরের কোনো খবর আমি পাই নি, তার একটা কারণ, আমি তার নাম জান্‌তাম না,—সেও বলেনি, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। ১৮২৫ সালে একদিন একটা কাফি-খানায় বসে' এক পদাতিক-সেনার কাপ্তেনের কাছে আমি এই ঘটনাটা বর্ণনা করছিলাম, সে তখন প্যারেডের জন্যে অপেক্ষা করে' বসেছিল, আমার কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠল, বললে—

"আরে! লোকটাকে যে আমি চিন্‌তাম! বেড়ে লোক ছিল সে! আহা বেচারী!—ওয়াটার্লুর যুদ্ধে একটা গুলি খেয়েই সাব্‌ড়ে গেল! তার তল্পি-তল্পার সঙ্গে একটা পাগলাটে-গোছের মেয়েমানুষ ছিল বটে, তাকে আমরা 'আমিয়ে'-শহরের হাঁসপাতালে রেখে এসেছিলাম। সেখানে সে দিন-তিনেক পরেই ভীষণ উন্মাদ-অবস্থায় মরে' গেল।"

আমি বল্‌লাম, "কথাটা খুব সম্ভব বটে। তার পালক-পিতাও শেষটায় মারা গেল কি না!"

সে বল্‌লে, "হ্যাঃ! পালক-পিতা—না আরও কিছু!···কি? কি বল্‌লে —তার কথাগুলোর ভিতর বেশ একটু বাঁকা অর্থ ছিল। আমি বল্‌লাম,

"নাঃ, কিছু বলি-নি, বল্‌ছি—প্যারেডের বাজ্‌না বাজ্‌ছে।" বলে'ই বেরিয়ে গেলাম। সেবার আমিও কম আত্ম-সংযম করি-নি!

ধর্ম্ম-প্রচার

(১)

সম্রাট টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে, ফ্রান্সদেশের 'মার্সাইয়ে'-নগরে লাএটা আসিলিয়া নামে এক মহিলা বাস করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় রোমান রাজপুরুষ হেলভিয়াসের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটিও সন্তান না হওয়ায় তাঁহার অন্তরে জননী হইবার বাসনা বড়ই প্রবল হইয়াছিল। একদিন আরাধনা করিবার জন্য দেবমন্দিরে যাইবার কালে তিনি দেখিলেন, প্রবেশদ্বারে অনেকগুলি লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের দেহ প্রায় নগ্ন, অতিশয় শীর্ণ ও গলিতকুষ্ঠে আচ্ছন্ন! ইহাদিগকে দেখিয়া তিনি ভয়চকিত হইয়া মন্দিরের নিম্নতম সোপানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। লাএটার হৃদয়ে দয়ামায়া ছিল না এমন নয়, কিন্তু এই হতভাগ্য লোক-গুলির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যেমন দুঃখ হইল, তেমনই ভয়ও হইল। এমন কিম্ভূতদর্শন ভিখারীর দল তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই—কী বিবর্ণ শবাকার মূর্ত্তি! ভিক্ষাপাত্রগুলা পদতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া লাএটার মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল; তিনি হাত দিয়া নিজ বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন; অগ্রসর হইবার সাহস নাই, পলাইবার উপায়ও নাই—মনে হইল, সারা দেহ বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়ে! এমন সময়ে সেই হতভাগ্যদিগের মধ্য হইতে এক অতিশয় লাবণ্যবতী রমণী বাহির হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিল।

অপরিচিতা গম্ভীর অথচ সস্নেহকণ্ঠে বলিল, "ভদ্রে, আপনার কোনও ভয় নাই, ইহারা কেহই ক্রূর নহে। ইহারা মিথ্যা বা দুর্নীতির দাস নয়—প্রেম ও সত্যের প্রচারক। আমরা 'জুডিয়া'-দেশ হইতে আসিয়াছি, তথায়

ভগবানের পুত্র মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছেন। তিনি যখন স্বর্গারোহণ করিয়া তদীয় পিতার দক্ষিণভাগে আসন গ্রহণ করিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহার ভক্তগণ বড় নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন। ষ্টীফেনকে জনগণ লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছে। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ আমাদিগকে ধরিয়া এক কর্ণ ও মাস্তুলহীন নৌকায় চড়াইয়া অকূল সাগরে ভাসাইয়া দিয়াছিল, উদ্দেশ্য—আমরা একেবারে নিপাত হই! কিন্তু যে-ঈশ্বর তাঁহার মর্ত্ত্যবাসকালে আমাদিগকে প্রেম-চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনিই করুণা করিয়া সকলকে এই নগরীর বন্দরতীরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। হায়! 'মার্সাইয়ে'-বাসীরা লোভী, প্রতিমা-পূজক ও হৃদয়হীন। যীশুর সেবক-সেবিকা আজ অশন-বসনের অভাবে মৃতপ্রায়—ইহারা দৃক্‌পাতও করে না! এই দেবমন্দির তাহাদের চক্ষে পবিত্র, যদি এই স্থানে আশ্রয় না লইতাম তবে এতক্ষণে বোধ হয় তাহারা আমাদিগকে অন্ধকার কারাগৃহে টানিয়া লইয়া যাইত। তাহারা বুঝিল না—আমাদের সদয় অভ্যর্থনা করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইত, কারণ আমরা সুসমাচার আনিয়াছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া অপরিচিতা তাহার সঙ্গীদিগের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া, একে একে সকলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"ওই যে বৃদ্ধ আপনার দিকে প্রশান্তনেত্রে চাহিয়া আছেন, উঁহার নাম সীডন—উনি সেই জন্মান্ধ, প্রভু যাঁহাকে দৃষ্টিদান করিয়াছেন! সীডন এক্ষণে গোচর ও অগোচর, সমুদয় বস্তুই অতি পরিষ্কার দেখিতে পান! ওই যে আর একটি বৃদ্ধ—যাঁহার শ্মশ্রুরাশি শৈলতুষারের ন্যায় শুভ্র—উঁহার নাম ম্যাক্সিমিন। এই যে দেখিতেছেন—এত অল্প বয়সেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন—ইনি আমার ভাই; জেরুজালেম-নগরে ইঁহার বিস্তর ধন-সম্পত্তি ছিল। উঁহার পার্শ্বে আমার ভগিনী মার্থা ও আমাদের বিশ্বস্ত পরিচারিকা, মানটিলা; সম্পদ-কালে এই দাসী 'বেথানী'র পর্ব্বত-কানন হইতে জলপাই তুলিয়া আনিত।"

লাএটা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি? কী মিষ্ট তোমার কণ্ঠস্বর! কী সুন্দর মুখ! তোমার নাম কি?"

ইহুদানী বলিল, "আমাকে লোকে মেরী মাগ্‌ডেলেন বলিয়া ডাকে। আপনার স্বর্ণখচিত বসন ও গমন-ভঙ্গীর সহজ গরিমা দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আপনি এই নগরীর কোন রাজপুরুষের ঘরণী। এই কারণেই আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আপনার স্বামীর মনে, যীশুখ্রীষ্টের সেবক-

সেবিকাগণের প্রতি একটু করুণার উদ্রেক করুন; সেই ধনীকে গিয়া বলুন, "স্বামিন্, ইহারা বিবস্ত্র, ইহাদিগকে বস্ত্র দাও; ইহার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, ইহাদিগকে রুটি ও পানীয় দান কর—তাহা হইলে, ঈশ্বরের নামে এখানে যে ঋণদান করিলে, তিনি স্বর্গে তাহা পরিশোধ করিবেন।"

লাএটা আসিলিয়া উত্তর করিলেন, "মেরী মাগ্‌ডেলেন! তুমি যাহা বলিলে আমি করিব। আমার স্বামীর নাম হেলভিয়াস, ধনে মানে তিনি এই নগরীর একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। আমার কোনও প্রার্থনা তিনি বেশিক্ষণ অপূর্ণ রাখেন না, কারণ আমি তাঁহার প্রণয়ভাগিনী। তোমার সঙ্গীদিগকে দেখিয়া আমার যে ভয় হইয়াছিল তাহা এক্ষণে দূর হইয়াছে; এমন কি, আমি উহাদের দেহের অতি নিকট দিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিব। আমি দেবগণের আরাধনা করিতে যাইতেছি, দেবদ্বারে আমার একটি বিশেষ কামনা আছে—সে কামনা আজিও পূর্ণ হইল না!"

মেরী মাগ্‌ডেলেন দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার পথরোধ করিল এবং আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,

"না, না! মিথ্যা-প্রতিমার পূজা করিও না। পাষাণ-পুত্তলের নিকট পরমায়ু বা কামনার কথা তুলিও না। ঈশ্বর এক! দ্বিতীয় নাই! আমি আমার এই কেশরাশির দ্বারা তাঁহার পদতল মার্জ্জনা করিয়াছি!"

বলিতে বলিতে তাহার দীপ্ত নয়ন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আকাশের মত ঘন-কৃষ্ণ ও অশ্রুময় হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া লাএটা আসিলিয়া ভাবিতে লাগিলেন,

"আমারও ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মশাস্ত্রের যাহা কিছু বিধি সমুদয় আমি অন্তরের সহিত পালন করিয়া থাকি, কিন্তু এই রমণীর মধ্যে কেমন একটা স্বর্গীয় প্রেমের উন্মাদনা রহিয়াছে!"

মেরী মাগ্‌ডেলেন আবিষ্টের মত বলিয়া যাইতে লাগিল,

"তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ঈশ্বর! তথাপি তিনি আমাদেরই কুটীরদ্বারে এক পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে বসিয়া গল্পচ্ছলে তাঁহার সেই নীতিকথাগুলি বলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তরুণ! সুন্দর দেহকান্তি! কেহ তাঁহাকে ভালবাসিলে তাঁহার বড় আহ্লাদ হইত। সেদিন রাত্রে তিনি যখন আমার ভগিনীর গৃহে আহার করিতে আসিলেন, আমি তাঁহার চরণতলে বসিয়া

[illegible] অমনি তাঁহার মুখ হইতে অবারিত বারিধারার, মৃত অমৃত-বাণী নিঃসৃত হইতে লাগিল! আমার ভগিনী যখন আমার গৃহকর্মে অবহেলার জন্য অনুযোগ করিয়া বলিল, 'প্রভু! একবার উহাকে বলুন, আমি আপনার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছি, আমাকে সাহায্য করা উচিত নয় কি?"—শুনিয়া তিনি হাসিলেন, আমার দোষ কাটাইয়া দিলেন, আমাকে তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিতে অনুমতি করিলেন, বলিলেন—আমি ঠিক কাজটিই পছন্দ করিয়া লইয়াছি।

"তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, তিনি যেন এক তরুণ মেষ-পালক, কোনও পার্ব্বত্য-পল্লীতে তাঁহার বাস। তথাপি তাঁহার দুই চক্ষে যে দিব্য-প্রভা ফুটিয়া উঠিত তাহা আদি-ঋষি মুসা'র ললাট-নিঃসৃত জ্যোতিশ্ছটার মত। তিনি স্তব্ধরাত্রির মত ধীর-গম্ভীর, আবার উদ্যত বজ্রের মত কঠোর! যাহাদের বয়স অল্প—যাহারা নিরভিমান, তিনি তাহাদিগকে ভালোবাসিতেন; যখন পথে চলিতেন, শিশুরা তাঁহার নিকটে ছুটিয়া যাইত, তাঁহার বসন ধরিয়া টানিত। এব্রাহাম ও জেকব যে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তিনি সেই ঈশ্বর।—যে হাতে তিনি সূর্য্য ও তারকাগণকে গড়িয়াছেন—সেই হাতখানি তিনি নবজাত শিশুর গণ্ডে বুলাইয়া আদর করিতেন! তাহাদের জননীরা হাসিমুখে আপন আপন দুয়ারে দাঁড়াইয়া শিশুগুলিকে তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিত। ওই দেখুন, লাজারাসের মুখে এখনো মৃত্যুর ছায়া রহিয়াছে, উহার দৃষ্টি এখনও ভয়বিহ্বল,—ও যে যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে!"

কিছুক্ষণ হইতে লাএটার কানে আর কোন কথাই যাইতেছিল না।

এইবার তাঁহার স্বচ্ছ সরল চক্ষুদুইটি ও পরিষ্কার শুভ্র ললাটখানি ইহুদানীর পানে তুলিয়া তিনি বলিলেন,

"মেরী! আমি ভক্তিমতী, পিতৃপুরুষের ধর্ম্মে আমার আস্থা আছে—অভক্তি নারীজাতির পক্ষে মহাপাপ। ধর্ম্মে কর্ম্মে নিত্য-নূতন পদ্ধতি রোমীয় কুলবধূর পক্ষে একান্ত অশোভন। তথাপি আমি স্বীকার করি, তোমাদের পূর্ব্ব-দেশে যে সকল দেবতার পূজা হয় শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি যথার্থই সুন্দর; আমার মনে হয়, তোমার এই ঈশ্বর ইহাদেরই একজন। তুমি বলিতেছ ইনি শিশু ভালবাসেন, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মুখচুম্বন করেন—ইহার

যাহা বুঝিয়াছি, ইনি রমণীকুলের হিতার্থী। আমার দুঃখ হয়, এখানকার রাজ-কুলের অভিজাত-বংশের কেহই এই নূতন দেবতার প্রাধান্ত স্বীকার করেন না, নচেৎ, আমি এই দণ্ডে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার জন্ত মধু ও পিঠার নৈবেদ্ধ সাজাইয়া আনিতাম। তথাপি, ইহুদী-কন্তা, তোমাকে একটা কথা বলি। তোমাকে তোমার দেবতা ভালবাসেন বলিতেছ, তুমি তাঁহার নিকটে আমার হইয়া একবার প্রার্থনা কর—আমি নিজে করিতে সাহস পাই না; আমার দেবতারা এ পর্য্যন্ত সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না।"

কথাগুলি বলিবার সময় লাএটার কেমন বাধ'-বাধ' ঠেকিতেছিল, তাঁহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল, তিনি হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন।

মেরী মাগ্‌ডেলেন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভদ্রে, বলুন, কোন্ অপূর্ণ কামনায় আপনার চিত্ত এমন পীড়িত হইয়াছে?"

একটু একটু করিয়া লাএটার সাহস বাড়িল, তিনি উত্তর করিলেন,

"মেরী, তুমিও আমার মত নারী, অপরিচিত হইলেও আমার নারীহৃদয়ের গোপন কথা তোমাকে বলিতে পারি। আজ ছয় বৎসর আমি বধূ হইয়াছি, এখনও জননী হইতে পারিলাম না—এ আমার বড় দুঃখ। আমি একটি স্নেহের পুত্তলি চাই। আমার সে কামনা হয় ত' কখনও পূরিবে না, তথাপি তাহারই আশায় আমার বক্ষে যে স্নেহ ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার পীড়ায় আমি অবসন্ন হইতেছি। মেরী মাগ্‌ডেলেন! আমার দেবতা যে সুখে আমায় বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তোমার প্রার্থনায় তোমার ঈশ্বর যদি আমাকে সেই সুখে সুখী করেন, তবে জানিব তিনি প্রকৃত সুন্দর। তখন আমিও তাঁহাকে ভক্তি করিব, আমার আত্মীয়স্বজনকেও ভক্তি করিতে বলিব—তাহারাও আমারই মতন ধনী এবং বয়সে নবীন, তাহারাও এই নগরীর মধ্যে অতি উচ্চশ্রেণীর কুলীন।"

মেরী মাগ্‌ডেলেন অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "রোমান-কন্তা! তুমি যখন তোমার প্রার্থিত বস্তু লাভ করিবে, তখন এই যীশু-শিষ্যার নিকট যে অঙ্গীকার করিলে তাহা স্মরণ করিও।"

ল্যাএটা আসিলিয়া বলিলেন, "করিব। উপস্থিত এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ কর, তোমার সঙ্গীদের মধ্যে বাঁটিয়া দাও। আমি চলিলাম, এক্ষণে গৃহে

ফিরিব। গৃহে ফিরিয়াই তোমার ও তোমার এই সহযাত্রীগণের জন্য ডালায় ভরিয়া রুটি ও মাংস পাঠাইয়া দিব। তোমার ভ্রাতা, ভগিনী ও আর আর সকলকে বলিয়া দাও, তাহারা নির্ভয়ে এই দেবস্থান ত্যাগ করিয়া নগরের বহির্ভাগে কোনও অতিথিশালায় গিয়া উঠিতে পারে। আমার স্বামী হেলভিয়াসের এই নগরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, তাঁহার কথায় কেহ তোমাদের উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস পাইবে না। মেরী মাগ্‌ডেলেন, দেবগণ তোমার সহায় হউন! আমার সহিত যদি পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ হয়, কেবল জিজ্ঞাসা করিও—লাএটা আসিলিয়ার বাড়ী কোথায়? যে কেহ অনায়াসে দেখাইয়া দিবে।”

(২)

ছয় মাস অতীত হইয়াছে। লাএটা আসিলিয়া তাঁহার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে একখানি লাল কৌচের উপর বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া একটি ছেলে-ভুলানো গান গাহিতেছেন—এই গীত তাঁহার মাতা ও মাতামহীও এককালে গাহিতেন। ফোয়ারার জলে কুলুকুলু ধ্বনি হইতেছে, জলাধারের অগভীর জলতল হইতে তিনটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত জলদেবতার মূর্ত্তি যেন বাহির হইয়া উঠিয়া আসিতেছে। অদূরে একটি পুরাতন পুন্নাগ-বৃক্ষের পত্রাবলির মধ্যে সুখ-স্পর্শ সমীরণের মৃদু বীজনরব শোনা যাইতেছিল। যুবতীর সারা অঙ্গ যেন সুখালসে মূর্চ্ছিত, কানন-প্রত্যাগত ভ্রমরীর মত ভার-মন্থর—সুপুষ্ট সুডৌল দেহখানি যেন বাহুদুইটির দ্বারা আবৃত করিয়া আছেন। গান শেষ করিয়া লাএটা একবার চারিদিকে চাহিলেন, তারপর পরিপূর্ণ গৌরবে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার পদতলে শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণাঙ্গিনী ক্রীতদাসীরা কেহ সূতা কাটিতেছে, কেহ বস্ত্র বয়ন করিতেছে, কেহ বা সীবন-কর্ম্মে ব্যাপৃত,—তাহারা যেন অচির-প্রসবা প্রভু-পত্নীর শিশুসন্তানের জন্য কে কত শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইতে পারে, তাহারই পরিচয় দিতে ব্যস্ত। এক বৃদ্ধা দাসী হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখে একটি অতি ক্ষুদ্র টুপি আনিয়া ধরিল, লাএটা হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তিনিও সেইটিকে নিজের মুঠায় পরাইয়া হাসিতে লাগিলেন। লাল কাপড়ের উপর জরী ও মুক্তা

থাকায় টুপিটি বড় সুন্দর দেখাইতেছে—সে যেন বন্দিনী কাফ্রী-ক্রীতদাসীর স্বপনের মতই মনোহর !

এমন সময়ে অন্তঃপুর-বাটিকায় এক অপরিচিতা রমণী প্রবেশ করিল। তাহার বসন পথধূলির ন্যায় ধূসর, কোথাও তাহার জোড় বা সেলাই নাই—একখানি অখণ্ড বস্ত্রের আচ্ছাদন; তাহার কেশ ভস্ম-মলিন, কিন্তু অশ্রুক্ষীণ বদনমণ্ডল সুন্দর ও জ্যোতির্ম্ময়।

তাহাকে ভিখারিণী মনে করিয়া দাসীরা তাড়াইয়া দিতেছিল, কিন্তু লাএটা আসিলিয়া তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং শয্যাসন ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে তাহার সন্নিধানে গমন করিলেন।

তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মেরী! মেরী! তুমি সত্যই তোমার দেবতার প্রিয়পাত্রী! পৃথিবীতে তুমি যাঁহাকে ভালবাসিতে,—স্বর্গ হইতে তিনি তোমার কথা শুনিয়াছেন, তোমার অনুরোধে তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। এই দেখ—" বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সেই লাল টুপিটি দেখাইয়া বলিলেন, "আমি বড় সুখী হইয়াছি, তুমি আমার বড় উপকার করিলে!"

মেরী মাগ্‌ডেলেন বলিল, "লাএটা আসিলিয়া, আমি ইহা পূর্ব্বেই জানিতাম। এক্ষণে যীশুখৃষ্টের সদ্ধর্ম্মে তোমাকে দীক্ষিত করিতে আসিয়াছি।"

অনন্তর মার্সাইয়ে-বাসিনী দাসীদিগকে বিদায় করিয়া ইহুদানীকে একটি গজদন্তনির্ম্মিত স্বর্ণখচিত শয্যাসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু মেরী মাগ্‌ডেলেন নিতান্ত বিতৃষ্ণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সেই বায়ু-বিকম্পিত পত্রমর্ম্মর-মুখরিত পুন্নাগবৃক্ষটির ছায়ায় ধূলার উপর উপবেশন করিল।

মেরী বলিতে লাগিল—"বিজাতির কন্যা! তুমি মহাপ্রভুর সেবক-সেবিকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর নাই, এই কারণে আমি নিজে যীশুকে যেমন জানিয়াছি তোমাকেও তাঁহার সম্বন্ধে সেইরূপ উপদেশ করিব। আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসি, তুমিও সেইরূপ বাসিতে পারিবে। সেই পরমসুন্দর পুরুষোত্তমকে আমি যখন প্রথম দর্শন করি তখন আমি পাপী ছিলাম।"

অতঃপর কেমন করিয়া কুষ্ঠরোগী সাইমনের গৃহে গিয়া সে যীশুর চরণে পতিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া প্রভুর ভুবনপাবন চরণযুগলে মর্ম্মর-ভৃঙ্গার হইতে সবটুকু গন্ধ-তৈল নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিল—সে কাহিনী বলিল। অজ্ঞ নিরক্ষর শিষ্যগণের অসঙ্গত বাক্যের উত্তরে তিনি যে সকল পুণ্যবাণী বলিয়াছিলেন তাহাও পুনরাবৃত্তি করিল।

"যীশু বলিলেন, তোমরা এই নারীকে ভৎ'সনা করিতেছ কেন? ও উচিত কার্য্যই করিয়াছে। দেখ, দীন-দরিদ্রের সঙ্গ তোমরা সর্ব্বদা পাইবে, আমাকে চিরদিন পাইবে না। এই নারী যে আমার অঙ্গ তৈলচর্চ্চিত করিয়াছে, ইহাতে উহার দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ, আমার এই-দেহ শীঘ্র মৃত্তিকা-তলে সমাধিস্থ হইবে—সেজন্য এই শেষ-কৃত্যের প্রয়োজন ছিল। আমি তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি, আমার সদ্ধর্ম্ম জগতের যেখানেই প্রচারিত হইবে, সেইখানে এই ঘটনা কীর্ত্তিত হইবে, এবং এই নারীও সর্ব্বত্র পূজিত হইবে।"

তদনন্তর, তাহার দেহমধ্যে যে সাতটি পিশাচ ভীষণ দৌরাত্ম্য করিতেছিল তাহাদিগকে যীশু কেমন করিয়া তাড়াইয়া দেন, সেই ঘটনা সে বর্ণনা করিল। পরিশেষে বলিল,

"সেই দিন হইতে প্রেম ও ভক্তির পুলক-শিহরণে আমি তন্ময়, সুখের আবেশে আমার সারাপ্রাণ যেন বিভোর হইয়া আছে। আমি যেন সর্ব্বদা আমার প্রভুর পদচ্ছায়ায় এক নূতন স্বর্গোদ্যানে বাস করিতেছি!"

অতি-শুভ্র স্বচ্ছন্দজাত লিলি-ফুলে প্রান্তর ছাইয়া গিয়াছে, যীশুর সহিত সেও সেই ফুলরাশির পানে চাহিয়া থাকিয়াছে। শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক হইলে প্রাণের মধ্যে যে অপরিসীম আনন্দের উদ্রেক হয়, সেই আনন্দের কথা সে বলিল। অতঃপর যীশু কেমন করিয়া মিথ্যা অভিযোগে ধৃত হইলেন, এবং অনুচরবর্গের মুক্তির জন্য নিজে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিলেন—পরে মৃত্তিকাতলে সমাধি ও পুনরুত্থান,—একে একে সকল কথাই বিস্তারিত করিয়া শুনাইল।

হঠাৎ মেরী বলিয়া উঠিল, "আমিই প্রথম প্রভুকে পুনর্জীবিত অবস্থায় দেখি। যেখানে তাঁহার দেহ রক্ষা করা হইয়াছিল তথায় গিয়া দেখি, দুই শুভ্রবসন

দেবদূত—একজন শিয়রে ও একজন পাদদেশে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'বাছা কাঁদিতেছ কেন?' 'আমি বলিলাম, আমি আমার প্রভুকে হারাইয়াছি!—তাই কাঁদিতেছি।'

"এমন সময়ে কি দেখিলাম!—আনন্দ যে আর ধরে না!—দেখিলাম, যীশু স্বয়ং আমার দিকে উঠিয়া আসিতেছেন! প্রথমে মনে হইল, বুঝি-বা উদ্যানরক্ষক; কিন্তু তিনি যেই 'মেরী!' বলিয়া আমায় ডাকিলেন, অমনি চিনিতে পারিলাম—আমার দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'প্রভু আমার!' তিনি অতি ধীরে মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি এখনও আমার পিতার সামীপ্য লাভ করি নাই'।"

এই চরিত-কথা শুনিতে শুনিতে লাএটা আসিলিয়ার মন হইতে সুখ-সন্তোষ যেন অল্পে অল্পে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। নিজের অতীত ও বর্ত্তমান ভাবিয়া মনে হইল, এই যে নারী একজন সত্যকার দেবতাকে ভালবাসিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের জীবন কি নিরর্থক! সম্ভ্রান্ত বংশের দুহিতা, ধর্ম্মভীরু তরুণীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের কথা যাহা মনে পড়ে, সে ত' সমবয়সী সখী-জনের সঙ্গে এক পাত্রে পিষ্টক-ভোজনের কথা! হেলভিয়াসের আদর, সার্কাসের ক্রীড়াকৌতুক, এবং গৃহে বসিয়া সূচীকর্ম্ম—এ সব কতকটা উল্লেখযোগ্য হইলেও, মেরী মাগ্‌ডেলেনের যে কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহার দেহ ও অন্তরাত্মা তীব্র চেতনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে—তাহার তুলনায় সে সকল কী তুচ্ছ! তাঁহার হৃদয় দারুণ ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অনুশোচনা জাগিয়া উঠিল।

এই ইহুদানীর মুখ দেখিয়াও তাঁহার ঈর্ষ্যা হইল,—অনুতাপিনীর ভস্মমলিন দেহে এখনও অপরূপ রূপলাবণ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে! তাহার দেবতা-ঘটিত সুখ-দুঃখের কথায়, এমন কি তাহার শোক-সন্তাপেও, তিনি যেন ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন।

"ইহুদীর কন্যা! তুমি এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যাও! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও আমি কত স্বস্তি বোধ করিতেছিলাম, নিজেকে কত সুখী মনে করিয়াছিলাম! জীবনে যে আর কোনও প্রকার সুখ আছে, এ ধারণাও আমার ছিল না। আমার স্বামী হেলভিয়াসের প্রেম ভিন্ন আর কোনোরূপ প্রেমের কথা আমি কখনও ভাবি নাই। আমার মাতা ও মাতামহীর মত দেবপূজা করিয়া

যে ধর্ম্মসুখ পাই, তদ্‌ভিন্ন আর কোনও স্বর্গীয় আনন্দের বার্ত্তা আমার জানা ছিল না। হাঁ, এতক্ষণে বুঝিয়াছি—তুই পিশাচী! আমার জীবনের যাহা-কিছু সুখ তাহা তুই নষ্ট করিতে আসিয়াছিলি—কিন্তু পারিলি কই? যে জীবন্ত প্রত্যক্ষ দেবতাকে তুই ভালবাসিয়াছিলি তাহার কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি? তুই সেই মহাপুরুষের মৃত্যু ও পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখিয়াছিস বলিয়া আমার নিকটে গর্ব্ব করিতেছিস্, তাহাতে আমার কি?—আমি ত' আর স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না। আমি সন্তানবতী হইয়া যে একটু সুখের আশা করিতেছি, তাহাও নষ্ট করিবি? তুই পাপিষ্ঠা! আমি তোর দেবতার কোন কথা শুনিব না। তুই তাঁহাকে যেরূপ ভালোবাসিয়াছিস্—তাহা অতিরিক্ত, তাহা গর্হিত! আলুলায়িতকেশে পদতলে লুটাইয়া না পড়িলে সে দেবতা প্রসন্ন হন না। জানিস্, আমি সম্ভ্রান্তবংশের কুলস্ত্রী,—এমন মতিগতি আমার শোভা পায়? তেমন করিয়া পূজা করিতে দেখিলে হেলভিয়াস্ অসন্তুষ্ট হইবেন। যে পূজায় রমণীর বেণীবন্ধন নষ্ট হয়, তেমন পূজা নাই করিলাম! না!—মিথ্যা নয়!—আমার গর্ভে যে শিশু আসিয়াছে তাহাকেও তোর ওই খ্রীষ্টের কথা শুনাইতে দিব না। যদি কন্যা হয় তাহা হইলে, আমাদের দেশে মাটী পুড়াইয়া যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবদেবী নির্ম্মাণ করে—তাহাদিগকেই পূজা করিতে শিখিবে, ইচ্ছা হয় সেগুলিকে খেলার সামগ্রী করিতে পারিবে—তাহাতে বিপদ নাই। শিশু ও জননীগণের পক্ষে এইরূপ দেবতাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। তুই বড় গর্ব্ব করিয়া আমাকে তোর প্রেমের কাহিনী শুনাইতে আসিয়াছিস্—আমাকেও মজাইতে চাস্! তোর আস্পর্দ্ধা কম নয়! তোর দেবতাকে তুই পূজা কর্—আমি করিব কেন? আমি কি তোর মত পাপ করিয়াছি? আমাকে সাতটা পিশাচেও পায় নাই, আমি তোর মত মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়াও বেড়াই না—জানিস্ না, আমি ভদ্রঘরের কুলবধূ! তুই এখনি এখান হইতে দূর হইয়া যা!"

তখন মেরী মাগ্‌ডেলেন বুঝিতে পারিল, নবধর্ম্ম-প্রচার তাহার কর্ম্ম নয়। তাই অতঃপর সে অরণ্যমধ্যে এক নির্জ্জন গুহায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে লাগিল। সেই গুহাটির নাম হইয়াছিল 'পুণ্য-গুম্ফা'। পুরাণকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এই যে ঘটনা আমি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, ইহার অনেক পরে লাএটা আসিলিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

জল্লাদ

(১)

ক্ষুদ্র মেন্দা-শহরের ঘড়ি-ঘরে এই মাত্র রাত্রি দুই-প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। দুর্গ-প্রাসাদের উচ্চ-ভূমিতে, উদ্যানের অপর প্রান্তে, জনৈক তরুণ ফরাসী সেনা-নায়ক প্রাকারের উপরে ভর দিয়া যেন কোন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে। সৈনিকের ভয়-ভাবনা-হীন জীবনে এইরূপ চিন্তামগ্ন হওয়া স্বাভাবিক নয়, তথাপি, আজিকার ঐ রাত্রি এবং এমন স্থান ও এমন দৃশ্য যে ভাবোদ্রেকের বিশেষ অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মাথার উপরে মেঘহীন নীল আকাশের গম্বুজ। নিম্নে যে রমণীয় উপত্যকাভূমি প্রসারিত রহিয়াছে, তাহার পথগুলি ক্রমাগত ঘুরিয়া গিয়াছে; পথের সেই বাঁকগুলির উপরে তারার অস্ফুট আলো ও মৃদু চন্দ্রকিরণ পড়িয়াছে; যুবক সেই দিকে চাহিয়াছিল। নিকটে একটি কমলা-লেবুর গাছে অজস্র ফুল ধরিয়াছে, সে তাহারই গায়ে হেলান দিয়া প্রায় একশত ফুট নীচে ক্ষুদ্র শহরটি দেখিতে পাইতেছিল। যে পর্ব্বতের উপরে প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ শহর যেন উত্তরের হিম-বায়ু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাহারই আড়ালে, পদতলে আশ্রয় লইয়াছে। মুখ ফিরাইতেই অদূরে সমুদ্র দেখা গেল, সেই চন্দ্রালোকে তাহার তরঙ্গমালা যেন বেলাভূমির প্রান্তে একটি রূপার পাড় বুনিয়া চলিয়াছে।

ভিতরে নৃত্যগীত চলিতেছিল। আনন্দের কলগুঞ্জন, দ্রুতপদচারণ-ধ্বনি, বেহালার সঙ্গীত, এবং সৈনিক-কর্ম্মচারী ও তাহাদের নৃত্যসঙ্গিনীদিগের উচ্চ-হাস্য,

দূরাগত সাগর-মর্ম্মরের সহিত মিশিয়া, তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। দিনের প্রচণ্ড উত্তাপে অবসন্ন হইয়া, এখন রাত্রির শীতল স্পর্শে সে যেন একটু সঞ্জীবিত হইয়াছে; স্নিগ্ধ-সুরভি বায়ুপ্রবাহে অবগাহন করিয়া তাহার অঙ্গ যেন জুড়াইয়া যাইতেছে।

দুর্গের যিনি অধিপতি তিনি এই দেশের অভিজাত-বংশীয় প্রধান-গণের একজন; প্রাসাদে তিনিই সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। ঐ পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা আজ সারা বিকাল ধরিয়া, এই যুবা-সেনা-নায়কটিকে যেরূপ চোখে-চোখে রাখিয়াছিল—হয় ত' তাহার সেই করুণা-কাতর দৃষ্টি স্মরণ করিয়াই—যুবক এমন উন্মনা হইয়াছে। ক্লারা ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী। যদিও তাহার আরও এক ভগিনী ও তিন ভ্রাতা বিদ্যমান, তথাপি লেগাঞেসের মার্কুইস যেরূপ বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকারী, তাহাতে ক্লারা যে তাহার বিবাহকালে প্রভূত যৌতুক পাইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সারা স্পেনদেশে যাঁহার মত উৎকট আভিজাত্য-গর্ব্ব আর কাহারও ছিল না, তিনি যে পারী-শহরের এক মুদীর পুত্রকে কন্যাদান করিবেন এমন অসম্ভব আশা সে পোষণ করে কেমন করিয়া? ইহার উপর, ঐ পরিবারের ফরাসী-বিদ্বেষও কম নহে। মার্কুইস যে রাজা ফের্দিনান্দের পক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, এমন সন্দেহের কারণও ছিল; পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের জনগণ ঐ মার্কুইস ভিন্ন আর কাহারও আদেশ মান্য করে না। উহাদিগকে সদা সন্ত্রস্ত রাখিবার জন্যই প্রধান সেনাধ্যক্ষ, ভিক্তর মার্শাঁর অধীনে একদল সৈন্য এই মেন্দা-শহরে মোতায়েন রাখিয়াছেন। তিনি মার্শাল নে'র প্রেরিত এক পত্রে অবগত হইয়াছেন যে, ইংরাজেরা অবিলম্বে সমুদ্রকূলে অবতরণ করিবার চেষ্টায় আছে, এবং মার্কুইস নাকি গোপনে লণ্ডনের মন্ত্রীসভার সহিত বার্ত্তা-বিনিময় করিতেছেন।

মেন্দাবাসিগণ ভিক্তরের সেনাদলকে যথারীতি সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল; তথাপি অতিশয় সতর্কভাবে থাকিতে হয়। প্রাসাদসংলগ্ন সেই উদ্যানের উচ্চভূমিতে দাঁড়াইয়া সে আবার একবার নিম্নে শহরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিল। ঐ ভূমির কিনারার দিকে যাইতে যাইতে সে একবার ভাবিল, মার্কুইস যে তাহার সহিত এমন সদয় ব্যবহার করিতেছেন, তাহার অর্থ কি? আর, চারিদিকে যখন এমন অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে, তখন সেনাপতি 'জি'-ই বা কেন এত সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন? কিন্তু তখনই তাহার চিন্তা-ধারার পরিবর্ত্তন হইল—আবার সন্দেহ ও সতর্কভাব জাগিয়া উঠিল। সন্দেহের

কারণও ঘটিয়াছে। সহসা তাহার খেয়াল হইল, নীচে নগরমধ্যে অনেক আলো জ্বলিতেছে। যদিও ঐ দিনটা ছিল স্পেনবাসীদের একটা পর্ব্বদিন, তৎসত্বেও সে প্রভাতেই আদেশ-জারী করিয়াছে যে, একমাত্র দুর্গ-প্রাসাদ ভিন্ন আর কোথাও সেদিন আলো জ্বলিবে না; সামরিক বিধি-অনুযায়ী সকল আলোকই একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিবাইয়া দিতে হইবে। সে দেখিল, সৈনিক প্রহরীগণ নিজ নিজ স্থানে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে; এখানে ওখানে তাহাদের সঙ্গিনের ফলকগুলি চকমক করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সারা শহরে একটা গভীর নিস্তব্ধ ভাব। ঐরূপ আলোক সত্বেও, স্পেনীয়গণ যে উৎসবের আমোদে মত্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইতেছে না। সে কিছুক্ষণ ধরিয়া নগরবাসীদের এই আইন অমান্য-করার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রহস্য যেন ক্রমেই আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। আরও কারণ, সে তাহার অধীনস্থ কয়েকজন কর্ম্মচারীকে নগরের অবস্থা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার আদেশ দিয়া আসিয়াছিল—যেন তাহারা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সব স্বচক্ষে দেখে। শহরে প্রবেশ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে পথ, তাহার মুখে একটি ছোট পাহারা-ঘর ছিল। সে এক্ষণে শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইবার জন্য, যৌবনসুলভ অধীরতায়, দেওয়ালের একটা ফাঁক দিয়া লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইল, কারণ বাঁধা-পথে যাইতে হইলে বিলম্ব হইবে। ঠিক সেইসময়ে পশ্চাতে একটা মৃদু শব্দ শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল, মনে হইল, যেন উদ্যানের কঙ্করাকীর্ণ পথের উপরে কোন রমণীর লঘু পদক্ষেপ শোনা যাইতেছে। সেই দিকে ফিরিয়া সে কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চক্ষু সমুদ্রের দিকে চাহিয়া যেন ধাঁধিয়া গেল, অকূল জলরাশির সে কি অপূর্ব্ব প্রভা! পরক্ষণে যাহা দেখিল, তাহাতে নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুভ্র চন্দ্রালোকে দিগন্ত পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই আলোকে সে অতিদূরে সমুদ্রবক্ষে কয়েকটি জাহাজের পাল সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল; দেখিয়া তাহার সারাদেহে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে নিজেকে বুঝাইতে চাহিল যে, অতিচঞ্চল তরঙ্গমালার উপরে চন্দ্রকিরণ পড়িয়া ঐরূপ একটা মায়াদৃশ্য রচনা করিয়াছে। এই কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে শুনিতে পাইল, কে যেন ভাঙা-গলায় তাহাকেই ডাকিতেছে। দেয়ালের ফাঁকটার দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল, একজন সিপাহীর মস্তক তাহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিতেছে,—দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সে তাহারই অনুচর এক বন্দুকধারী সৈনিক।

"ওখানে কি আপনি ?—সেনানায়ক মহাশয় ?"

"হাঁ, কি ব্যাপার বল দেখি ?"—অতি মৃদু স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল, কারণ একটা বিপদের আশঙ্কায় সে অতিশয় সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে।

"নীচেকার ঐ বাঁদীর বাচ্চাগুলা যেন পোকার মত নিঃসাড়ে চলাফেরা করিতেছে। উহাদের উপর নজর রাখিয়া আমি এতক্ষণ টহল দিতেছিলাম, এখন আপনার আদেশমত কিছু খবর লইয়া আসিয়াছি।"

"বলিয়া যাও।"

"এই মাত্র দুর্গ-প্রাসাদের একটা লোক লণ্ঠন হাতে এইদিকে আসিতেছিল, আমি তাহার পিছু লইয়াছিলাম। লণ্ঠন জিনিসটাই বড়ই সন্দেহজনক—বিশেষ, এত রাত্রে ঐ ধর্ম্মপুত্রটির বাতি জ্বালাইবার কি গরজ পড়িল? মনে মনে ভাবিলাম, বেটারা কি আমাদিগকে সাবাড় করিবার মতলবে আছে নাকি তখনই লোকটার পিছু লইলাম। ভাগ্যে কাজটা করিয়াছিলাম, তাই এখান হইতে হাত কয়েকের মধ্যেই, এক জায়গায় একরাশ শুক্না কাঠ গাদা-করা রহিয়াছে—দেখিতে পাইলাম।"

হঠাৎ নীচের শহর হইতে একটা ভীষণ তীব্র আওয়াজে লোকটার কথা বন্ধ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সেনানায়কের মুখের উপর একটা আলোকের ঝলক লাগিল, এবং বন্দুকধারী সিপাহীটা গুলিবিদ্ধ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে সম্মুখে প্রায় দশ হাত দূরে একরাশি কাঠ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভিতরে নৃত্যসভার সঙ্গীত ও হাস্যকলরব নিমেষে স্তব্ধ হইয়া গেল—কেবল মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ সেই মৃত্যুবৎ নীরবতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। তাহার পর সমুদ্রের শুভ্র বারিরাশির উপর দিয়া কামান-গর্জ্জন ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

(২)

সেনানায়কের ললাট ঘামিয়া উঠিল। সে তাহার তরবারি ফেলিয়া আসিয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিল, তাহার অনুচরগণ সকলেই নিহত হইয়াছে; ইংরেজ-সৈন্যও এখনই অবতরণ করিবে। ইহাও বুঝিল যে, বাঁচিয়া থাকিলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, হয় ত' কোর্ট-মার্শালের বিচারাধীন হইতে

হইবে। সে একবার নীচের দিকে চাহিয়া ঐ স্থানের উচ্চতা দেখিয়া লইল, তাহার পর যেমন ঝাঁপ দিতে যাইবে, অমনি কে তাহার বাহুটা ধরিয়া ফেলিল।

ক্লারা বলিল, "এখনই পলাও! আমার ভাইয়েরা আসিতেছে—তোমাকে হত্যা করিবে। নীচে ঠিক এই পাহাড়ে উঠিবার পথের মুখে জুয়ানিতোর ঘোড়া বাঁধা আছে—আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না।"

সে তাহাকে এক রকম ঠেলিয়া দিল। যুবক কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে বিহ্বল বিমূঢ় ভাবে চাহিয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণে, প্রাণ-বাঁচাইবার সহজাত সংস্কার তাহার পৌরুষকে জয় করিল—সে উদ্যান পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে দৌড়িতে লাগিল; এক শৈল হইতে অপর শৈলে লাফ দিয়া সে এমন পথ ধরিল, যে-পথে পার্ব্বত্য-ছাগ ভিন্ন আর কোন প্রাণী চলিতে পারে না। সে ক্লারার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল—তাহার ভাইকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিতেছে; তারপর আততায়ীদের পদশব্দও শোনা গেল; কয়েকবার তাহার কানের পাশ দিয়া বন্দুকের গুলি ছুটিয়া গেল। তৎসত্ত্বেও সে পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া পেঁছিল, ঘোড়াটাও দেখিতে—পাইল; চড়িয়া তাহাকে বিদ্যুৎবেগে ছুটাইয়া দিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে, ভিক্তর মার্শাঁ সেনাপতি 'জি'-র সেনানিবাসে প্রবেশ করিল। তিনি তখন আর সকলের সহিত ভোজনে বসিয়াছিলেন। সেনানায়কের সর্ব্বশরীর অবসন্ন, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে, সেই অবস্থায় সেনাপতির সম্মুখে গিয়া সে বলিল—

"আমার জীবন এখন আপনার হাতে।"

তারপর একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে সব কথা বলিয়া গেল। যেরূপ নীরবে সকলে তাহা শুনিল তাহা সত্যই ভীতিজনক। অবশেষে, সেই ভীষণ-প্রকৃতি জেনারেল ধীর কণ্ঠে বলিলেন—

"তোমাকে দোষ না দিয়া দয়া করাই উচিত। স্পেনীয়দের এই কুকর্ম্মের জবাবদিহি তোমাকে আর করিতে হইবে না; মার্শাল নে' যদি অন্যরূপ বিবেচনা না করেন, তবে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।"

এ কথায় হতভাগ্য সেনানায়ক বিশেষ সান্ত্বনা পাইল না, বলিয়া উঠিল—"আর, যদি এ কথা সম্রাটের কানে যায় ?"

সেনাপতি বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি তোমাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবেন। তবু দেখা যাক্, কি করিতে পারি।" তার পরেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপাততঃ সে আলোচনা থাক্। এখন ইহার এমন একটা প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে উহাদের বুকের রক্ত জমিয়া যায়—উহাদের যুদ্ধরীতি মানুষের মত নয়, বন্যপশুর মত।"

ইহার এক ঘণ্টা পরে, একটি পূরা রেজিমেণ্ট, একদল অশ্বারোহী-সেনা, এবং সহকারীহিসাবে একটি ক্ষুদ্র গোলন্দাজ-বাহিনী পথে বাহির হইয়া পড়িল। স্বয়ং সেনাপতি ও সেনানায়ক ভিক্তর ইহাদের আগে আগে চলিলেন। স্পেনীয়গণ তাহাদের সহচরগণের কি দশা করিয়াছে, তাহা ঐ সেনাদলকে উত্তমরূপে জানাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে তাহারা ক্রোধে আগুন হইয়া উঠে।

মূল ঘাঁটি হইতে মেন্দায় যাইতে যতখানি পথ তাহা যেন মন্ত্রবলে শেষ হইয়া গেল। মধ্যবর্ত্তী গ্রামগুলা ইতিপূর্ব্বে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, সেই সকল পল্লীর একটাও রক্ষা পাইল না, গ্রামকে-গ্রাম ধ্বংস হইয়া গেল।

এদিকে ইংরেজের জাহাজ তখনও সমুদ্রে ভাসিতেছে, তীরে পৌঁছিতে পারে নাই। ব্যাপারটি সে সময়ে দুর্ব্বোধ্য হইলেও, পরে জানা গিয়াছিল যে, ঐগুলি আসল রণতরী নহে; কয়েকখানা কামানবাহী জাহাজ মূল-বহরকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক আগে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মেন্দার অধিবাসিগণ সমুদ্রবক্ষে ঐগুলিকেই দেখিয়া যে-সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহা ত' পাইলই না, এই হঠাৎ বিদ্রোহের ফলে শত্রুসেনার সেই দারুণ আক্রমণ এক-মুহূর্ত্তের জন্য রোধ করিতে পারিল না; কিছু করিবার পূর্ব্বেই তাহারা ফরাসী-সেনার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিল। স্পেনীয়গণের দেশপ্রেম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নগর-রক্ষী ফরাসী সৈন্যকে হত্যা-করার জন্য দায়ী, তাঁহারা এক্ষণে শহরটিকে রক্ষা করিবার জন্য, নিজেরাই প্রাণদান করিতে অগ্রসর হইলেন; কারণ, ফরাসী সেনাপতির নিষ্ঠুর প্রকৃতির কথা তাঁহারা জানিতেন, তাই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি সমুদায় মেন্দা-শহরটাকে অগ্নিসাৎ করিবেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই

শিরশ্ছেদ করা হইবে। সেনাপতি 'ব্রি'—তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিলেন; তবে সর্ত্ত রহিল যে, নিম্নতম ভৃত্য হইতে মার্কুইস পর্য্যন্ত, দুর্গ-প্রাসাদের সকলকেই নির্ব্বিচারে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নেতৃগণ এই সর্ত্তে রাজী হইলে পর, সেনাপতি অবশিষ্ট নগরবাসীর প্রাণরক্ষার, এবং শহরটিকে দাহ ও লুণ্ঠন হইতে অব্যাহতি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই সঙ্গে একটা বড় জরিমানাও ধার্য্য করিলেন, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহা আদায়ের জন্য, নগরের ধনাঢ্যতম ব্যক্তিদিগকে জামিনস্বরূপ আটক রাখা হইল। নিজ সৈন্যদলের নিরাপত্তা-বিধান, এবং স্থানটি যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত করিবার জন্য, তিনি সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন—সৈন্যগণকে শহরের গৃহে গৃহে বাস করিতে দেওয়ার ব্যবস্থাও না-মঞ্জুর করিয়া দিলেন। তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে রাত্রিযাপনের আয়োজন করিল।

(৬)

অতঃপর ফরাসী-সেনাপতি বিজয়ীর বেশে সেই প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ করিলেন। লেগানেসের সমগ্র পরিবার ও পরিজনবর্গের মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হইল, তাঁহারা সেই সুবৃহৎ নৃত্যশালার কঠোর পাহারার অধীন হইয়া রহিলেন। ঐ কক্ষের বাতায়ন দিয়া দুর্গ-প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদয় উচ্চভূমি দৃষ্টিগোচর হয়।

সেনাপতির শরীর-রক্ষী ও সহকারী সেনানায়ক যাহারা, তাহাদের বাসস্থান ঐ প্রাসাদের বহির্ভাগে একটি বারান্দায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে ইংরাজদিগের অবতরণ ব্যর্থ করিবার জন্য, একটি মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইল। মন্ত্রণার শেষে জনৈক কর্ম্মচারীকে মার্শাল নে'র নিকটে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং সমুদ্রকূলে কামানশ্রেণী বসাইবার ব্যবস্থাও করা হইল। অতঃপর সপারিষদ সেনাপতি-মহাশয় বন্দীগুলার সদ্‌গতি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যে দুইশত মেন্দাবাসীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইল। এই সামরিক হত্যাকার্য্য সমাধা করিয়া সেনাপতি হুকুম দিলেন, প্রাসাদে যতগুলি বন্দী আছে ততগুলি ফাঁসিকাঠ ঐখানেই বসানো হউক এবং ফাঁসি-দিবার জন্য, শহর হইতে ঐ কাজের এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনা হউক। এদিকে ভিক্তর, ভোজনে

বসিবার পূর্ব্বে যে সময়টুকু পাইয়াছিল, তাহার সুযোগে বন্দীদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে সেনাপতিকে

"আমি একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিলাম।"

সেনাপতি তাহা শুনিয়া একরূপ বিদ্রূপ-তিক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন— "তুমি!"

"কোন্ মুখেই বা বলি! অনুগ্রহটাও কম দুঃখকর নয়। বাহিরে যে ফাঁসিকাঠগুলা তোলা হইতেছে, বৃদ্ধ মার্কুইস তাহা দেখিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের মৃত্যুদণ্ডের একটু পরিবর্ত্তন করেন—ফাঁসি না দিয়া যেন তাঁহাদের শিরশ্ছেদ করা হয়।"

সেনাপতি বলিলেন, "মঞ্জুর"।

"তাঁহার আর একটি প্রার্থনা এই যে, মৃত্যুকালে তাঁহারা যেন যথাবিধি ধর্ম্মের সান্ত্বনালাভ হইতে বঞ্চিত না হন, আর এখনই তাঁহাদের হাত-পা খুলিয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, কেহই পলায়নের চেষ্টা করিবেন না।"

সেনাপতি বলিলেন "তাহাও মঞ্জুর করিলাম, কিন্তু তুমি জামিন রহিলে।"

"আপনি যদি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রাণভিক্ষা দেন, তবে বৃদ্ধ মার্কুইস তাঁহার সকল সম্পত্তি আপনাকেই দান করিবেন।"

শুনিয়া সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন—

"তাই নাকি! তাঁহার সম্পত্তি ত' পূর্ব্বেই রাজা জোসেফের নামে বাজেয়াপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি একটু চুপ করিলেন, পরে—যেন অবজ্ঞাভরে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—

"তিনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তদপেক্ষা একটা ভাল মতলব আমি স্থির করিয়াছি। তাঁহার ঐ শেষ প্রার্থনার অর্থ বুঝিয়াছি। আচ্ছা, বেশ; তাঁহার বংশের নামটা যাহাতে বজায় থাকে তাহাই হউক। কিন্তু সেই নামের সঙ্গে স্পেনবাসীরা চিরদিন স্মরণ করিবে—সে কত বড় বিশ্বাসঘাতকের নাম! আর তাহার শাস্তিই বা কিরূপ হইয়াছিল। আমি তাঁহার পুত্রগণের যে-কোনটিকে ধন ও প্রাণ দুইই ফিরাইয়া দিতে রাজী আছি—কেবল একটিমাত্র সর্ত্তে, তাহাকেই জল্লাদের কাজ করিতে হইবে। ব্যস! আর নয়, আমি আর কোন কথা শুনিব না।"

আহার্য্য প্রস্তুত; সামরিক কর্ম্মচারিগণ সকলেই লুব্ধ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভোজনে বসিলেন, কেবল একজন অনুপস্থিত রহিল—সে ভিক্তর মার্শাঁ। অনেক ইতস্তত: করিয়া সে সেই নৃত্যশালায় প্রবেশ করিল। সে কক্ষ তখন লেগাঞেস্-পরিবারের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া যুবকের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কাল রজনীতেও তাহারা এই কক্ষে নৃত্য করিয়াছিল—নৃত্যের ঘূর্ণনে তাহাদের মুখগুলি এক একবার চোখে পড়িয়া তখনই অন্তর্হিত হইতেছিল। এই দুই তরুণী ও তিন ভ্রাতার মাথাগুলি আর একটু পরেই ঘাতকের অসিতে দ্বিখণ্ডিত হইবে! তিন পুত্র ও দুই কন্যার সহিত তাহাদের জনক-জননী নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছেন, স্বর্ণমণ্ডিত চেয়ারে তাঁহাদের হস্তপদ বদ্ধ। মার্কুইস-পরিবারের আটজন ভৃত্যও একদিকে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের হাতগুলা পিছমোড়া করিয়া বাঁধা। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই পনেরো জন কয়েদী অতি গম্ভীরভাবে পরস্পরের সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিতেছিল। তাহাদের চোখ দেখিয়া বুঝা যায় না, ভিতরে কি ভাবের উদয় হইতেছে! কিন্তু দুই-একজনের ললাটে দারুণ ক্ষোভমিশ্রিত একটা কঠিন নির্ভাবনার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—এত বড় চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল!

যে সৈনিকগণ নির্ব্বিকার ভাবে পাহারা দিতেছিল, তাহারাও মহাশত্রুর এতবড় দু:খে সমীহ বোধ করিতেছিল। ভিক্তর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, সকলের মুখেই একটা কৌতূহল দীপ্ত হইয়া উঠিল। বন্দীদের বন্ধন মুক্ত করিবার আদেশ দিয়া সে নিজেই ক্লারার বন্ধন-রজ্জু খুলিয়া দিল। কুমারী

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিল। সেনানায়ক তাহার বাহুখানি সামান্য একটু স্পর্শ না করিয়া পারিল না—সে তাহার কালো চুল ও ক্ষীণ কটি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। স্পেনীয় সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায় —ক্লারা তাহাই; তাহার গাত্রবর্ণও যেমন স্পেনীয় সুন্দরীদের মত, তেমনই তাহার চোখদুইটি কাকের পালকের চেয়ে কালো; সেই আঁখিতারার উপরে যে পক্ষ্মরাজি শোভা পাইতেছে তাহা যেমন দীর্ঘ, তেমনই কুটিল।

সেইরূপ বিষণ্ণ হাস্যে ক্লারা জিজ্ঞাসা করিল "কাজ কি সিদ্ধ হইয়াছে?" কুমারীসুলভ একটি মাধুরী তখনও সে হাসিতে লাগিয়া ছিল। ভিক্তর একটা অস্ফুট কাতরধ্বনি করিল। ভাই তিনটির মুখ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, একবার ক্লারার পানে চাহিয়াই পুনরায় সে সেই তিনটি স্পেনীয় তরুণের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রথমটি, পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান: বয়স ত্রিশবৎসর হইবে; খর্ব্বাকৃতি, গঠন ভাল নহে। দেখিতে উদ্ধত ও দাম্ভিক হইলেও, তাহার চেহারার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। দেখিলে মনে হয়, প্রাচীন স্পেনীয় বীরগণ যে সুকুমার হৃদয়বৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এই যুবারও তাহা আছে। এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম···জুয়ানিতো। দ্বিতীয় পুত্র ফেলিপের বয়স বিশ বৎসর হইবে; সে ছিল দেখিতে অনেকটা তাহার ভগিনী ক্লারার মত। সর্ব্ব-কনিষ্ঠের বয়স মাত্র আট বৎসর। কোনও চিত্রশিল্পী, মানুয়েলের মুখাবয়বে সেই রোমান-সুলভ দৃঢ়তার চিহ্ন দেখিতে পাইত -চিত্রকর দাভিদ-অঙ্কিত চিত্রে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই যে ছবিগুলি রোমের প্রজাতন্ত্র-যুগের নর-নারী দেখাইবার জন্য তিনি আঁকিয়াছিলেন। আর, শুভ্রকেশ মাকু'ইসকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন মুরিলোর আঁকা একখানি চিত্রপট হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। এই সব দেখিয়া, ভিক্তর দারুণ হতাশার ভাবে একবার উর্দ্ধমুখে চাহিল—ইহাদের একজনও নাকি সেনাপতির প্রস্তাবে সম্মত হইবে! যাহা হউক, কোনরূপে সাহস সঞ্চয় করিয়া সে কথাটা ক্লারার নিকটে পাড়িল—শুনিবামাত্র তরুণীর সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মসম্বরণ করিল এবং উঠিয়া পিতার নিকটে গেল; তাঁহার পদতলে বসিয়া বলিল—

"বাবা, জুয়ানিতোকে শপথ করিতে বলুন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, সে যেন তাহা পালন করে; তবেই আমাদের আর কোন দুঃখ থাকিবেনা।"

মার্কুইস-পত্নীর হৃদয় আশায়-আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, তিনি স্বামীর দিকে একটু ঝুঁকিয়া যেমনই সেই বীভৎস-ভীষণ গুপ্ত-কথাটি শুনিতে পাইলেন সেই মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইলেন। জুয়ানিতো এতক্ষণে সব বুঝিতে পারিল, সে আসন ছাড়িয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত লাফাইয়া উঠিল। ভিক্তর এইবার মার্কুইসের নিকট হইতে পূর্ণবিশ্বস্ততা-স্বীকারের প্রতিশ্রুতি লইয়া সৈন্যগুলাকে নিজের দায়িত্বে, বিদায় করিয়া দিল। ভৃত্যগুলাকে বাহিরে লইয়া গিয়া—ফাঁসি-কাষ্ঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। যখন গৃহমধ্যে ভিক্তর ছাড়া আর কেহ রহিল না, তখন মার্কুইস আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডাকিলেন—"জুয়ানিতো!"

সে কোন উত্তর না দিয়া এমন ভাবে মাথাটা অবনত করিল যে, তাহাতেই বুঝা গেল, সে ঐ আদেশ পালন করিবে না; তারপর সে বসিয়া পড়িল এবং অশ্রুহীন চোখে জনক ও জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি অসহ্য! তখন ক্লারা নিকটে গিয়া তাহার জানুর উপরে বসিল, বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া চোখের পাতার উপরে চুমা খাইল, তার পর প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল—

> "জুয়ানিতো! লক্ষ্মী ভাই আমার! তোমার হাতে মরণ, সে যে কত সুখের তাহা যদি বুঝিতে! ঐ ফাঁসী-দেওয়া লোকটার জঘন্য হাত আমার দেহ স্পর্শ করিবে, সে যে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না! তুমি ত' এই সব দুর্গতি হইতে তোমার বোনকে রক্ষা করিবে?—ভাইটি আমার! কত ভালবাস আমায় তুমি! আর কোন লোক যদি আমাকে লইয়া যায়, তুমি কি তাহা সহ্য করিবে?—তবে?"

এই বলিয়া কুমারী তরুণী তাহার সেই কোমল কাজল-চোখে ভিক্তরের দিকে একটা জ্বলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—জুয়ানিতোর অন্তরে তাহার সেই ফরাসী-বিদ্বেষ সে যেন ভাল করিয়া জাগাইয়া দিতে চায়।

ছোট ভাই ফেলিপ বলিল, "ভাই, বুক বাঁধো! নহিলে এত বড় বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না যে!"

হঠাৎ ক্লারা উঠিয়া পড়িল; যাহারা জুয়ানিতোকে ঘেরিয়াছিল, তাহারা সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। এইবার যে-পুত্র এ-হেন কারণে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে পিতার মুখামুখি হইল।

গম্ভীরকণ্ঠে মার্কুইস বলিলেন, "জুয়ানিতো! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি।"

তরুণ কাউণ্টের দিক হইতে কোন সাড়াই মিলিল না। তখন পিতা পুত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ক্লারা, মানুয়েল ও ফেলিপ যেন মন্ত্রচালিতের মত, তাহাদের পিতার দেখাদেখি সেইরূপ করিল। সেই-যে বংশধর তাহাদের বংশকে মহাবিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিবে—সকলে একসঙ্গে, যেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে তাহার প্রতি কর-প্রসারণ করিল; এ যেন তাহাদের পিতারই আকুল প্রার্থনার প্রতিধ্বনি।

"পুত্র, তুমি কি তোমার জাতির ধর্ম্ম হারাইয়াছ?—সেই মনোবল এবং প্রাণের সেই সত্যকার দরদ কই? আমি কি এমনই করিয়া তোমার সম্মুখে জানু পাতিয়া থাকিব?"—পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গৃহিণী, এ কি আমার পুত্র!"

জননী মর্ম্মান্তিক যাতনা দমন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"ও তোমার কথা রাখিবে বই কি।" এই সময়ে জুয়ানিতোর ভ্রূ দুইটা যে হঠাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাহার অর্থ তাহার মা-ই বুঝিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়া কন্যা মারিকিতা দুই বাহুতে তাহার মাকে জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার চোখ দুইটি হইতে তপ্ত অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালক-দাদা মানুয়েল তাহাকে ভর্ৎসনা করিল। এই সময়ে ঐ বাড়ীর ধর্ম্মযাজক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া জুয়ানিতোর নিকটে লইয়া গেল। ভিক্তর বুঝিল, এ দৃশ্য সে আর সহিতে পারিবে না। ক্লারাকে একটা ইঙ্গিত করিয়া, আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য সে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল; বাহিরের সেই বারান্দায় আসিয়া দেখিল, সেনাপতি তখন খুব সহজ অবস্থায় নাই; তখনও তাঁহার অনুচরগণ ভোজনের আসন ত্যাগ করে নাই, সকলে মদ্যপান করিতেছিল। সুরার প্রসাদে তাহাদের কথাবার্ত্তায় আর কোনরূপ সংযম ছিল না।

(৪)

প্রায় আরও এক ঘণ্টা পরে মেন্দার শতাধিক সম্ভ্রান্ত নাগরিক, লেগানেস্-পরিবারের প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য, প্রাসাদসংলগ্ন সেই উচ্চভূমিতে আহূত হইল।

তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার পড়িয়াছিল একজন সৈনিকের উপর। সে তাহাদিগকে এমন স্থানে দাঁড় করাইয়া দিল, যেখানে ফাঁসীকাঠে দোদুল্যমান শবদেহগুলার পা প্রায় মাথার উপরে আসিয়া পড়ে। সেই স্থান হইতে প্রায় ত্রিশ হাত দূরে যূপকাষ্ঠ স্থাপন করা হইয়াছে,—ঠিক উপরেই শাণিত খড়্গখানি ঝকমক করিতেছিল। পাছে শেষ মুহূর্ত্তে জুয়ানিতো বাঁকিয়া বসে, সেইজন্য একজন জল্লাদও হাজির আছে।

চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল; কিন্তু শীঘ্রই অগণিত পদশব্দ—সান্ত্রী-সৈন্যের তালে-তালে পদক্ষেপ ও অস্ত্রের ঝঞ্চনা—সেই নীরবতা ভঙ্গ করিল। তাহার সহিত অন্যরূপ শব্দও ছিল; তখনও সামরিক কর্ম্মচারীগণ ভোজনশালায় বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উচ্চকণ্ঠের হাস্যালাপ শোনা যাইতেছিল—ঠিক যেমন পূর্ব্বরাত্রে, নৃত্যশালার গীতবাদ্য ও নৃত্যকারীর পদশব্দে সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সকল আওয়াজ চাপা পড়িয়াছিল।

সকলেই দুর্গ-প্রাসাদের দিকে তাকাইল, দেখিল—সেই মহামান্য পরিবারের প্রত্যেকে, আশ্চর্য্য ধীরভাবে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। সকলেরই ললাট স্থির, প্রশান্ত। কেবল একজন, অতিশয় বিবর্ণমুখে অবসন্ন দেহে পুরোহিতের বাহুতে ভর করিয়া আছে। পুরোহিত তাহার কর্ণে ধর্ম্মের যতকিছু সান্ত্বনা বাণী আছে, তাহাই শুনাইতেছিলেন; তাহার দণ্ড যে মৃত্যুদণ্ডের অধিক—সে যে জীবন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে! তখন অপর সকলের মত, জল্লাদও বুঝিতে পারিল, এই একটা দিনের জন্য তাহার কাজ জুয়ানিতো করিতে রাজি হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কুইস, তাঁহার পত্নী, ক্লারা ও মারিকিতা এবং তাহাদের ছোট ভাই দুইটি সেই দারুণ বধ্যস্থল হইতে কিছুদূরে জানু পাতিয়া বসিলেন। পুরোহিত জুয়ানিতোকে ধরিয়া সেই স্থানে লইয়া গেলেন। সে যখন যূপকাষ্ঠের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন জল্লাদ তাহার আস্তিন টানিয়া, অন্যদিকে ফিরাইয়া কি বলিল—বোধ হয় কাজটা বুঝাইয়া দিল। অতঃপর ধর্ম্মযাজক সকলকে এমনভাবে সাজাইয়া লইলেন যাহাতে শিরশ্ছেদ-কার্য্য কাহারও চোখে না পড়ে। কিন্তু তাহারা যে জাতিতে স্পেনীয়, তাই সকলেই নির্ভীকভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্লারাই সকলের আগে দ্রুতপদে তাহার ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; ভাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"জুয়ানিতো, আমার যে ভাই সাহস বড় কম! আমাকে দয়া কর— আমাকেই আগে নাও!"

এই সময়ে কে যেন ভয়ানক বেগে ছুটিয়া আসিতেছে শোনা গেল, উচ্চভূমির সেই প্রাচীর-বেষ্টনীতে তাহার পদশব্দের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—পরমুহূর্তে সেই স্থানে ভিক্তর দেখা দিল। ক্লারা তখন যূপ-ভূমির উপরে তাহার মাথা পাতিয়া দিয়াছে, যেন তাহার সুগৌর গ্রীবা খড়্গখানাকে দ্রুত-আঘাতের জন্য মিনতি করিতেছে।

তাহা দেখিয়া সেনানায়কের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, কোনক্রমে বলসঞ্চয় করিয়া সে ছুটিয়া গিয়া ক্লারার পাশে দাঁড়াইল।

অতি মৃদু কম্পিত কণ্ঠে সে ক্লারাকে বলিল, "সেনাপতি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিবেন, যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হও।"

স্পেনীয় যুবতী কেবল একবার মাত্র তাহার পানে চাহিল, সে-চাহনিতে যেমন দর্প তেমনি গভীর ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। তারপর গভীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "জুয়ানিতো, আর কেন?"

তৎক্ষণাৎ মাথাটা খসিয়া জুয়ানিতোর পায়ের দিকে গড়াইয়া পড়িল। 'মার্কেসা দ্য লেগাক্রো'র (মার্কুইস-পত্নীর) দেহ একটা প্রবল কম্পনে আলোড়িত হইয়া গেল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না, কিন্তু যাতনার কোন চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

বালক মানুয়েল তাহার ভাইকে বলিল—

"এইখানে বসি, দাদামনি? কেমন, ঠিক হইয়াছে ত'?"

ছোট বোন মারিকিতা যখন আসিল, তাহাকে দেখিয়া জুয়ানিতো বলিয়া উঠিল—

"এই বুঝি মারিকিতা! তুই যে কাঁদিতেছিস্?"

"হ্যাঁ, ভাই,—আমি যে তোমার কথা ভাবিতেছি, আমরা সবাই চলিয়া গেলে তোমার কি দশা হইবে!"

ইহার পর দীর্ঘদেহ মার্কুইস নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার সেই যূপকাষ্ঠের দিকে তাকাইলেন, তাঁহারই সন্তানগণের রক্তে সেখানটা

ভাসিয়া গিয়াছে। তারপর চক্ষু ফিরাইয়া তিনি সেই নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অতঃপর জুয়ানিতোর দিকে তাঁহার দুই কর প্রসারিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

"স্পেনবাসীগণ, তোমরা শোন! আমি পিতা—আমার পুত্রকে আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এইবার, তুমি নূতন মার্কুইস! নিঃসঙ্কোচে খড়্গাঘাত কর—তুমি নিষ্পাপ!"

কিন্তু যখন ধর্ম্মযাজকের বাহুতে ভর করিয়া তাঁহার জননী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন জুয়ানিতো এমন হৃদয়-বিদারক স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"এ যে আমার মা! আমি যে ঐ বুকের স্তন্য পান করিয়াছি!"—যে, তাহার সেই চীৎকার শুনিয়া জনতার মধ্যেও একটা ভয়বিহ্বল হা-হা-ধ্বনি উত্থিত হইল, সেই আর্ত্তনাদে অদূর ভোজনশালার, পানোন্মত্ত সামরিকগণের হাস্যরব সহসা থামিয়া গেল। মার্কুইস-পত্নী বুঝিতে পারিলেন, জুয়ানিতোর শক্তি ফুরাইয়াছে, সে আর পারিবে না। তাই দেখিয়া তিনি নিমিষে নিকটস্থ প্রাচীর-বেষ্টনীর উপর উঠিয়া নিম্নে ঝাঁপ দিলেন, তাঁহার দেহ পাহাড়ের তলদেশে আছাড়িয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকগণ প্রশংসাধ্বনি করিল, জুয়ানিতো সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

একজন পদস্থ সেনানায়ক—তাহার তখন প্রায় মত্ত অবস্থা—জেনারেলকে বলিল, "ভিক্তর মার্শাঁ আমাকে এই প্রাণদণ্ডের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলিতেছিল—কিন্তু আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, ইহা আপনার হুকুমে হয় নাই।"

শুনিয়া সেনাপতি 'জি ' একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর মাস-খানেকের মধ্যে ফ্রান্সে প্রায় পাঁচশত পরিবারে কান্নার রোল উঠিবে—সে খবর রাখেন আপনি? আপনি কি চান যে, আমরা এইখানে আমাদের হাড় কয়খানি মাত্র রাখিয়া যাই?"

এই বক্তৃতার পরে ভোজনশালায় আর কোন ব্যক্তি—এমন কি নিম্নতম কর্ম্মচারীও—তাহার পানপাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না।

বিচার

কর্সিকার পোর্টো-ভেট্‌চো বন্দর থেকে বেরিয়ে যদি উত্তর-পশ্চিম মুখে বরাবর ভিতর দিকে যাও, তা হ'লে মনে হবে, জমিটা হঠাৎ উঁচু হতে আরম্ভ করেছে ; বড়-বড় পাথরের ঢিপি আর গভীর 'খদ' পার হ'য়ে, প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে' আঁকাবাঁকা পথ হেঁটে যেখানে এসে পৌঁছবে, সেখান থেকে একরকম জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে—দেশী ভাষায় তাকে 'মাকী' বলে। যারা ভেড়া চরিয়ে দিন গুজরান করে তারাই এখানে এসে বাস করে, আবার যারা ফেরারী আসামী তাদেরও আড্ডা এইখানে। এরকম জঙ্গল হওয়ার একটু কারণ আছে। ও-দেশের চাষারা বনে আগুন লাগিয়ে জমিতে সার দেয়। ফসল কেটে নেওয়ার পর যে-সব গাছের শিকড় মাটিতে থেকে যায়, অথচ মরে না, সেইগুলো থেকে পরের বছর মোটা-মোটা ডাল গজিয়ে কিছু কালের মধ্যেই সাত-আট ফুট উঁচু হয়ে ওঠে। এই রকমের ঝোপ-জঙ্গলকেই 'মাকী' বলে। হরেক রকমের গাছ, গুল্মলতা এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে' এমন ঘন হয়ে ওঠে যে, একখানা দা' হাতে না করে' কেউ এর ভিতর পা বাড়াতে পারে না ; জায়গায়-জায়গায় ঝোপ এত বেশি যে, বুনো ছাগলও তার ভিতর ঢুকতে পারে না।

যারা মানুষ খুন করে তারাও এই 'মাকী'তে এসে বাস করে ; একটা ভালো বন্দুক, কিছু বারুদ আর গুলি থাক্‌লেই হ'ল, আর তার সঙ্গে চাই একটা লম্বা আংরাখা, আর মাথায় দেবার কাপড়—তা'তে পেতে শোওয়া আর গায়ে ঢাকা-দেওয়া, দুই কাজই চলে। যারা ভেড়া চরায় সেই সব রাখালেরা দুধ, পনির আর চেস্‌নাট ফল দিয়ে যায়। এখানে আইনের ভয়

নেই, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনও এত দূর যাওয়া করতে পারে না। কেবল, যখন গুলি-বারুদের পুঁজি ফুরিয়ে যায়, তখন শহরে যেতে হ'লে একটু বিপদের ভয় আছে।

আমি যখন কর্সিকায় ছিলাম, তখন মাতেও ফাল্কোনে বলে' একটি লোক এই 'মাকী' থেকে মাইল-দেড়েক দূরে বাস করত। ও অঞ্চলের মধ্যে লোকটার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল বলতে হবে, কারণ তার খেটে খেতে হত না। বিস্তর ভেড়া ছিল, সেইগুলোকে একরকম বেদে-জাতের রাখাল দিয়ে পাহাড়ের এখানে-সেখানে চরিয়ে—তাইতে লোকটার বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত। যে ঘটনাটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার প্রায় দু'বছর পরে লোকটাকে দেখি,—তখন তার বয়েস বড় জোর পঞ্চাশ; বেশ বেঁটে-খাটো জোয়ান চেহারা; চুলগুলি ঘন আর মিশ্-কালো; চোখ যেমন বড়, দৃষ্টিও তেমনি তীক্ষ্ণ; গায়ের রং জুতোর চামড়ার মত কটা। যে দেশে পাকা শিকারীর অভাব নেই সে দেশেও এই লোকটার বন্দুক-শিক্ষা একটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার ছিল। সে কখনও ছর্‌রা দিয়ে বুনো ছাগল শিকার কর্‌ত না—একশো কুড়ি হাত দূর থেকে জানোয়ারটার মাথায় বা কাঁধে, যেখানে খুসী গুলি বসিয়ে দিয়ে তাকে পেড়ে ফেল্‌ত। আবার তার বন্দুক দিনে-রাতে সমান চল্‌ত। যাঁরা কখনো কর্সিকায় যাননি, তাঁরা তার ওস্তাদীর এই প্রমাণ বিশ্বাস কর্‌বেন না,— প্রায় আশি হাত তফাতে একখানা প্লেটের সমান এক টুকরো গোল কাগজ আট্‌কে রেখে তার পিছনে একটা বাতি জ্বালা হ'ল; তারপর, মাতেও লক্ষ্য ঠিক কর্‌লে পর বাতিটা নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। মিনিটখানেক পরে সেই ঘোর অন্ধকারে সে গুলি ছুড়বে—যদি চার বার ছোড়ে, অন্ততঃ তিনবার সে সেই কাগজটাকে ফুটো কর্‌বে।

এহেন ক্ষমতা যার, তার পশার প্রতিপত্তি একটু বেশি হবারই কথা। লোকে বল্‌ত, মাতেও বন্ধুর পক্ষে যেমন ভালো, শত্রুর পক্ষে তেমনি যম। সে লোকের উপকার করত যেমন, তেমনই তার হাত ছিল দরাজ; পোর্টো-ভেক্টোর আশ-পাশের সকলের সঙ্গে সে নির্ব্বিবাদে বাস কর্‌ত। তার কেবল একটা দুর্নাম ছিল। যে গাঁয়ে সে বিয়ে করেছিল সেখানে এক দুর্দ্দান্ত লোক তার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই লোকটাকে সে নাকি জোর করে সরিয়ে দিয়ে নিজের পথ খোলসা করে। লোকের বিশ্বাস, সেই প্রতিপক্ষটি একদিন একখান আয়না নিয়ে জান্‌লায় ব'সে যখন ক্ষৌরী করছিল, তখন

হঠাৎ কোথা থেকে একটা যে গুলি এসে তাকে লাগে—সে নাকি মাতেওর কাজ। ব্যাপারটা যখন চাপা পড়ে' গেল, তখন মাতেও বিয়েটা সেরে ফেল্‌লে। তার স্ত্রী জিসেপা প্রথমে পর পর তিনটি মেয়ে প্রসব করায় সে ভারী চটে' গিয়েছিল; তার পর যখন শেষে একটি ছেলে হ'ল, তখন মহা-খুসী হয়ে তার নাম রাখ্‌লে, 'ফর্চুনাতো'—সে হ'ল তার বংশের বাতি, সে যে তার বাপ-দাদার নাম বজায় রাখবে। মেয়েগুলির বিয়ে সে ভালোই দিয়েছিল—বিপদে আপদে জামাইদের ছোরা-বন্দুকের সাহায্য পাওয়াটা নিশ্চিত। ছেলেটির বয়েস তখন দশ, কিন্তু এর মধ্যেই সে বেশ চালাক চতুর হ'য়ে উঠেছে।

তখন শরৎকাল। সেদিন মাতেও খুব সকাল সকাল স্ত্রীকে সঙ্গে করে', জঙ্গলের মাঝে মাঝে যে সব ফাঁকা জমি আছে, তারি একটাতে ভেড়ার তদারক কর্‌তে বেরিয়ে গেল। ফর্চুনাতো সঙ্গে যাবার জন্যে আবদার করেছিল, কিন্তু সে মাঠটা নাকি একটু বেশি দূর, তাছাড়া, বাড়ীতেও একজনের থাকা দরকার, তাই বাপ রাজী হয়নি। এই রাজী না-হওয়াটা যে কতখানি আফশোসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা একটু পরেই বোঝা যাবে।

মাতেও তখন ঘণ্টা-কতক হবে বেরিয়ে গেছে। ফর্চুনাতো বাইরে রোদ্দুরে চুপচাপ চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছে—এই রবিবারে, তার যে কাকা কর্পোরাল, তাঁর বাড়ী বেড়াতে যাবে। এমন সময় হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনে তার ভাবনা ঘুরে গেল। ঝাঁ করে' দাঁড়িয়ে উঠে, মাঠের যেদিকটা থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটা কতক আওয়াজ হ'ল—ঠিক পর পর না হ'লেও সেগুলো যেন ক্রমশঃ আরও কাছে শোনা যেতে লাগ্‌ল। শেষকালে, মাঠ থেকে তাদের বাড়ীর দিকে আস্‌বার যে রাস্তা, তার উপর একটা মানুষের মূর্ত্তি দেখা গেল। পাহাড়ীরা যেরকম টুপী পরে, তার মাথায় সেই রকম চুড়ো-ওলা টুপী, দাড়ী আছে, কাপড়-চোপড় বেজায় ছেঁড়া; লোকটা বন্দুকের উপর ভর করে' অতি কষ্টে এগিয়ে আস্‌ছে, তার উরুতে এইমাত্র একটা গুলি ঢুকেছে।

লোকটা একজন ফেরারী। রাত্রে শহরে গিয়েছিল বারুদ আন্‌তে, পথে একদল সরকারী পাহারা-সৈন্যের ঘাঁটির সাম্‌নে পড়ে গিয়েছিল। রীতিমত

লড়াই করে' তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা বরাবর পিছু নিয়েছে; তাই গুলি চালাতে চালাতে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে পড়ে' এতখানি পথ এসেছে। এখন তারাও খুব কাছে এসে পড়েছে, আর এদিকে বেচারীর পা'ও জখম হয়ে গেছে, তাই ধরা পড়বার আগে 'মাকী'তে পৌছনো এখন অসম্ভব।

সে ফচু́নাতোকে দেখে তার কাছে এসে বল্লে, "তুমি মাত্তেও ফালকোনের ছেলে না ?"

"হ্যাঁ"

"আমার নাম জানেত্তো সান্ পিয়েরো। আমায় শিগ্‌গির কোনখানে লুকিয়ে ফ্যালো--পাহারা-সৈন্য আমায় তাড়া করেছে, আমার আর একটুও চল্‌বার ক্ষমতা নেই।"

"বাবাকে জিজ্ঞেস না করে' ত কিছু কর্‌তে পারিনে।"

"তোমার বাবা তাতে রাগ কর্‌বে না, বরং বলবে—তুমি ঠিকই করেছ।"

"তা বলা যায় না।"

"শিগ্‌গির লুকিয়ে ফ্যালো---ওরা এল বলে' !"

"একটু দাঁড়াও না, বাবা আগে আসুক।"

"দাঁড়াব কি! কচুপোড়া খেলে যা!-- ওরা যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে! শিগ্‌গির লুকো' আমাকে, নইলে খুন করব।"

ফচু́নাতো বেশ ধীর নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে—

"তোমার বন্দুক ত' ঠাসা নেই, থলিতেও একটা টোটা দেখছিনে।"

"তুমি ত বাপু মাত্তেও ফাল্‌কোনের ছেলে নও! বাড়ীর দরজা থেকে আমায় ধরিয়ে দেবে ?"

কথাগুলো শুনে ছেলেটার প্রাণে যেন একটু লাগল, তাই এগিয়ে গিয়ে বল্লে, "আচ্ছা, তোমায় যদি লুকিয়ে রাখি ত কি দেবে বল ?"

তখন লোকটা তার কোমরে যে চামড়ার গেঁজেটা ঝুল্‌ছিল তার ভিতর হাত চালিয়ে দিলে, দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে একটি পাঁচ-ফ্রাঙ্ক টাকা বের

কর্‌লে—সেটা বোধ হয় তার বারুদ কেন্‌বার টাকা। তাই দেখে ফর্চুনাতোর মুখখানা হাসি-হাসি হয়ে উঠল। সে খপ্‌ করে টাকাটা জানেত্তোর হাত থেকে নিয়ে বল্‌লে—"কিছু ভয় নেই তোমার।"

তখনি বাড়ীর পাশে যে খড়ের গাদাটা ছিল তার মধ্যে একটা মস্ত গর্ত্ত করে ফেল্‌লে। জানেত্তো তার ভিতর আসন-পীড়ি হ'য়ে বস্‌ল। ছেলেটা তাকে এমন করে' ঢেকে দিলে, যাতে নিশ্বাস নেওয়ার একটু পথ থাকে, অথচ বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় না, যে একটা মানুষ তার ভিতর লুকিয়ে আছে। এই সঙ্গে তার মাথায় একটা পাকা রকমের দুষ্টবুদ্ধি যোগাল—সে একটা বাচ্ছাসমেত ধাড়ী-বেড়াল নিয়ে এসে খড়ের উপর চাপিয়ে দিলে, দেখলেই মনে হবে, খড়গুলো অন্ততঃ কিছুকাল নাড়াচাড়া করা হয়-নি। তার পর বাড়ীর কানাচে, পথের উপর যে সব রক্তের দাগ ছিল, তার উপর বেশ করে' ধূলো ছড়িয়ে দিয়ে—সে আগে যেমন করে' শুয়েছিল—তেমনি রোদ্দুরে হাত-পা ছড়িয়ে চুপচাপ শুয়ে রইল।

মিনিট কতক পরেই, হল্‌দে-কুর্ত্তি-পরা দু'জন সৈনিক আর তাদের সঙ্গে একজন হাবিলদার মাত্তেওর বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল। এই কর্ম্মচারীটির সঙ্গে মাত্তেওর কি একটা দূর-সম্পর্ক ছিল। সকলেই জানেন, কর্সিকায় আত্মীয়-সম্পর্কের জের যতদূর টেনে চলে, এমন আর কোথাও নয়। লোকটার নাম তিয়োদোরো গাম্বা; খুব কাজের লোক, ডাকাতরা তাকে ভারী ভয় করে—সে তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে।

ফর্চুনাতোকে দেখেই সে বলে' উঠল, "কি ভাগ্যে, ভালো ত?—আরে, এরি মধ্যে বেশ বড়-সড় হ'য়ে পড়েছিস্ যে!—এখ্‌খুনি এখান দিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেছিস্?"

"কই মামু, তোমার মতন বড় এখনো হইনি ত?"

"হবি বৈকি, ক্রমেই হবি!—এখান দিয়ে একটা লোককে যেতে দেখেছিস্?"

"একটা লোককে যেতে দেখেছি?"

"হ্যাঁরে হ্যাঁ। তার মাথায় একটা চুড়ো-ওলা টুপী, গায়ে লাল আর হলদে রঙের ফতুয়া।"

"মাথায় চূড়ো-ওলা টুপী, গায়ে একটা লাল আর হলদে রঙের ফতুয়া?"

"ওরে হ্যাঁ!—বল্‌না শিগগির! কেবল আমার কথাগুলোই আওড়ায় ত্যাখো!"

"আজ সকালে আমাদের পাদ্রীমশাই এইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন বটে,—সেই যে তাঁর 'পিয়েরো' বলে' ঘোড়াটা? তারই উপর চড়ে'। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোর বাবা কেমন আছে রে? আমি বললাম··"

"নে নে, তোর ন্যাকামী এখন রাখ্! জানেত্তো কোন্‌দিকে গেল বল্ দিকি? আমরা তারই খোঁজে এসেছি—সে নিশ্চয় এই দিক দিয়ে গেছে।"

"তার আমি কি জানি?"

"তুই কি জানিস! তুই তাকে নিশ্চয় দেখেছিস্।"

"মজার লোক ত! লোকে ঘুমিয়ে থাকলে—রাস্তা দিয়ে কে কোথায় গেল তার খোঁজ রাখে বুঝি?"

"ওরে ছুঁচো! তুমি ঘুমুচ্ছিলে বটে? আমার বন্দুকের আওয়াজ শুনেও জেগে ওঠনি?"

"ওঃ! তাই বুঝি মায়্! তুমি মনে কর তোমার বন্দুকের বড্ড আওয়াজ? আমার বাবার বন্দুকের আওয়াজ কখনও শোননি বুঝি?"

"ব্যাটা কি বজ্জাত!—জানেত্তোকে তুই না দেখে থাকিস্ ত কি বলেছি! হয়ত তুইই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস্!—ভাই সব তোমরা এসো ত আমার সঙ্গে, একবার বাড়ীর ভিতরটা খুঁজে দেখা যাক—কোথাও আছে কি না। ব্যাটাও শেষটায় এক পায়ে হাঁটছিল—এমন অবস্থায় সে যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 'মাকী' পর্য্যন্ত যাবে, তেমন বোকা সে নয়। তা ছাড়া রক্তের দাগ ত এইখানে এসে শেষ হয়েছে।" ফচুনাতো এবার যেন খুব খুশী হয়ে বলে' উঠল, "আচ্ছা বেশ ত! বাবা এখন নেই—জোর করে' বাড়ীতে ঢোক' না দেখি। বাবা এসে যখন শুনবে, তখন?"

এবার গাম্বা তার কানটা ধরে' বল্‌লে, "শয়তান! জানিস্, এখুনি ইচ্ছে করলে তোর বোল ফিরিয়ে দিতে পারি? তলোয়ারের পিঠটা দিয়ে ঘা কতক দিলেই সত্যি কথা বল্‌বার পথ পাবিনে।"

তবুও ফর্চুনাতো মজা দেখবার জন্যে বলে উঠল,

"হুঁ, আমার বাবার নাম মাতেও ফাল্‌কোনে।"

"তবে রে উল্লুক!—জানিস্, তোকে এখ্‌খুনি চালান করে' দিতে পারি? জানেতো কোথায় আছে যদি না বলিস্, তা'হলে তোর পায়ে শিকল দিয়ে গারদে পূরে, খড়ের বিছানায় শুইয়ে রাখব, শেষে মাথাটি দেব উড়িয়ে।"

শাসনের এই ভঙ্গি দেখে ছেলেটা হো হো করে' হাস্‌তে লাগল, বল্‌লে—"আমার বাবার নাম মাতেও ফাল্‌কোনে।"

তখন সৈনিকদের মধ্যে একজন দলপতির কানে কানে বল্‌লে, "কাজ নেই কর্ত্তা, মিছিমিছি মাতেওর সঙ্গে ফ্যাসাদ বাধিয়ে।"

গাম্বা যে ভারী মুশকিলে পড়েছে তা কারু বুঝতে বাকী রইল না। এর মধ্যে লোকগুলো যখন বাড়ীর ভিতর থেকে ঘুরে এল, তখন সে তাদের নিয়ে চুপি চুপি পরামর্শ করতে লাগল। বাড়ীর ভিতরটা ঘুরে আস্‌তে বেশীক্ষণ লাগেনি, কারণ কর্সিকায় বাড়ী বল্‌তে কেবল একখানা বড় চারকোনা ঘর। আসবাবের মধ্যে একটা টেবিল, খানকতক বেঞ্চি, গোটা তিন-চার সিন্দুক, কিছু তৈজস-পত্র, আর শিকারের অস্ত্রশস্ত্র। ফর্চুনাতো তখন খড়ের গাদাটার পাশে দাঁড়িয়ে বেড়ালটার গা চাপড়াচ্ছিল,—মামু আর মামুর দলবলের এই দুর্গতি দেখে তার ভারী স্ফূর্ত্তি।

একজন সৈনিক খড়ের গাদাটার কাছে এসে দাঁড়াল, দেখলে তার উপর একটা বেড়াল রয়েছে, তবু খড়ের ভিতর বেয়োনেটের একটা খোঁচা দিয়ে—কাজটা যে কত অনাবশ্যক ও হাস্যকর তাই ভেবে—নিজেই বিরক্তি প্রকাশ করলে। ভিতরে কিছুই নড়ে' উঠল না, ছেলেটার মুখেরও একটু ভাবান্তর হ'ল না।

তখন সকলেই হতাশ হয়ে, যাত্রাটাই অশুভ বলে' দুঃখ করতে লাগল। সকলেই আবার মাঠের দিকে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় দলপতির মাথায় একটা ফন্দি জুটে গেল। ভয় দেখিয়ে ত কিছু হ'ল না, এখন আদর করে' আর লোভ দেখিয়ে যদি কিছু হয় তারি একটা শেষ চেষ্টা করা যাক না। তখন ফর্চুনাতোকে সে বল্‌লে

"বাপধন! তুমি ত একটি পাকা ঘুঘু হ'য়ে উঠেছ দেখছি—এর পর তুমি একটা সামান্য লোক হবে না। তবে আমার সঙ্গে এই যা করছ, এটা কিন্তু ভালো হচ্ছে না। মাতেও আমার কুটুম্ব, তাকে চটাবার ভয়ে কিছু করতে পারছিনে, নইলে, কোন্ শালা আজ তোমাকে এইখান থেকে পাক্‌ড়ে নিয়ে না যেত!"

"বা রে!"

"আচ্ছা, মাতেও ফিরে আসুক, তার পর দেখাচ্ছি তোমাকে। এই সব মিথ্যা কথা বলার দরুণ এমন চাবুক খাবি, যে পিঠে রক্ত ফুটে বেরুবে।"

"আমার কথা যদি শোন মাম, তবে এখানে বসে' বসে' সময় নষ্ট কোরো না, এই বেলা বেরিয়ে পড়; নইলে জানেতো যদি একবার মাকীতে গিয়ে পেঁছতে পারে, তখন আর তাকে খুঁজে বার করে' ধরা তোমার সাধ্যিতে কুলোবে না।"

তখন দলপতি পকেট থেকে একটা রূপোর ঘড়ি বার করলে, তার দাম খুব কম হলেও পঞ্চাশ টাকা। তাই দেখে ফর্চুনাতোর চোখ দুটো একটু ডাগর হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করে', সে তার চেনটা ধরে' দোলাতে দোলাতে বল্‌লে—

"কি বলিস্ রে ছোঁড়া! এই রকম ঘড়ি একটা গলায় ঝুলিয়ে বেড়াতে কেমন লাগে? তা হ'লে, পোর্টো-ভেট্‌চোতে গিয়ে, রাস্তায়-রাস্তায়, মাথাটা উঁচু করে' বেড়াস্- না? লোকে জিজ্ঞেস করবে, 'কটা বেজেছে মশাই?' আর তুই অম্‌নি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌বি, 'দেখনা আমার ঘড়িতে'।"

"আমি যখন বড় হ'ব, আমার কাকা আমায় একটা ঘড়ি দেবে বলেছে।"

"বটে! তা তোর খুড়তুত ভাই ত এর মধ্যেই একটা ঘড়ি পেয়ে গেছে—এত ভালো ঘড়ি নয় যদিও, তবু তুই ত' এখনো পাস্‌নি! সে তোর চেয়ে কত ছোট!"

শুনে ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

"সে যা' হোক গে। এখন বল্ দিকিন, ঘড়িটা তোর বেশ পছন্দ হয় কি?"

*   *

বেড়ালকে একটা আস্ত মুর্‌গীর ছানার লোভ দেখালে, তার যে ভাবটা হয়, ফর্চুনাতোর ঠিক তাই হ'ল—সে কেবল আড়-চোখে ঘড়িটার পানে চাইতে লাগল। বেড়াল ঠাট্টা মনে করে' থাবা বাড়াতে ভরসা করে না, আবার পাছে লোভটা বেশী হয়ে পড়ে বলে' মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু ক্রমাগত জিভ দিয়ে মুখ চাটতে থাকে, আর যেন মনিবকে বল্‌তে থাকে—"এ কি রকম নিষ্ঠুর ঠাট্টা তোমার?"

কিন্তু এক্ষেত্রে দলপতি গাম্বা সত্যি-সত্যিই ঘড়িটা তাকে দিতে চাইছে। ফর্চুনাতো হাত বাড়ালে না বটে, তবু একবার বল্‌লে "ঠাট্টা কর কেন!"

"ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, ঠাট্টা নয়। শুধু, জানেত্তো কোথায় আছে বলে' দিলেই ঘড়িটা তোকে দিয়ে দেবো।"

ফর্চুনাতো তাই শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাস্‌লে! সে দলপতির চোখের ভিতর কি যেন বেশ করে' দেখে নিতে লাগল—অর্থাৎ তার কথায় যে বিশ্বাসের ভাব আছে, তার চোখেও তাই আছে কি না।

তখন দলপতি বলে' উঠ্‌ল,

"আমি যদি আমার কথা না রাখি, তা' হলে চাক্‌রিতে আমার যেন অধঃপতন হয়। এই সব আমার লোকেরাই সাক্ষী রইল, যা বলেছি তা' আর ঘুরিয়ে নেওয়ার যো নেই।" বল্‌তে বল্‌তে ঘড়িটা তার মুখের এত কাছে নিয়ে গেল যে, প্রায় তার গালে ঠেকবার মত হ'ল। তার গাল দু'খানা তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছেলেটার প্রাণে তখন, ধর্ম্ম আর লোভ—এই দু'য়ের লড়াই চলেছে। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে, গলার স্বরও যেন বন্ধ হয়ে' আসছে। এদিকে ঘড়িটা তার চোখের ঠিক উপরেই দুল্‌ছে, এক-এক বার ঘুরতে-ঘুরতে নাকের ডগায় এসে ঠেক্‌ছে। শেষকালে তার ডানহাতখানা একটু-একটু করে' ঘড়িটার দিকে উঠতে লাগল, তারপর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সেটা ছুঁয়ে রইল, ক্রমে

ঘড়িটার সব ভারটুকু তার হাতের উপর পড়্‌ল—তখনও দলপতি চেনটা ছেড়ে দেয়নি। ঘড়ির মুখটা নীল, ডালাটি সদ্য পালিশ-করা—রোদ্দুর লেগে দপ-দপ করে' জ্বলে উঠল। লোভ আর সামলানো গেল না!

ফর্চুনাতো তখনো খড়ের গাদায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এইবার শুধু বাঁ-হাতটা তুলে' বুড়ো-আঙুল দিয়ে পিঠের দিকে ইসারা কর্‌লে। দলপতি তথ্‌খুনি বুঝে নিলে—সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির চেনটাও ছেড়ে দিলে। এতক্ষণে ফর্চুনাতোর বিশ্বাস হ'ল ঘড়িটা তারই বটে। তড়াক করে' একটি লাফ দিয়ে সে খড়ের গাদাটা থেকে দশ হাত সরে' দাঁড়াল, কারণ সৈনিকরা এরই মধ্যে সেটাকে ভেঙ্গে ফেল্‌তে সুরু করেছে।

একটু পরেই খড়গুলো নড়তে লাগল, আর অমনি ভিতর থেকে একটা রক্তাক্ত-দেহ পুরুষ বেরিয়ে এল—তার হাতে একখানা ছোরা। উরুতের রক্ত জমাট হয়ে ঘা-টা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, তাই দাঁড়াতে গিয়ে সে পড়ে' গেল।

তখন দলপতি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' অস্ত্রখানা হাত মুচড়ে কেড়ে নিলে। খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি করা সত্ত্বেও তাকে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা হ'ল।

জানেত্তো যেন এক আঁটি কাঠের মত বাঁধা-অবস্থায় পড়ে আছে, এমন সময় ফর্চুনাতো তার কাছে এসে দাঁড়াতেই সে তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে, চেয়ে বল্‌লে—

"—র বাচ্ছা!" –কথাটায় রাগের চেয়ে ঘৃণাই ছিল বেশি। ছেলেটা তখন ভাবলে, টাকাটা আর রাখা ঠিক নয়, তাই সেটা ছুড়ে ফেলে' দিলে। লোকটা কিন্তু সেদিকে ফিরেও চাইলে না। সে তখন খুব সহজ গলায় দলপতিকে ডেকে বল্‌লে—

"ভাই গাম্বা, আমি ত' আর হাঁটতে পারব না, আমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।"

গাম্বা এখন বিজয়ী, তাই নির্দ্দয়—কথাটা শুনে সে বলে' উঠল—

"কেন?—এই একটু আগে ত বুনো-ছাগলের মত ছুটছিলে! আচ্ছা, তা হ'বে এখন, ভাবনা নেই। তোমাকে ধরে' আজ যে রকম আহ্লাদ

হয়েছে, তাতে নিজেই তোমাকে কাঁধে করে' দশ ক্রোশ পথ নিয়ে যেতে পারি, একটুও কষ্ট হবে না। আচ্ছা, ভায়া, তার আর কি? ডাল-পালা দিয়ে একখানা খাটুলি না হয় বানিয়ে নেওয়া যাবে, তারপর ক্রেস্পলিতে পৌঁছে একটা ঘোড়া নিলেই হবে।”

“সেই ভাল, আর দেখ—খাটুলিতে চারটি খড় বিছিয়ে দিও, তাতেও একটু আরাম পাব।”

সৈনিকেরা যখন নানান কাজে ব্যস্ত—কেউ জানেত্তোর পায়ের ঘা পরিষ্কার করে' বেঁধে দিচ্ছে, কেউ চেস্‌নাট গাছের ডাল কেটে খাটুলি বাঁধছে—সেই সময়, 'মাকী'তে যাবার যে পথ, তারি মোড়ের মাথায় হঠাৎ মাতেও আর তার স্ত্রীকে আসতে দেখা গেল। স্ত্রী আসছে আগে-আগে—একটা প্রকাণ্ড চেস্‌নাট ফলের বস্তা ঘাড়ে করে' সে ঝুঁকে পড়েছে; তার স্বামী বেশ সোজা হয়ে' গট্-গট্ করে' পিছন-পিছন আস্‌ছে—একটা বন্দুক তার হাতে, আর একটা পিঠের উপর ঝুলিয়েছে। সে বোধ হয় মনে করে যে, পুরুষ-মানুষের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া আর কোন রকম বোঝা বওয়া বড়ই লজ্জাকর।

দূর থেকে সৈন্যদের দেখে মাতেওর প্রথমটা মনে হ'ল, তাকেই বুঝি গ্রেপ্তার করতে এসেছে। কিন্তু ঐ রকম মনে হওয়ার কারণ কি? সে ত কোনো বে-আইনি কাজ করেনি। এ বিষয়ে তার বরং সুনামই আছে। কিন্তু লোকটা জাতে যে কর্সিকান! এই পাহাড়ী জাতটার মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যার মন হাতড়ালে একটা-না-একটা ছোরাছুরির ব্যাপার উঁকি দেয় না। অবিশ্যি আর পাঁচজনের তুলনায় মাতেওর মনটা অনেকটা সাঁচ্চা বৈকি, কারণ মানুষ-মারা কাজ সে এই দশ বছরে আর একটিও করেনি। তবু বলা যায় কি? যদিই ব্যাপারটা সেরকম কিছু দাঁড়ায়, তার জন্যে গোড়া থেকে একটু সাবধান হওয়ার দোষ কি? তাই জিসেপাকে ডেকে বল্‌লে—

“গিন্নী, থলেটা এখন নাবাও, নাবিয়ে তৈরী হ'য়ে নাও।”

স্ত্রী তখনি সে আদেশ পালন কর্‌লে। পাছে নিজের কোন অসুবিধে হয় বলে' সে তার কাঁধের বন্দুকটা স্ত্রীকে ধরতে বল্‌লে। তারপর যে-বন্দুকটা হাতে ছিল তার ঘোড়া তুলে, আস্তে-আস্তে গাছগুলোর আড়াল

দিয়ে বাড়ীর পানে এগুতে লাগল; এমন সতর্ক হয়ে রইল, যে শত্রুতার একটু আভাস পেলেই, যে-গাছটার গুঁড়ি সবচেয়ে মোটা তার আড়াল থেকে গুলি চালাতে থাকবে। স্ত্রী ঠিক পিছন-পিছন আস্‌তে লাগ্‌ল—তার হাতে বাড়তি বন্দুক আর টোটার বাক্স। সতী স্ত্রীর কাজই হচ্ছে—যুদ্ধের সময় স্বামীর বন্দুকে টোটা ভর্ত্তি করে' দেওয়া।

এদিকে মাতেওর এই ভাব দেখে দলপতির বড় ভাবনা হ'ল। সে ভাবতে লাগল—

"জানেত্তো যদি মাতেওর কোনোরকম জ্ঞাতি বা বন্ধু হয়, আর যদি সে তাকে রক্ষা করতে চায়, তাহ'লে ওই দুই বন্দুকের দুই গুলি আমাদের দলের দুটিকে এসে পৌঁছবে—একেবারে ডাকের চিঠির মতন। আর যদি কুটুম্বিতা অগ্রাহ্য করে, আমাকেই লক্ষ্য ক'রে—"

তখন এই বিপদে সে একটা অসম-সাহসের সঙ্কল্প করলে; নিজেই একা এগিয়ে গিয়ে মাতেওকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সব কথা খুলে বলাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে সেই অল্প পথটুকুও তখন ভয়ানক লম্বা বলে' বোধ হ'তে লাগল।

"আরে এই যে! শুনছ হে ভায়া! বলি, কেমন আছ, বন্ধু? আমি গাম্বা—তোমার কুটুম্ব হে!"

মাতেও কথা না ক'য়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যতক্ষণ এ লোকটা চেঁচাচ্ছিল, ততক্ষণ সে আস্তে-আস্তে বন্দুকের নলটা উঁচু করতে লাগল, শেষে যখন লোকটা কাছে এসে পৌঁছল, তখন নলটা আকাশ-মুখো হয়ে' গেছে।

দলপতি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে "ভালো ত?"

"হাঁ, ভালো।"

"এইখান দিয়েই যাচ্ছিলাম কি না, তাই ভাবলাম কুটুম্বুর সঙ্গে একবার অম্‌নি দেখাটা করে' যাই। আজ অনেকখানি পথ মার্চ্চ করে' এসেছি; তবে সে কষ্ট পুষিয়ে নিয়েছি—একটা খুব বড় দরের কাতলা ডাঙ্গায় তুলেছি আজ। এই একটু আগে জানেত্তো সান্‌-পিয়েরোকে পাক্‌ড়াও করেছি।"

শুনে জিসেপা বলে' উঠল, "বাঁচা গেল! আর হপ্তায় ওই হতভাগা আমাদের একটা দুধ-দেওয়া ছাগল চুরি করেছিল।"

এতক্ষণে গাম্বা যেন বাঁচল।

মাতেও বল্‌লে, "আহা বেচারী! নিশ্চয় পেটের জ্বালা ধরেছিল।"

দলপতি একটু থম্‌কে গিয়ে আবার বল্‌তে লাগল, "বেটা যা লড়াই করেছে!—যেন বাঘের মতন! কর্পোরাল সার্দোর একটা হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, তার উপর আমার একটা লোককেও খুন করেছে। তা ক্ষতি বিশেষ হয় নি, লোকটা ছিল জাতে ফরাসী। তারপর বেটা এম্‌নি লুকোন্ লুকিয়েছিল যে, কার বাবার সাধ্যি খুঁজে বের করে! ওই আমার বাচ্ছা ভাগ্নেটি যদি না থাক্‌ত তা হ'লে সব পণ্ড হয়ে গিয়েছিল আর কি?"

মাতেও বল্‌লে, "কে? ফচুনাতো!"

জিসেপাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ফচুর্নাতো!"

"হাঁ, জানেত্তো ওই খড়ের গাদায় লুকিয়েছিল, ভাগ্নেই ত চালাকিটা ধরিয়ে দিলে। ওর সেই কর্পোরাল কাকাকে খবরটা দেবো অখন, তিনি ওকে একটা ভালো উপহার পাঠিয়ে দেবেন। আমিও বড়-দারোগাকে যে রিপোর্ট পাঠাব, তাতে তোমার নাম আর তোমার ছেলের নাম দিয়ে দেবো।"

শুনে মাতেও চাপা গলায় ব'লে উঠল, "চুলোয় যাক্!"

এতক্ষণে তারা সৈন্যদের কাছে এসে পৌঁছল। জানেত্তোকে খাটুলির উপর শুইয়ে দিয়ে তারা তখন যাত্রার আয়োজন করছে। জানেত্তো গাম্বার সঙ্গে মাতেওকে দেখে একটা অদ্ভুত হাসি হাস্‌লে, তারপর বাড়ীর দরজার দিকে মুখ করে' চৌকাঠের উপর থুতু ফেলে বলে' উঠল—

"বেইমানের বাড়ী!"

যার মরণের ভয় নেই, সেই কেবল এমন কথা মাতেওকে বল্‌তে পারে; ছোরার একটি খোঁচায় এ অপমানের শোধ হ'য়ে যেত, দ্বিতীয়বার ছোরা তুল্‌তে হ'ত না। কিন্তু মাতেও তাই শুনে'—ভয়ানক আঘাত পেলে

লোকে যেমন করে—তেম্‌নি করে’ নিজের কপালটা হাত দিয়ে টিপে’ ধর্‌লে।

বাপকে আস্‌তে দেখেই ফর্চুনাতো বাড়ীর ভিতর চলে’ গিয়েছিল, এখন একবাটি দুধ নিয়ে সে ফিরে’ এল, এসে ঘাড় হেঁট করে’ বাটিটা জ্যানেত্তোর মুখের সাম্‌নে ধরলে।

“নিয়ে যা’ তোর দুধ!”—বলে’ জ্যানেত্তো, ভয়ানক চীৎকার করে’ উঠল; পরে একজন সৈনিককে ডেকে বল্‌লে—

“একটু জল খাওয়াও না ভাই!”

—বল্‌তেই সৈনিক নিজের বোতলটি তার হাতে দিলে। একটু আগে যাদের সঙ্গে গুলি চল্‌ছিল, তাদেরই একজনের দেওয়া জল সে অসঙ্কোচে পান কর্‌লে, তারপর সে এই অনুরোধ জানালে যে, হাতদুটো পিঠমোড়া করে’ না বেঁধে যেন বুকের উপর আড়াআড়ি করে বেঁধে দেওয়া হয়—বল্‌লে, “একটু স্বচ্ছন্দ হয়ে থাক্‌তে চাই।”

লোকটাকে যতটা খুশী করা যায় তা করতে তারা কুণ্ঠিত হ’ল না। তারপর দলপতি সবাইকে যাত্রা কর্‌তে বলে’ মাতেওকে বিদায়-অভিবাদন কর্‌লে, মাতেও কথাটি কইলে না,—তারাও চট্‌পট্‌ মাঠের পথ ধরে’ বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় দশমিনিট মাতেও নির্ব্বাক হয়ে’ রইল। কেবল বন্দুকের উপর ভর দিয়ে সে ছেলের পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—সে চাউনিতে একটা ভীষণ ক্রোধ যেন জমাট হয়ে’ উঠেছে! ছেলেটা, একবার বাপের পানে তাকায়, আবার মার পানে চেয়ে থাকে—সে যেন ছটফট করতে লাগল।

কতক্ষণ পরে মাতেও বলে’ উঠল—

“এই বয়েস থেকেই বেশ আরম্ভ করেছিস তুই!”

“বাবা!” বলে’ কাঁদ-কাঁদ হয়ে ছেলেটা যেই বাপের দিকে এগিয়ে পা দুটো জড়িয়ে ধরতে যাবে, অমনি মাতেও গর্জ্জে’ উঠল—

“দূর হ আমার সাম্‌নে থেকে!”

ছেলেটা থম্‌কে গেল; বাপের কাছ থেকে দু'চার পা তফাতে নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এইবার জিসেপা ছেলের কাছে এগিয়ে এল, সে ঘড়ির চেনটা দেখতে পেয়েছিল—তার একদিকটা ফর্চুনাতোর শার্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। খুব কঠিনস্বরে মা জিজ্ঞেস করলে—

"এ ঘড়ি তোকে কে দিলে?"

"আমার মামু—ওই পাহারাওয়ালার সর্দ্দার।"

ফাল্‌কোনে ঘড়িটা কেড়ে নিয়ে একটা পাথরের উপর এমন জোরে আছাড় দিলে, যে সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে' গেল। তারপর স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লে—

"ঠিক করে' বল—এ ছেলে কি আমার?"

জিসেপার মেটে-রঙের গাল দু'খানা ইঁটের মত লাল হয়ে' উঠল।

"কি বল্‌ছ মাতেও? কার সঙ্গে কথা কইছ, সে হুঁস নেই?"

"ওঃ! তা' হলে এই হ'ল আমার বংশের প্রথম বিশ্বাস-ঘাতক!"

ফর্চুনাতোর গোঙানি আর ফোঁপানি আরও বেড়ে উঠল—ফাল্‌কোনে তার মুখের দিকে ভীষণ চোখ করে' চেয়ে রইল। শেষে বন্দুকের বাটটা মাটিতে একবার ঠুকে সেটা আবার কাঁধে করলে, করে' আবার 'মাকী'তে যাবার যে পথ—সেই পথ ধরে' বেরিয়ে পড়ল। ফর্চুনাতোকে পিছু-পিছু আস্‌তে হুকুম করলে—সেও সঙ্গে চল্‌ল।

তখন জিসেপা ছুটে গিয়ে মাতেওর হাতখানা টেনে ধরলে! মাতেওর মনের ভিতরটা বুঝে দেখবার জন্যে সে তার কালো চোখদুটি দিয়ে স্বামীর চোখের পানে চাইলে, চেয়ে বলে' উঠল—

"ও তোমার ছেলে যে!"

মাতেও বল্‌লে, "হাত ছেড়ে দাও—আমিও ওর বাপ।"

জিসেপা ছেলের মুখে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল। ঘরের [illegible]তর যীশু-জননীর একখানি ছবি ছিল, সে তারি সাম্‌নে হাঁটু পেতে বসে', [illegible]মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে লাগল। এদিকে ফাল্‌কোনে সেই পথ ধরে' কা[illegible]

প্রায় দুশো হাত চলে' গেল, শেষে একটা ছোট খাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বন্দুকের বাঁটটা দিয়ে জমিটা পরীক্ষা করে' দেখলে—বেশ নরম, সহজেই গর্ত্ত খোঁড়া যাবে। জায়গাটা তার পছন্দ হ'ল।

"ফর্চুনাতো, ওই বড় পাথরখানার পাশে গিয়ে দাঁড়া।" ছেলেটা বাপের কথামত সেইখানে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বস্‌ল।

"এইবার ভগবানের নাম কর্‌।"

"বাবা! বাবা গো!—আমায় মেরে ফেলো না, বাবা!"

মাতেও একটা ভীষণ ধমক দিয়ে আবার বল্‌লে—

"ভগবানের নাম কর্‌ বল্‌ছি!"

ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় দুটি স্তব আবৃত্তি কর্‌লে। প্রত্যেকটি শেষ হ'বার সময় বাপ বেশ জোর গলায় 'প্রার্থনা পূর্ণ হোক্‌' বলে' স্বস্তিবাচন কর্‌লে।

"আর কোন স্তব তুই জানিস্‌ নে?"

"জানি বাবা, আমি 'আভে মারিয়া-'স্তবটিও জানি, আরও একটা জানি—মাসীর কাছে শিখেছিলাম।"

"ওটা বড্ড বড়—অনেকক্ষণ লাগ্‌বে। আচ্ছা—তা হোক্‌, তুই বল্‌।" বালক রুদ্ধকণ্ঠে স্তবগানটি শেষ কর্‌লে।

"হয়েছে?"

"বাবা! বাবা! আমায় মেরে ফেলো না। এবারটা আমায় মাফ কর। আর কখনো এমন কাজ কর্‌ব না, জানেত্তো যাতে খালাস পায়, তার জন্য আমার কর্পোরাল কাকাকে হাতে পায়ে ধরে' রাজী কর্‌ব।"

তার কথা তখনো শেষ হয়নি, মাতেও বন্দুকের ঘোড়া তুলে' লক্ষ্য স্থির কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—

"ভগবান যেন তোকে মাফ করেন!"

ছেলেটার বড় ইচ্ছে হ'ল, একবার উঠে গিয়ে বাপের হাঁটু দুটো জাপটে ধরে, কিন্তু তার আর সময় পেলে না। মাতেও ঘোড়া টিপে দিলে—ফর্চুনাতো একটা পাথরের মত ধুপ করে পড়ে গেল, তথ্খুনি তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

মাতেও মৃতদেহটা একবার তাকিয়েও দেখলে না। তখনি ছেলেকে গোর দেবার জন্যে একখানা কোদাল আন্তে বাড়ীর দিকে চল্ল। খানিক দূর যেতেই পথে জিসেপার সঙ্গে দেখা হ'ল,—সে বন্দুকের আওয়াজ শুনেই ছুট্তে-ছুট্তে আস্ছে।

"কি কর্‌লে তুমি?"—বলে' সে কেঁদে উঠ্ল।

"বিচার।"

"কোথায় সে?"

"খাদের মধ্যে পড়ে' আছে। এইবার তাকে গোর দেবো। সে ভগবানের নাম করতে-করতে পুণ্যবানের মত মরেছে। তার জন্যে গির্জ্জেয় একটা ভালো-রকমের শান্তিপাঠ করাতে হবে। এবার থেকে জামাই তিয়োদোরো বিয়াঙ্কি যেন আমার ঘরে এসে বাস করে।"

বসন্ত-দিনের স্বপ্ন

(১)

হোটেলখানি স্বর্গ বলিয়া মনে হইল—পরিচারিণীরা যেন স্বর্গ-কন্যা। ইহার কারণ, একটু ভালোভাবে থাকিবার আশায়, আমি প্রথমে আধুনিক ধরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে একটা য়ুরোপীয় হোটেলে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেইখান হইতেই সদ্য পলাইয়া আসিয়াছি। এখানে মাদুর-মোড়া মেঝের উপরে বেশ আরাম করিয়া বসিতে পারি; যে মেয়েগুলি আমার পরিচর্য্যা করে তাহাদের কণ্ঠস্বর কি মধুর! চারিদিকে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস রহিয়াছে। এ যেন উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যত কিছু নিগ্রহ হইতে পরিত্রাণ-লাভ। সকালে আহারে বসিয়া পদ্ম-চাকী আর কচি বাঁশের কোঁড় খাই। আর, একখানি [illegible] পাখা আমাকে ইহারা এই অতিথি-নিবাসের স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ উপহার [illegible]য়াছে, তাহার কথা আর কি বলিব! সে যেন স্বর্গ হইতে আমদানি হইয়াছে!

সিডার-কাঠের বারান্দার উপরে ভর দিয়া আমি নিম্নের এই সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দরটির শোভা দেখিতেছিলাম। দুই দিকে সবুজবর্ণের পাহাড়, তাহার মধ্য দিয়া দিগন্তবিসর্পী জলরাশি দেখা যাইতেছে; তাহার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোক ঠিকরিয়া পড়িয়া দূরের বায়ুমণ্ডলকে ঝাপসা করিয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ে বাতাসে টুংটাং-করা ছোট ঘণ্টার মত একটি মৃদু মধুর আওয়াজ কানে আসিল—বড় কোমলকণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ করিয়া এই প্রাসাদের অধিকারিণী আমাকে কি বলিতেছেন, তাহাতে আমার সেই সৌন্দর্য্য-তন্দ্রা টুটিয়া গেল। এই হোটেলে আসিয়াই এখানকার প্রথামত আমি তাঁহাকে যে টাকা নজর পাঠাইয়াছিলাম তাহার জন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিলাম। বয়স খুব কম,

একেবারে তরুণী বলিলেই হয়; শুধুই সুশ্রী নয়, সুন্দরী—'কনিসাদা'র সেই পতঙ্গ-কুমারী বা প্রজাপতি-বালার মত। তখনই আমার মনে মৃত্যুর কথা উদয় হইল, কারণ যাহা এত সুন্দর তাহার পশ্চাতে বিয়োগ-ব্যথা লুকাইয়া থাকে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতে আমার মহামান্য ইচ্ছা হইয়াছে? তাহা হইলে তিনি আমার জন্য একটা 'কুরুমা' আনিয়া দিতে বলিবেন। আমি বলিলাম,

"আমি কুমামোতো-শহরে যাইব। কিন্তু আপনার এই ভবনখানির নাম জানিতে বড়ই বাসনা হইয়াছে—যাহাতে চিরদিন ইহাকে মনে থাকে।"

"আমার এই অতিথি-সদন ক্ষুদ্র হইয়াও মহামান্য; পরিচারিকারা অশিক্ষিত হইয়াও মাননীয়গণের সেবা করিয়া মহামান্য। এ বাড়ীর নাম 'উরশিমা-কুটীর'। এখন আমি একখানা 'কুরুমা' আনিতে বলিয়া দিই।"

কণ্ঠের সেই সঙ্গীত থামিয়া গেল; মনে হইল, আমার চারিপাশে যেন একটা মায়া-মন্ত্রের বেষ্টনী পড়িয়াছে—একটা অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম মোহজাল আমাকে ঘেরিয়া সারাদেহে শিহরণ তুলিয়াছে। বাড়ীর ঐ যে নাম—উহা এমন একজনের নাম যাহার কাহিনী গানে গানে সমস্ত জাতিটার মনোহরণ করিয়াছে।

সেই কাহিনী শুনিলে কেহ আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। প্রতি বৎসর এইরূপ বসন্তকালে আমি যখনই সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখনই সেই কাহিনী আমার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই একটি কথা হইতে কত রূপকথার সৃষ্টি হইয়াছে—কত ছবি, কত কারুকর্ম্ম তাহাকে অমর করিয়াছে! আমি আমার ভাষায় সেই রূপকথাটি বলিবার চেষ্টা করিব।

(২)

চৌদ্দ-শো-ষোল বৎসর আগে উরশিমা নামে এক ধীবর-যুবা 'সুমিনোয়ে'-গ্রামের সমুদ্রতীর হইতে তাহার নৌকা ভাসাইয়া বাহির হইয়াছিল। সেকালের বসন্ত-দিবা ঠিক এই মতই ছিল; চারিদিকে একটি বড় নরম নীলের শোভা, সকলই যেন মদিরালস, সমুদ্রের বিশাল আরশি খানির উপরে কয়েকখানি হাল্‌কা অতিশুভ্র মেঘখণ্ড টাঙানো রহিয়াছে। সেকালে পাহাড়গুলাও ঠিক এমনই ছিল—অতি দূর নীলাভ গিরিমালা যেন আকাশের নীলে গলিয়া গিয়াছে; বাতাস ঘুমাইতেছে।

একটু পরে সেই ধীবর-যুবাও আলস্যে গা ঢালিয়া দিল, মাছ ধরিবার কালে সে নৌকার দিকে চাহিল না—নৌকা যেমন-খুশী ভাসিয়া চলিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর উরশিমা একটা কি ধরিল, টানিয়া কাছে আনিল, দেখিল সে মাছ নয়—একটা কচ্ছপ।

এখন কচ্ছপ হইল সমুদ্রের দেবতা ড্রাগন-রাজার বড় প্রীতির পাত্র; তাহার পরমায়ু এক হাজার—কাহারো মতে—দশ হাজার বৎসর। যুবক তাহাকে সাবধানে ছাড়াইয়া লইয়া পুনরায় জলে ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন-দেবতার উদ্দেশে নমস্কার করিল।

ইহার পর তাহার ছিপে আর কিছু উঠিল না। দিনটা ছিল সুখকর, এবং সমুদ্র আকাশ সবই ছিল নিস্তব্ধ। ক্রমে তাহার শরীর ভারি হইয়া আসিল; শেষে সে সেই অকূলে-ভাসিয়া-যাওয়া তরীখানির উপর ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন স্বপ্নে সমুদ্র হইতে একটি অপরূপ সুন্দরী-কন্যা উঠিয়া দাঁড়াইল; সেই জলরাশির উপর দিয়া সে যেন বাতাসের মত নিঃশব্দে বহিয়া আসিল, তারপর ঘুমন্ত ধীবরপুত্রের শিয়রে বসিয়া অতি লঘু করস্পর্শে তাহাকে জাগাইল; তারপর মধুর কণ্ঠে বলিল····

"চমকিয়া উঠিও না। তুমি বড় দয়ালু বলিয়া আমার পিতা সমুদ্রের ড্রাগন-রাজ তোমার নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন,—আজ তুমি একটি কচ্ছপকে ছাড়িয়া দিয়াছ। এখন চল, আমরা দুইজনে আমার পিতার প্রাসাদে যাই—সেই নন্দন-দ্বীপে; সেখানে বসন্ত কখনো ফুরায় না। যদি ইচ্ছা কর, আমি তোমার ফুল-রাণী হইব, দুইজনে অনন্তকাল পরম সুখে যাপন করিব।"

উরশিমা তাহাকে যতই দেখে ততই তাহার বিস্ময় বাড়িয়া যায়—সে রূপ মানবীর রূপ নয়; সে তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারিল না। তখন দুই জনে দুইখানা দাঁড় লইয়া নৌকা বাহিতে লাগিল—ঠিক যেমন আজিও দেখা যায়, ধীবর ও ধীবর-পত্নী দুইজনে মিলিয়া পশ্চিম সমুদ্রতীরের পানে তাহাদের মাছ-ধরা নৌকা বাহিয়া চলে; শেষে সূর্য্যাস্তের সোনালী আকাশে মিলাইয়া যায়।

তাহারাও সেই শান্ত স্তব্ধ নীল সমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত দক্ষিণদিকে দ্রুত বাহিয়া চলিল, শেষে সেই নন্দন-দ্বীপে, সেই চিরবসন্তের দেশে, ড্রাগন-রাজার প্রাসাদে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল।

সেখানে অদ্ভুত-মূর্ত্তি রাজভৃত্যগণ—তাহারা সকলেই জলচর—উৎসব-বেশে সজ্জিত হইয়া তুইজনকে সাদর অভিবাদন করিল, উরশিমাকে ড্রাগন-রাজার জামাতা-রূপেই তাহারা অভ্যর্থনা করিল।

ইহার পর সমুদ্ররাজ-কন্যা উরশিমার বধূ হইল—বড় সমারোহে সেই প্রাসাদ-ভবনে তাহাদের পরিণয়-উৎসব সম্পন্ন হইল।

উরশিমার সুখের সীমা নাই। অতল সমুদ্রগর্ভ হইতে কত অপূর্ব্ব সামগ্রী তাহার ভোগের জন্য সংগৃহীত হয়; সেই মায়াময় নন্দন-দ্বীপে, সেই চির-বসন্তের দেশে সুখের কি শেষ আছে! এমনই ভাবে তিন বৎসর কাটিল।

কিন্তু এত সুখেও সেই ধীবর-নন্দনের বুকে একটা তুঃখ রহিয়া গেছে—তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা তাহার জন্য পথ চাহিয়া আছেন, একথা স্মরণ হইলেই তাহার মন উচাটন হইয়া উঠে। শেষে আর পারিল না, একদিন তাহার বধূকে মিনতি করিল—সে একটিবার অল্পক্ষণের জন্য দেশে গিয়া পিতামাতার সহিত তুই চারিটি কথা কহিয়া চলিয়া আসিবে—একটুও বিলম্ব করিবে না।

তাহার কথা শুনিয়া বধূ কাঁদিতে লাগিল, অনেকক্ষণ সে আপন মনে কাঁদিল। তারপর বলিল, তোমার যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্যই যাইবে। কিন্তু তোমার যাওয়ার কথা ভাবিলে আমার বড় ভয় হয়; আমার প্রাণ বলিতেছে, আর আমাদের দেখা হইবে না। আমি তোমাকে একটি ছোট কৌটা দিতেছি, তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। যদি আমার কথা শোন তবে তুমি উহার সাহায্যে আবার ফিরিয়া আসিতে পারিবে। ঐ কৌটা তুমি কখনও খুলিও না—কিছুতেই না, যাহাই ঘটুক না কেন, যে অবস্থাই হোক্, তবু উহা খুলিও না। যদি খুলিয়া ফেলো তবে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, আর আমাকে দেখিতে পাইবে না।

এই বলিয়া সে তাহাকে একটি গালার কাজ-করা রঙীন কৌটা দিল—রেশমের দড়ি দিয়া বাঁধা।

উরশিমা বারবার কথা দিল সে কখনো ঐ কৌটা খুলিবে না; তারপর অনেক সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া বিদায় লইল। বসন্তরাত্রির জ্যোৎস্নালোকে ঘুমন্ত সাগরবক্ষের উপর দিয়া সে চলিয়া গেল। ক্রমে সেই চিরবসন্তের দেশ, সেই

নন্দনদ্বীপ তাহার পশ্চাতে বহুদূরে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। আবার সে অরুণাভ উত্তর-দিগন্তে জাপানের নীল গিরিমালা দেখিতে পাইল।

সে আবার তাহার গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী সেই উপসাগরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, সেই বালুতটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু চারিদিকে চাহিবামাত্র তাহার বুদ্ধিলোপ হইল—যেন একটা যাদুমন্ত্রে তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

দেশটা সেই দেশই বটে, কিন্তু যেমন ছিল তেমন নয়। তাহার পিতৃগৃহের চিহ্নমাত্র নাই। একটা গ্রাম রহিয়াছে, কিন্তু বাড়ীগুলা সম্পূর্ণ অপরিচিত, গাছগুলাই তাই; মাঠগুলাও সে মাঠ নয়; এমন কি লোকগুলার মুখও যেন বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রামের যেখানে যাহা-কিছু চোখে পড়িবার মত, তাহাও আর নাই; মন্দিরটা নূতন স্থানে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, গ্রামের নিকটে পাহাড়ের গায়ে যে সব বন ছিল তাহা যেন মুছিয়া গিয়াছে। কেবল সেই ক্ষুদ্র নদীটি আর পাহাড়গুলার আকৃতি যেমন ছিল তেমনই আছে—আর সবই নূতন, কিছুই চিনিবার যো নাই। নিজের ঘরখানি অনেক করিয়া খুঁজিল, দেখিতে পাইল না; তাহার স্বজাতিরা অবাক হইয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, একজনকেও চেনা বলিয়া মনে হইল না।

একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া তাহার পানে আসিতেছিল, সে তাহাকে উরশিমাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধ তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাহার কথা বারবার শুনিতে চাহিল, শেষে বলিয়া উঠিল—

"উরশিমা তারো! তুমি কোথাকার লোক হে? সে গল্প জানো না! উরশিমা তারোর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? সে তো প্রায় চারশো বছর আগে সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য গোরস্থানে একটা স্তম্ভ গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই একই স্থানে তাহার বংশের সকলকার কবর আছে। এখন আর সেখানে কেহ যায় না। উরশিমা তারোর বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিতেছ! তুমি তো কম আহাম্মোক নও!" এই বলিয়া লোকটা এমন নির্ব্বোধের মত কথায় হাসিতে হাসিতে লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

তখন উরশিমা গ্রামের সেই গোরস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল, সে স্থান এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেখানে তাহার নিজের, পিতা ও মাতার এবং আরও

অনেক পরিচিত স্বজনের কবর দেখিতে পাইল। সে সব এমন জীর্ণ, জলে ও রৌদ্রে এমন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে যে, নামগুলা সহজে পড়িতে পারা যায় না।

এতক্ষণে উরশিমা বুঝিতে পারিল, সে একটা ভয়ানক মায়ার ফাঁদে পড়িয়াছে। তখন সে পুনরায় সেই সমুদ্র তীরে চলিল; সাগর-রাজকন্যার দেওয়া সেই কৌটাটি সর্ব্বদাই তাহার হাতে রহিয়াছে। কিন্তু এ কেমন ভ্রম? কৌটার মধ্যেই বা কি আছে? হয় তো ঐ কৌটায় যাহা আছে তাহাই এই সকলের কারণ। ক্রমে এই সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, বিশ্বাস টলিল। সে তাহার প্রিয়তমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ভয় পাইল না, রেশমের দড়িটা আল্‌গা করিয়া কৌটাটা খুলিয়া ফেলিল।

সেই মুহূর্ত্তে সহসা একটা প্রেতচ্ছায়ার মত শাদা মৃত্যুশীতল ধূম্রমূর্ত্তি সেই কৌটা হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল, এবং গ্রীষ্মকালীন একখণ্ড হাল্‌কা মেঘের মত আকাশে উঠিয়া, সেই নিথর সমুদ্রের উপর দিয়া অতি-দ্রুত দক্ষিণদিকে ভাসিয়া গেল। কৌটায় আর কিছুই ছিল না।

উরশিমার প্রাণ তখনই জানিতে পারিল, সে আর তাহার প্রিয়তমার নিকটে যাইতে পারিবে না, সমুদ্র-দেবতার সেই কন্যাকে সে চিরদিনের মতই হারাইল। গভীর নিরাশায় সে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তাহার নিজেরও ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল। তাহার দেহের রক্ত সহসা বরফের মত হিম হইয়া আসিল; দাঁতগুলা পড়িয়া গেল; মুখের চামড়া লোল হইয়া উঠিল; দেহে আর কোন শক্তি রহিল না। শেষে তাহার প্রাণহীন দেহ সমুদ্রবালুকার উপর লুটাইয়া পড়িল—চারিশত বৎসরের বার্দ্ধক্য তাহাকে যেন নিমেষে চূর্ণ করিয়া দিল।

* * *

রাজাদের সরকারী বিবরণীতে লিখিত আছে যে, মিকাদো 'যুরিআকু'র রাজত্বের একবিংশ বৎসরে 'তাঙ্গো'-দেশের 'য়োসা'-জেলার 'মিদ্‌জুনোয়ে'-গ্রামের উরশিমা নামে দেব-বংশীয় এক যুবা একটা মাছ ধরিবার নৌকায় চড়িয়া 'হোরাই'-নামক স্বর্গে গমন করিয়াছিল।

ইহার পর, একত্রিশ জন রাজা ও রাণীর রাজত্ব-কালের মধ্যে, অর্থাৎ পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত, উরশিমার আর কোন সংবাদ নাই। তারপর, ইতিকথা অনুসারে, মিকাদো 'গো-জুন্‌বা'র রাজত্বকালে—'তেন্‌চিয়ো' অব্দের দ্বিতীয় বর্ষে, যুবক উরশিমা একবার ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তখনই আবার কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানে না।

(৩)

আমি এই গল্পটি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম। এই কাহিনী লইয়া কত ছবি, কত কবিতা, কত প্রবাদ রচিত হইয়াছে—একটা জাতির কল্পনা-বৃত্ত ইহার দ্বারাই কত প্রকারে সঞ্জীবিত হইয়াছে! মনে পড়িল, একবার এক পান-ভোজনের উৎসবে, 'ইজুমো'-সম্প্রদায়ের এক নর্ত্তকী উরশিমা সাজিয়াছিল; তাহার হাতে একটি গালার-কাজ-করা কৌটা, তাহা হইতে সেই নিদারুণ ক্ষণে ধূপের ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল—'কিয়োতো'র নামজাদা ধূপ। আমি সেই নৃত্যের প্রাচীন ভঙ্গির কথা ভাবিতেছিলাম, ভাবিতে ভাবিতে পুরাকালের সেই সব নর্ত্তকীর কথা মনে হইল যাহাদের ধারা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। তখন স্বভাবতঃই আরও সূক্ষ্মচিন্তার উদয় হইল—মৃত্যুর কথা, সব-কিছু ধূলামাটিতে পরিণত হওয়ার কথা ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমরা নিত্য আমাদের পদতাড়নায় যে পথ-ধূলিকে উৎক্ষিপ্ত করি, মনুষ্য-হৃদয়ের এই যে আক্ষেপ-বিক্ষেপ—সৃষ্টির শাশ্বত-বিধানের নিকটে সে গুলা কি উহা অপেক্ষা কিছুমাত্র গুরুতর? তখনই আমার জাতিগত ও বংশগত ধর্ম্ম-সংস্কার আমাকে ধমক দিল; মনকে বুঝাইলাম, যে-কাহিনী এক হাজার বৎসর ধরিয়া বাঁচিয়া আছে, যত দিন যাইতেছে ততই তাহার মাধুরী বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার মূলে নিশ্চয় একটা সত্য আছে। কিন্তু সে সত্য কি? তখনকার মত এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাই নাই।

এক্ষণে পুনরায় উরশিমার কাহিনী চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি কল্পনানেত্রে দেখিলাম, সেই নন্দন-দ্বীপের প্রাসাদে একটি সুসজ্জিত বাসর-কক্ষে ড্রাগনরাজ-দুহিতা প্রিয়-সমাগমের আশায় বৃথাই দিন গণিতেছে। পরে সেই নিষ্ঠুর নির্দ্দয় মেঘখণ্ড দুঃসংবাদ বহন করিয়া ফিরিয়া আসিল, রাজ-কন্যার কান্না আর থামে না; সেই সাগর-চারী, অদ্ভুতদর্শন, হৃদয়বান

সেবছকের দল তাহাকে কত প্রকারে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। মূল কাহিনীতে ইহার কিছুই নাই, সকলেই কেবল উরশিমার জন্যই কাঁদিয়া আকুল।

কিন্তু উরশিমার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ আছে? একথা সত্য যে, দেবতারা তাহার জ্ঞান হরণ করিয়াছিল; কিন্তু কোন্ মানুষই বা দেবতাদের ছলনায় বিড়ম্বিত না হয়? জীবনটাই তো একটা প্রকাণ্ড ছলনা। এই ছলনায় পড়িয়াই উরশিমা দেবতাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই, তাই সে ঐ কৌটা খুলিয়াছিল। তার পর সে কিন্তু অতি সহজেই মৃত্যু-লাভ করিয়াছিল। মৃত্যুর পর, সকলে তাহাকে 'উরশিমা-মিওজিন্' নাম দিয়া, দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে—মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্যদেশে আমরা ইহার ঠিক উল্টাই করি। আমরা আমাদের দেবতাকে মানি না, না মানিয়াও বাঁচিয়া থাকি,—এবং সেইরূপ বাঁচিয়া থাকার ফলে আমরা দুঃখের চরম রূপটি দেখিতে পাই। আমরা এমন যথাকালে—অর্থাৎ পূর্ণ-সুখসম্ভোগের পর, এমন অনায়াসে মৃত্যু-বরণ করি না,—মৃত্যুর পরে নিজেরই মাহাত্ম্যে দেবতা হইয়া এমন পূজা পাওয়া তো দূরের কথা! অতএব উরশিমার জন্য আমরা দুঃখ করিব কেন? সে তো এতকাল ধরিয়া একা সেই দেহধারী দেবতাদের সঙ্গসুখ ভোগ করিয়াছিল।

তথাপি আমরা এই যে দুঃখ করি—হয়তো ঐ দুঃখ-করার মধ্যেই উহার কারণ মিলিবে। ঐ দুঃখ উরশিমার জন্যই নহে, ঐ কাহিনী মাত্র একটা মানুষের কাহিনী নয়—কোটী মানুষের কাহিনী। যখনই সমুদ্রের উপরে আকাশের আলো নীলাভ হইয়া উঠে, বাতাস বড় মৃদু-মন্দ বহিতে থাকে, তখনই মনের ভিতর ঐ চিন্তা জাগে; সে যেন কিসের অনুশোচনা—কত কালের! এই যে একটা বিশেষ ঋতুর সঙ্গে ইহা এমন জড়িত হইয়া আছে, এবং অনুভূতিও এমন গভীর, তাহাতে মনে হয়, আমাদের জীবনেও ইহার একটা বাস্তব-ভিত্তি আছে—কিম্বা হয়তো উহা পুরুষানুক্রমিক। কিন্তু সেই বাস্তব কেমন বাস্তব? ঐ ড্রাগন-রাজকন্যা কে? সেই চির-বসন্তের নন্দন-দ্বীপই বা কোথায়? আর ঐ কৌটার ভিতরে যে মেঘখানি থাকে তাহাই বা কি?

সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারিব না, যেটুকু জানি তাহাই বলিতেছি, সেও নূতন কথা নয়।

আমার হৃদয়ে একটা দূর-দেশের স্মৃতি আছে,—আর এমন একটা কালের, যে-কালে সূর্য্য ও চন্দ্র দুই-ই আরও বৃহৎ, আরও দীপ্তিমান ছিল। সেটা এ জীবনের, কি কোন পূর্ব্ব-জীবনের তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমি জানি, তখন আকাশ আরও নীল—পৃথিবীর আরও নিকটে ছিল।.........তখন সমুদ্রেরও প্রাণ ছিল, সে কথা কহিত; বাতাসও যেন আদর করিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইত—আমি আনন্দে বিভোর হইতাম। বাল্যকালে, যখন এই পৃথিবীতেই স্বর্গবাস করিয়াছিলাম, তখন এক-একদিন পাহাড়ের ধারে বসিয়া স্বপ্নাবেশে মনে হইত, যেন ক্ষণেকের জন্য সেই মধুর বাতাস বহিয়া গেল—ঠিক সেই বাতাস নয়, তবু যেন তাহারই মতন।

—সেই দেশ ও কালের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল আমি কিসে সুখে থাকিব। সময়ে সময়ে আমি সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখ বরণ করিতে চাহিতাম। তাহাতে সেই দুঃখহীনা অমরকন্যা দুঃখ পাইতেন। তার পর বিদায়ের দিন আসিল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন; শেষে আমার হাতে একটি মন্ত্রপূত বস্তু দিয়া বলিলেন, আমি যেন তাহা কখনো কিছুতেই না হারাই; ইহাই আমাকে চির-যৌবনে জ্যোতিষ্মান রাখিবে, উহারই বলে আমি ফিরিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু আমি আর ফিরিলাম না। কতদিন কত বৎসর কাটিয়া গেল, শেষে জানিতে পারিলাম, আমি সেই মন্ত্রপূত কৌটাটি হারাইয়া ফেলিয়াছি, আমার সে যৌবন আর নাই, অতি হীন ও কদর্য্য জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে।

তারা-হারা

একটা সনেটের পাঁচ লাইন মাত্র শেষ করেছি, এমন সময়ে আমার খাস-খানসামা এসে বললে,

"হুজুরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দু'জন দেবদূত এসেছেন।"

জিজ্ঞাসা করলাম "তাঁরা কার্ড দিয়েছেন কি ?"

"হ্যাঁ হুজুর, এই যে।"

একখানায় লেখা আছে "হেলিয়াল," আর একখানায় "জাফায়েল"—দু'জন দেবদূতই ত' বটে !

বললাম, "আস্‌তে বল।"

অবশ্য এমন দু'জন মাননীয় অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আমি যে বেশ উৎসুক হয়ে উঠলাম, তা' বলাই বাহুল্য। দু'জনেরই বেশ বড় বড় পাখার পোষাক; প্রত্যেক পাখায় চারখানি করে' পালক, তাদের তলাকার তুলোর আস্তরটা ঠিক যেন সকালবেলার হালকা কুয়াসার মত—তার থেকে রামধনুর সব ক'টা রংই ঠিকরে পড়ছে। তাঁদের শরীরের যেটুকু দেখতে পাওয়া গেল—সে যেন স্বচ্ছ বরফের মত শাদা, কেবল একটু গোলাপী আভা মাখানো। আমি হাত বাড়িয়ে 'বসতে আজ্ঞা হোক' বললাম, তার পর খুব নম্রতা করে' জিগ্যেস করলাম, কি প্রয়োজনে তাঁরা আমার মত এই অধমকে দর্শনদান করে' ধন্য করেছেন।

হেলিয়াল বললেন,

"খুব সংক্ষেপেই বলছি। ঠিক ষোল বছর আগে, জুলাইমাসের এক সুন্দর রাত্রে, আমি আর জান্নায়েল বিলিয়ার্ড খেলছিলাম—আকাশের সবুজ কার্পেটের উপরে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম,

"মাপ করবেন,—কিন্তু আকাশ ত' সবুজ নয়—সে ত' নীল।"

"অনন্ত আকাশের কোন কোন স্থান নীল বটে। কিন্তু অন্য সব জায়গায়, বিশেষ করে' তার যেখানটা পারস্যদেশের শহর আর প্রান্তরের উপরে ঝুঁকে পড়েছে—সে সব জায়গা খুব সবুজ, চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়!"

আমি আর কিছু বললাম না। হেলিয়াল বলতে লাগলেন,

"সবচেয়ে সুন্দর যে দুইটি নক্ষত্র, আমরা তাই নিয়ে করেছিলাম আমাদের বিলিয়ার্ডের বল—"

"আর ছড়ি করেছিলেন কি দিয়ে?"

"ধূমকেতুর লেজ। কাজেই বুঝতে পারছ, খেলাটা বেশ জমে' উঠেছিল। আমিই বাজিটা জিত্‌ব জিত্‌ব করছি, এমন সময়ে খুব জোরে একটা ঘা' দিতেই বল দুটো কিনারা পার হয়ে গেল"।

"বাইরে পড়ে' গেল?"

"হাঁ, একেবারে আকাশের কিনারা টপ্‌কে! ভারি দুর্ঘটনা ঘটে' গেল, কারণ দু-দুটো তারা কম পড়ে' যাওয়া স্বর্গের পক্ষে একটা গুরুতর ব্যাপার কিনা! স্বর্গের ময়দানের যিনি অধ্যক্ষ তিনি হুকুম দিলেন, যে-পর্য্যন্ত না ওই হারানো তারা দুটোকে খুঁজে বের করে' আবার যেখানকার সেইখানে রেখে দিই, ততদিন স্বর্গের আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে বারণ।

"এই ষোল বচ্ছর ধরে' কি খোঁজটাই খুঁজলাম আমরা! পৃথিবীর যত জায়গা আছে যেখানে ঐ তারা দুটো পড়ে' গিয়ে থাকা সম্ভব, কিছু আর বাদ রাখি নি। কিন্তু সে আর পাওয়া গেল না—কি দুর্ভাগ্য বল দেখি? শেষে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি—স্বর্গ থেকে চির-নির্ব্বাসন ভোগ

করতেই প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময়ে খবর পেলাম, তোমার যিনি প্রণয়িনী সেই তরুণীর চোখদুটি নাকি অতুলনীয়—অবিশ্যি, মুখে-মুখে যা রটেছে তা' যদি বিশ্বাস করতে হয়। যা' শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, তাঁর চোখদুটি সাধারণ মর্ত্ত্য-সুন্দরীর চোখ নয়, ও স্বর্গেরই সেই দুটি আলোর গোলক, আমরা যা' খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। আশা করি, তিনি সে দুটি ফিরিয়ে দিতে অমত করবেন না।"

শুনে আমি ত' আর নেই! আমার প্রাণসমা প্রিয়তমার চোখদুটি এরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, এ কথা মনে হ'তেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। কিন্তু ঐ দু'জন দেবদূতের পৈত্রিক সম্পত্তি উদ্ধার করে' দেওয়া যখন আমারই হাতে, তখন এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করাও ত' আমার উচিত! অগত্যা আমি তখনই মাদ্‌মোয়াজেল মেসাঁজকে ডেকে পাঠালাম, সে এলে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম।

তার কিন্তু কোন ভাবান্তর হ'ল না—ভয়ও পেলে না, শুনে আশ্চর্য্যও হ'ল না! একটু কি চিন্তা করে' আগন্তুক দু'জনের দিকে ফিরে দাঁড়ালো, তারপর তার চোখদুটির পাতা যতদূর সম্ভব তুলে' ধরে' তাঁদের জিগ্যেস করলে, "দেখুন দেখি আপনারা—এ দুটো কি আপনাদের সেই হারিয়ে-যাওয়া তারা বলে' মনে হয়?"

তাঁরা খুব কাছে সরে' এলেন, খুব লক্ষ্য করে' মেসাঁজের সেই স্বচ্ছ, নির্ম্মল চোখদুটি দেখতে লাগলেন। কয়েক মিনিট চাপা গলায় দু'জনে কি বলাবলি করলেন—ঠিক যেমন বিচারপতিরা রায় দেবার আগে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে। শেষকালে হেলিয়াল বললেন,

"না, এ সেই নক্ষত্র নয়, যা ষোল বছর আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের সে দু'টির এত বেশি দীপ্তি ছিল না—যদিও সেই জুলাইমাসের রাত্রে তারা খুবই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।"

এই বলে' বড়ই নিরাশ হয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন। তাঁদের জন্যে আমার দুঃখ হ'ল, যদিও সেই সঙ্গে প্রাণটাও বাঁচলো—আর একটু হ'লেই আমাকে প্রিয়াহারা হ'তে হয়েছিল আর কি!

আর মেসাঁজ? সে ত' হেসেই কুটোকুটি! বললে, "কেমন চালাকি করে' ওদের ফিরিয়ে দিয়েছি! কথাটা সত্যিই বটে। আমার মা কতবার বলেছেন, আমার জন্মাবার কিছুক্ষণ পরেই আকাশ থেকে দুটো তারা খসে' পড়ে' খোলা জান্‌লা গলিয়ে একেবারে আমার চোখের পাতার ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু দেবদূত দুটো যখন একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল তখন আমি কি করেছিলাম জানো? ঠিক সেই সময়ে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, সেই যে তুমি আমার ঠোঁটে প্রথম চুমো খেয়েছিলে —সেই চুমোর কথা। আমি নিশ্চয় জানতাম, সে আনন্দ স্মরণ করলে আমার চোখদুটোতে এমন আলো ফুটে উঠবে, যার সঙ্গে কোন নক্ষত্রের আলো—হোক না সে স্বর্গের—কিছুতেই সমান হ'তে পারে না!"

দম্পতি

আপনাদের ঐ প্যারিস-শহরের লোকেরা যখন আগষ্টের শেষে, শহরের জল-সরবরাহ বড় কম হচ্ছে বলে'—খবরের কাগজগুলোতে তাই লিখে'—একটু শৌখীন রকমের অনুযোগ করে, তখন আমি না হেসে থাকতে পারিনে। আমি একটি শহরের কথা জানি, তার লোকসংখ্যা প্রায় ষাট হাজার হবে, নাম—'এডেন'; লোহিত-সাগরের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রের দিকে ঠেলে এসেছে যে একখণ্ড উঁচু পাথুরে জমি, তারই উপর ঐ শহর; সে পাথর যেন আগ্নেয়-গিরির গর্ভ থেকে গলে' বেরিয়ে এসেছিল, তার পর জমে' গেছে বটে, কিন্তু এখনও ভালোরকম ঠাণ্ডা হয় নি। সেখানে, আমাদের এই ম্যুনিসিপালিটির নিন্দে করেন যাঁরা, তাঁরা লক্ষ টাকা দিলেও একগাছি ঘাস কিম্বা এক ফোঁটা জল পাবেন না।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত পুজোল তখন সেখানকার কন্‌সাল। ঐ পথ দিয়ে আমি চীনদেশে আমার কাজে ফিরে যাচ্ছিলাম, বন্ধু আমাকে তাঁর সেই পাথুরে আস্তানায় পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

"আচ্ছা, বৃষ্টি হয় তো? তার জল যায় কোথা?"

"যখন হয়, তখন সরকারী চৌবাচ্চাগুলো ভর্ত্তি হ'য়ে যায়। কিন্তু আজ পাঁচ-বচ্ছর এখানকার মানুষ আকাশে একখানাও মেঘ দেখতে পায়নি।"

"তা হ'লে আজ খেতে বসে' যে চমৎকার জল পান করলাম তা এলো কোথা থেকে?"

"ও কারখানার জল। একজন ইংরেজ সদাগর ঐ জলের ব্যবসা করে; সমুদ্রের জল কলে পরিষ্কার করে' তাই বিক্রি করে সোনার দামে; জিনিষ যা' দেয় তা' একেবারে খাঁটি, কিন্তু তাতে ভিটে-মাটি চাটি হবার যোগাড়; আমারই জলের বিল মাসে এক-শো' ফ্রাঙ্কে দাঁড়ায়,—অবিশ্যি আমার স্ত্রী স্নানও করেন ঐ জলে, সমুদ্রের জল তাঁর সহ্য হয় না।"

"কি বিপদ! তা' হলে এই সব গরিব আরবগুলো কি করে? তারা তো আর বছরে বার শো' টাকার জল কিনে খেতে পারে না!"

"ঐ যে প্রায় বিশ মাইল দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ঐখান থেকে রোজ সকালে উটের পিঠে বোঝাই হয়ে যে জল আসে তাই তারা খায়; কি আর করবে? সে জল খেতে ভালো নয়, তাতে ছাগলের চামড়ার বোটকা গন্ধ লেগে থাকে—তারই মোশকে ভর্ত্তি করে' আনে কি না! কিন্তু উপায় কি? রিফাইন করা জলের দাম যে বড্ড বেশি! তা ছাড়া, একটা আইনও করা হয়েছে—সে জল দেশী লোকদের বিক্রি করতে পারবে না; য়ুরোপীয় যারা এখানে আছে, আর এখানে যে ব্রিটিশ সৈন্য থাকে, তারা ছাড়া আর কেউ সে জল খেতে পারবে না; যদি কোন জাহাজের জল ফুরিয়ে যায় তা'হলে এখান থেকে ঐ জল নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া আর কেউ ঐ জল খেলে তাকে পুলিশে ধরবে।"

আমি এই সব খবর নোটবুকে টুকে নিলাম, তার পর বন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে ফিরে গেলাম। সেখানে বন্ধুপত্নী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মাদাম পুজোল মার্সাই-জেলার মেয়ে, বেশ সুন্দরী; এই মরুভূমিতে এখন নির্ব্বাসিত হয়ে আছেন। সেদিন সকালেই তাঁকে প্রথম দেখি, তার কারণ আমার বন্ধু সম্প্রতি বিবাহ করেছেন।

ঐ দেশের সম্বন্ধেই আলোচনা হ'ল—এখানে দেখবার মত বস্তু কি কি আছে, এই সব কথা। শ্রীমতীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, বললেন—"বলেন কেন? কেবল দুটিমাত্র মহিলার পায়ের ধুলো পড়ে এ বাড়ীতে; একজন একটি বৃদ্ধা ইংরেজিনী, তিনি আমাদের ভাষার দুটো কথাও জানেন না; আর একজন এইখানকার 'বিশ্ব-হোটেলে'র হোটেল-গিন্নী, তাঁর বাড়ী ফ্রান্সের শাম্পেন-জেলায়; কিন্তু হ'লে হবে কি—তিনি এখানকার ঐ

লক্ষীছাড়া আরব আর সোমালিদের সঙ্গে জিনিষের দাম-দস্তুর নিয়ে চেঁচা-মেচি করতেই পারেন ভালো, স্বদেশিনীর সঙ্গে একদণ্ড ব'সে যে একটু গল্প করবেন, সে তাঁর ধাতে সয় না!"

শুনে' আমি আমার এই নির্জ্জন-বাসিনী বন্ধু-পত্নীর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে বন্ধুটি বলে' উঠলেন—

"নাও, নাও! আর অত কান্না কাঁদতে হবেনা গো! আরব-পাড়ায় তোমার যে প্রাণ-সখাটি আছে, তার কথা চেপে যাচ্ছ কেন?"

মাদাম-পুজোল একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন, তবু অগ্রাহ্য করার ভঙ্গিতে বললেন—

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—প্রাণসখা, না আর কিছু! মাগো! রঙ তো নয়, যেন রান্নাঘরের চিমনির ভুষো!"

বন্ধু তবু ছাড়বেন না—"কালো বটে, তবু কেমন সুশ্রী! কালো হ'লে কি হয়—চেহারাখানা কেমন লম্বা-চওড়া, মানানসই! আর টাকাও কম না কি? এডেন-শহরে এত বড় কফি-র ব্যবসা কারো আছে? আমি তোমাকে কাল তার বাড়ীতে নিয়ে যাবো; দেখবে তার কি রকম সব দামী কার্পেট, আর কি সব সুন্দর সুন্দর জিনিষে ঘরগুলো ভরে' রেখেছে —যেন মেলা বসিয়েছে! আমার ঐ গিন্নিটি সেইখানেই তো সারাদিন কাটিয়ে আসেন। আমি যদি বারণ ক'রে না দিতাম, তা'হলে এতদিনে আর্দ্ধেক জিনিষ আমারই ঘরের শোভাবর্দ্ধন করত; বলে, এসব জিনিস ঐ শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার বড় প্রিয়!"

পত্নী বললেন—

"কি রকম বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে দেখ! আপনি বিশ্বাস করেন, ঐ নিগ্রোটার সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব হয়েছে?" তাঁর রাগ এবার বেড়ে যেতে লাগলো।

কন্‌সাল-প্রবর আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—

"ওঁর মেজাজটা আজ ভালো নেই, তার কারণ, সকালে একটি গয়না হারিয়ে গেছে।"

"সে কথা ঠিক! আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। সমস্ত দিন ধ'রে খুঁজে বেড়িয়েছি, কোথায় গেল আমার এক কাণের একটা কালো মুক্তো। উনি সিংহল থেকে একজোড়া ঐ মুক্তো কিনে এনেছিলেন। দেখুন না, তার একটা এই এক কানে রয়েছে, দেখলেই বুঝতে পারবেন কি সুন্দর জিনিস!"

আমি কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে সেটিকে দেখতে লাগলাম; শ্রীমতীর কাণের গড়নটিও বেশ, একটি ভারি মিষ্টি গন্ধদ্রব্যও ব্যবহার করেন তিনি। এর পর অন্য কথা হতে লাগলো। রাত্রে ছাদের উপর শুতে গেলাম—ও দেশের ঐ প্রথা।

পরদিন বন্ধুর সঙ্গে আরবদের পাড়ায় বেড়াতে গেলাম। মাদাম পুজোলের 'প্রাণসখা'র বাড়ীতেও দর্শন দেওয়া গেল; তাঁর নাম—মুলাদ বেন সৈয়দ; নামেই বুঝতে পারা যায়, লোকটি জাতিতে আরব। কফি-র ব্যবসা করে' তিনি এখন লক্ষপতি হয়েছেন। 'মোকা' নামে যে কফি আছে—তাঁর এখানে যেমনটি পাওয়া যায় তা' আর কোথাও নয়; অবিশ্যি প্যারিসেও পাওয়া যায়, তবু যিনিই এ অঞ্চলে বেড়াতে আসেন তাঁর ঐ কফি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চাই। সবদিক বিবেচনা করে দেখলে, দামও খুব বেশি নয়।

এহেন 'মোকা'-খ্যাতিসম্পন্ন, ধনী বণিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময়ে আর একটি ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তাঁর নামটা এখন মনে পড়ছে না। ভদ্রলোক নাকি সারা পৃথিবী, বা ঐ রকম একটা-কিছু সদ্য ভ্রমণ করে এসেছেন। যাকে পণ্ডিত বলে তিনি সেই জাতের মানুষ; যা দেখেন বা শোনেন তাই নোট করে নিতে সদাই ব্যস্ত; শিলালিপির নকল তৈরী করে' নেন, 'একাডেমি'র পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রায় ছাপা হয়; বললেন, তিনি নাকি ঐ পণ্ডিত-সভার একজন বিশিষ্ট তথ্যসংগ্রহকারী সভ্য।

মুলাদ সুন্দর ইংরেজী বলেন—শহরের সমাজে যেমনটী দরকার। চেহারাও

খাঁটি আরববাসীর চেহারা—পৃথিবীতে যার মত সুন্দর চেহারা আর নেই। তাঁর অভ্যর্থনায় আমরা মুগ্ধ হলাম। শুধুই তাঁর দোকান নয়, ভিতর-মহলটিও আমাদের দেখাতে নিয়ে গেলেন—সে আরও দেখবার মত বটে। তারপর সব দেখানো শেষ হ'লে, তিনি আমাদের সবাইকে তাঁদের দেশী ধরণের কফি পান করালেন। পানীয়টি বড়ই সুস্বাদু ও সুগন্ধ মনে হল; আমরা যেমন খাই তার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয়, যেন গেসো (gassy) লেমনেডের বদলে শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তার সঙ্গে 'শিবুক'ও ছিল, থাকাই দস্তুর—আর ছিল একটি জলে-ভরা সুরাই।

কুড়ি মাইল দূর থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে যে জল আনা হয়েছে তা যে খুব ভালো জল এমন বলা যায় না, কিন্তু আমার বড় পিপাসা পেয়েছিল। তা ছাড়া, এর চেয়ে ঢের খারাপ জল খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, দক্ষিণ-চীনের ধানক্ষেত-ভাসানো জলও আমি খেয়েছি।

কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য ত! এ-জলে ছাগলের চামড়ার গন্ধ মোটেই নেই! দেখতে যে খুব পরিষ্কার তা নয়, কিন্তু বেশ স্পষ্ট একটা সুগন্ধ রয়েছে। গন্ধটা যেন—যেন—হ্যাঁ, ঠিক তো—ভায়োলেটের গন্ধ! বোঝ একবার! দেশটা আবিসিনিয়ার লাগাও বললে হয়, এমন দেশেও ভায়োলেট ফুল!

পণ্ডিত মানুষটিও প্রায় একই সময়ে আমার মত চমকে উঠলেন। বার বার শুঁকে দেখলেন, তারপর একটু একটু মুখে নিয়ে বেশ আস্তে আস্তে আস্বাদন করতে লাগলেন—শেষে খুব গম্ভীর ভাবে আমাকে বললেন,—

"জলে একটা কেমন গন্ধ রয়েছে বুঝতে পারছেন কি?"

আমি বললাম, "হাঁ, ভায়োলেটের গন্ধ।"

"ঠিক! ব্যাপার কি জানেন? কয়লার থেকে যে সব জিনিস পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন কোনটায় ভায়োলেটের গন্ধ থাকে। যারা গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে তারা ঐ কয়লা-জাত বস্তুটির মিশাল দিয়ে তৈরী তাদের এসেন্সগুলো সস্তা করে' নেয়। আমার মনে হয়, সেই রকম কোন কয়লার খনির সঙ্গে এই জলের সংস্পর্শ আছে। তার মানে, এডেনেও কয়লার খনি আছে। ভেবে দেখুন, এ একটা কত বড় সংবাদ! কি

টাকাটাই উপার্জ্জন করা যায়! এখানে যে সব কয়লা পোড়ানো হয় তার প্রত্যেক টুকরোটি আসে ইংল্যাণ্ড থেকে।”

এর পর তিনি গৃহস্বামীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ যে জল প্রত্যহ আনা হয়, ওর ঝরণা কোথায়? ঠিক কোন্ জায়গাটিতে? তিনি সেইদণ্ডে জায়গাটা দেখবার জন্যে রওনা হতেন, কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, সেইদিনই রাত্রে তাঁর জাহাজ ছেড়ে যাবে। তাই, আর কিছু না পারুন, ঐ জলের খানিকটা নমুনা একটা বোতলে ভরে' নিয়ে যাবেন—প্যারিসের ল্যাবরেটরীগুলোতে পরীক্ষা করাবার জন্যে। তাঁর এই প্রস্তাব শুনে মুলাদ-বেন-সৈয়দ কেন যে এত মুষড়ে গেলেন, তার কারণ বুঝতে পারলাম না।

যাই হোক, এবার সকলকে উঠতে হয়। সেই জল শেষ এক-গ্লাস খেয়ে নেবার জন্যে যেই ঢালতে সুরু করেছি, অমনি আমার গেলাসে জলের সঙ্গে কি একটা বস্তু ঠক্ ক'রে পড়ল। অবাক কাণ্ড! একটা কালো রঙের মুক্তোই ত বটে! ঠিক যেমন মাদাম পুজোলের কাণে দেখেছিলাম —তারি জুড়ি এটা। জলের সুবাসও অবিকল সেই রকম! তখন গন্ধটা চিনতে পারলাম, এই গন্ধই পেয়েছিলাম তাঁর অঙ্গে—আমি যখন তাঁর উপর ঝুঁকে, তাঁর কাণের সেই কালো মুক্তোটি ভালো করে' দেখছিলাম; একটু রোমাঞ্চিতও হয়েছিলাম বৈ কি—যারসাই-বাসিনী মহিলাটি বেশ একটু হাব-ভাবশালিনী কি না!

ঐ মহাপণ্ডিতটি যে একটি মহাগর্দ্দভ তা'তে আর সন্দেহ নেই। ওঁর ঐ কয়লার খনির নিকুচি করেছে! আর, আমার বন্ধুর কি কপাল! আহা, বেচারী আমাকে বলেছিল বটে—“এ দেশের জলবায়ু পুরুষদের পক্ষে বড় অবসাদকর, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ঠিক উল্টো—তাদের ফুর্ত্তি আরও বেড়ে যায়।”

এই ধনী সুপুরুষ আরব-যুবা—এমন প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বাড়ীতে যার বাস, তারই ঘরে মাদাম পুজোলের কান থেকে খসে'-পড়া এই কালো মুক্তোটা পাওয়া গেলো!—আবার তার সঙ্গে তাঁর প্রিয় সেই পুষ্পসারের গন্ধটুকুও লেগে রয়েছে! কিন্তু উপায় কি? কিছু করবার তো যো নেই। সেই মহামহিম পুরুষটি আমার দিকে যে রকম দৃষ্টিপাত করছিলেন তা' আমার

মোটেই ভাল লাগছিল না; তাঁকে যে কিছু জিগ্যেস করব তারও উপায় [illegible] কারণ, এ ব্যাপারে যার স্বার্থ সবচেয়ে বেশি, সেই স্বামী-ব্যক্তিটি কাছেই বসে' আছে।

জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতটি যখন তাঁর বোতলে ছিপি আঁটছিলেন, সেই অবকাশে আমি আমার গেলাস থেকে খানিকটা জল হাতে ঢালবার ছল করে' সকলের অসাক্ষাতে মুক্তোটি হস্তগত করলাম। তবু বেচারীর ক্ষতিটা যেটুকু কমাতে পারি—আহা, মুক্তোটাও খোয়াবে! এর পর আমরা আরবটার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। খনিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতটি সোজা জাহাজঘাটের দিকে রওনা হ'লেন। আমি আর একবার কন্‌সাল-মহাশয়ের গৃহে দর্শন দিতে চললাম, মুক্তোটা ফিরিয়ে দিতে হবে তো। বড় সুবিধে হ'ল, বন্ধু তখনই আমার সঙ্গে না ফিরে, ষ্টীমারের কাপ্তেনের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে আর এক পথে প্রস্থান করলেন—আমি দিব্যি একা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম।

বেশ একটু কঠিন অথচ শান্তস্বরে বললাম, "মাদামের কাছে বিদায় নেবার আগে, যদি অনুমতি করেন তো, আপনার সেই হারানো মুক্তোটি আপনার হাতে দিয়ে যাই।"

শুনে তিনি একটা হর্ষধ্বনি করে' বললেন—

"আমার সেই মুক্তোটা! কি ভাগ্যি আমার! কোথায় পেলেন?"

আমি বললাম, "মুলাদ বেন সৈয়দের ঘরে"। বেশ জোর দিয়ে দিয়ে প্রত্যেক শব্দটি উচ্চারণ করলাম। "সেই খানেই পেয়েছি। খুব সৌভাগ্য বলতে হবে যে, পুজোল জানতে পারে নি।"

মহিলাটি অবাক হয়ে গেলেন। আমি কিন্তু সেই এক রকম স্বরে বলে' যেতে লাগলাম—

"এর বেশি আমি জানিনে, জানতেও চাই নে। এ কথা বলা অবশ্য বাহুল্য যে, আমি, ভদ্রলোকের যা' উচিত, তাই করব—এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গ আর কেউ জানতে পারবে না।"

ব'লেই চলে' এলাম—তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ডও করলাম না। কেবল একটি মাত্র চাহনিতেই জানিয়ে দিলাম, তাঁর প্রতি আমার কি রকম ঘৃণা হয়েছে। অন্ততঃ একজনকে যে তিনি ঠকাতে পারেন নি, একথা তাঁকে ভালো করে' বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ছিল।

বন্ধু আমাকে জাহাজের উপরে বিদায় দিতে এলেন; এমন আবেগভরে আমি তাঁকে বুকে চেপে ধরলাম যে, তিনি বোধ হয় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এডেন ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়লাম।

* * *

পুজোল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় প্যারিসের বড় রাস্তার ধারে। তাদের দেখে মনে হ'ল, দুটির মধ্যে ভালোবাসা আরও মধুর, আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। যুবতীটির কাণে সেই কালো মুক্তোর দুল-দুটি তেম্‌নি দুলছে। তিনজনে মিলে একটি ভোজনাশালায় গিয়ে আহার করা গেল, এডেনের গল্পই চলতে লাগল।

হঠাৎ কন্‌সাল মহাশয় বলে উঠলেন,

"হ্যাঁ, ভালো কথা। মুল্লাদের বাড়ীতে তুমি তো সেই হারানো মুক্তোটা পেয়ে গিছলে, তারপর হপ্তাখানেক ধরে' আমরা আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছু পাইনে—ভারি ধাঁধা লাগিয়ে দিছলে হে! তোমার নিজেরও মাথা গুলিয়ে যায় নি?"

আমার মাথা খুবই গুলিয়ে গিয়েছিল সে সময়ে, কিন্তু এখন কি জবাব দিই? আবোল-তাবোল কতকগুলো বকে' গেলাম—নিজেই তার মানে বুঝিনে!

বন্ধু বললেন, 'শুনলে অবাক হবে, আমার চাকরটা পয়সা কামাবার এক নতুন ফিকির বার করেছিল। স্ত্রী যে জলে স্নান করতেন, সেই স্নান-করা জল সে লুকিয়ে আরবদের পাড়ায় ফের বিক্রি করে' দিত। মুক্তোটা সেই স্নানের টবেই কোন রকম করে' খসে' পড়ে গিয়ে থাকবে—জলের

[illegible] সেটাও মুলাদের জালায় ঢুকে পড়েছিল নিশ্চয়! তুমি পেলে কেমন [illegible]রে?"

"কি সর্ব্বনাশ! তাই না কি? আমি ওটা প্রায় গিলেই ফেলেছিলাম! যে পিপাসা!—তখন কি আর জ্ঞান ছিল?" স্বামীকে এই কথা বলে', পত্নীটির দিকে চাইতেই দেখি, তাঁর মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

তাতে কিন্তু আর এক ব্যক্তির কোন অসুবিধে হয় নি। তিনি 'একাডেমি'র বিজ্ঞান-পরিষদে 'এডেনে কয়লার খনি' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

দেয়াল-ভাঙা

মে মাসের সকাল বেলা ; বেশ গরম পড়িয়াছে। ঢালু মাঠগুলির উপর আলিপনা দেওয়ার মত 'আনিমনি' ফুল ফুটিয়াছে। পাহাড়তলীর শেষ দিকটা যেখানে অস্পষ্ট দেখাইতেছে সেইখানে চারিটা কোকিল পরস্পরে পাল্লা দিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে ; 'এল্‌ম'-গাছের সারির মধ্যে একটা 'ম্যাগপাই' পাখী বাসা বাঁধিতেছে, আর অনবরত বাজনার মত শব্দ করিতেছে।

এ হেন সময়ে কেজিয়া আন্‌উইন্ ও-পাড়ার বড় গিন্নি মিসেস পার্স-গ্লোভের জন্য একটা ঝুড়িতে করিয়া কয়েকটা উৎকৃষ্ট হাঁসের ডিম ভেট লইয়া চলিয়াছে। তার বাপের হাঁস প্রভৃতি পাখী পালন-করার যে ব্যবসায় ছিল তার সুনামের কারণ কেজিয়ারই বুদ্ধি ও পরিশ্রম, এজন্য সারা অঞ্চলটায় সকলেই তাহার নিকটে এ বিষয়ে পরামর্শ লইত। ইহা হইতে যাহা কিছু রোজগার হইত তাহা সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ সে ধনী বাপের একমাত্র কন্যা। সে তাই দিয়া ভালো ভালো পোষাক কিনিত। তার দেখাদেখি গ্রামের চাষাদের মধ্যে এ বিষয়ে রুচির উন্নতি হইয়াছিল।

আজ তার পরণে একখানি ফিকা-নীল রঙের অতি সুন্দর সুতী গাউন—তার ছিপ্‌ছিপে দেহটি বেশ করিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে, কোনখানে একটি খাঁজ নাই। গলার নীচে বুক পর্য্যন্ত একটা চওড়া সাদা লেস্। তার মাস্‌তুত বোন 'সারা' শহরে একখানি পোষাকের দোকান করিয়াছে—সে তাহাকে একটি প্যারিসের তৈরী হ্যাট উপহার পাঠাইয়াছে, সেইটি সে আজ পরিয়াছে সেটিকে দেখিলে মনে হয় যেন এক গোছা আপেল ফুল গাছ হইতে খসিয়া সবুজ জমির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সুন্দরী পাত্রীর জন্য যে অনেক বর জুটিবে, ইহা ত' খুবই স্বাভাবিক। অনেক গ্রাম্য যুবক সন্ধ্যার সময় তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতে লাগিল,—কেজিয়ার বাপের মুখে সেকালের সব গল্প শুনিতে! আসল উদ্দেশ্যটা অবশ্য তার যুবতী কন্যার সঙ্গসুখ ভোগ করা, আর ভেড়ার মত জুল্-জুল্-চোখে তাহার পানে কেবলই চাহিয়া থাকা। সে অনেকের বিবাহ-প্রার্থনা শুনিয়াছে এবং না-মঞ্জুর করিয়াছে। কেমন করিয়া তীব্র পরিহাস অথবা নির্দ্দোষ রসিকতার সাহায্যে হবু-প্রণয়ীর প্রেম একেবারে নষ্ট করিতে হয়, তাহা সে এতদিনে বেশ শিখিয়া লইয়াছে। জন্ হ্যান্কক্ নামে একটি ছোক্‌রার একবার কি দশা হইয়াছিল তাহা পাড়ার লোকে এখনও বলিয়া থাকে। কেজিয়া নিজে সেকথা কাহাকেও বলে নাই, কিন্তু সেই হতাশ প্রেমিকটি একদিন পাড়ার আড্ডাঘরে বসিয়া মদের মুখে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিল। একবার দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ কেজিয়াকে কিছুক্ষণের জন্য একা পাইয়া সে ক্ষীণ গদ্‌গদকণ্ঠে তাহাকে নিজের মনোভাব জানাইয়াছিল। সেই কথা শুনিয়া কেজিয়া যেন ভয়ানক ভয় পাইল, কিন্তু অতি কষ্টে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সে আস্তে আস্তে উঠিয়া এক বাল্‌তি ঠাণ্ডা জল আনিয়া হতভাগার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছিল। ছোক্‌রা যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন, পাছে পুনরায় বেসামাল হইয়া পড়ে, এজন্য এই কঠিন কথাগুলি তাহাকে শুনাইয়া দিল—"বাবা! বাঁচলাম! বাছা আমার!—আমি বলি, বুঝি তোমার হঠাৎ ফিটের ব্যামো হ'ল!"

কেবল একবার তার প্রাণে যেন কেমন একটু লাগিয়াছিল, সে যখন—পাশের গ্রামের এক ছোকরা, রেফ্ পারামুর, তার কাছে ঐ কথাটাই পাড়িয়াছিল। তারা দুটিতে একসঙ্গে স্কুলে পড়িত, তারপরেও অনেকদিন তার সঙ্গে বেটাছেলের মত করিয়া নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইত, পাখীর বাসা ভাঙ্গিতে যাইত। কেজিয়ার প্রাণটা যেন অজ্ঞাতে তার দিকে একটু ঝুঁকিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র এমন নিদারুণ ঠাট্টা করিয়াছিল, যে সে আর কখনও তার দিকে ঘেঁসে নাই। ছোক্‌রা মনে করিয়াছিল, তার অবস্থা খারাপ বলিয়াই কেজিয়া রাজী হইল না, কিন্তু সেই অবধি তাহার ভালোবাসা বাড়িয়াই গিয়াছিল; তবু দেখা হইলে সে যেন কেজিয়াকে গ্রাহ্যই করিত না।

বড় রাস্তার মোড়ে যেখানে 'হথর্ণ'-গাছগুলি খুব ঘন হইয়া উঠিয়াছে

সেইখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, সোজা রাস্তা দিয়া চলিলে তাহাকে এখনও মাইল দুই হাঁটিতে হইবে, কিন্তু যদি একটু বাঁকিয়া, বেড়ার ভিতর দিয়া, চুণে-পাথরের দেয়াল ডিঙ্গাইয়া সে পথটা সংক্ষেপ করিয়া লয়, তবে বড় গিন্নির বাড়ী পেঁাছিতে সিকি ঘণ্টাও লাগিবে না।

"তাই করি, যা' হয় হবে। সাম্‌নের জমিগুলো ত' রেফ্‌ পারামুরের! তা' সে কি আজ এইখানেই বসে' আছে? থাকে থাক্‌গে, আমি আর পারিনে, গরমে মরে' গেলাম!"

এই বলিয়া সে ঝুড়িটা মাটিব উপর নামাইল, তার পর গাছের আঁকা-বাঁকা গুঁড়িগুলার ফাঁক দিয়া কোনও রকমে গুড়ি মারিয়া চলিতে লাগিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই সে একটি ছোট নদীর ধারে আসিয়া পড়িল, তার ধারে ধারে অজস্র নানা রঙের ফুল ফুটিয়াছে। নদীটির উৎপত্তি-স্থানে একটা প্রকাণ্ড বেলে-পাথরের তলা হইতে ঝরণার জল লাফাইয়া উঠিতেছে। সেই-খানে আসিয়া সে মোড় ফিরিয়া একটি ফটকের দিকে চলিল। ফটক খুলিলেই সবুজ যবের ক্ষেত। সেই ক্ষেতের পাশ দিয়া খানিক দূব চলিয়া সে, সেই প্রথম, একটি উঁচু দেয়ালেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই দেয়াল পার হওয়া সহজ নয়। তাহার ওদিকের জমি এদিকের চেয়ে উঁচু; তার মাথা আল্‌গা কবিয়া গাঁথা, এবং তাহা কেজিয়ার হ্যাটের সবচেয়ে উঁচু ফুলটাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কেজিয়ার বয়স এখনও কাঁচা, দেহখানিও খুব চপল ও চটুল, তাই সে ভয় পাইল না। ডিমের ঝুড়িটা একটা শক্ত জায়গায় রাখিয়া সে দেয়াল ধরিয়া উঠিতে লাগিল। যতটা ভাবিয়াছিল, সত্যকার বিপদ তার চেযে বেশি; তার পায়ের চাপে চুণে-পাথরের গা যেন পর্দ্দায় পর্দ্দায় ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল।

প্রায় দেয়ালের মাথায় উঠিয়া বসিয়াছে, এমন সময় তাহার বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল, কারণ তখন তাহার দেহের ভারে দেয়ালটা দুলিতে শুরু করিয়াছে! ও পাশের উঁচু জমির নরম ঘাসের উপর লাফাইয়া পড়িতেই, প্রায় ছয়-হাত গাঁথুনি সবুজ যবক্ষেতের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভয় পাইলেও তাহার আরক্ত মুখ দুষ্টামীর খুসিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে! ও টুকু গেঁথে

তুল্‌তে রেফ্‌ বেশ একটু জব্দ হবে! আর কারো হ'লে নিজেই গিয়ে বল্‌তাম যে, ও আমারি কাজ, এই নাও মেরামত করবার খরচ দিচ্ছি। কিন্তু এ যখন সেই মুখপোড়ার, তখন ভালই হয়েছে, আমার গায়ের ঝাল অনেকটা মিট্‌বে।"

হঠাৎ সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, কারণ, দেখিল—প্রায় ছোঁয়া যায় এত কাছে, রেফ্‌ পারামুর, একটি ফুলে ভরা 'ক্র্যাব্‌'-গাছের তলায় বসিয়া ঘরের চালার জন্য কাঠের পেরেক ছুলিতেছে। সে মুখ বিকৃত করিয়া হাসিতেছিল—সে যেন একটা দৈত্যের মত বসিয়া আছে।

সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "কেজিয়া, যা বল্‌লে তা' শুনেছি। কথাগুলো মোটেই ভদ্র নয়। যাই হোক, আমাদের একটা নিয়ম আছে, দেয়াল যে ভাঙে তাকেই তুলে দিতে হয়। তোমাকে ওটা তুলে' দিতে হবে।"

কেজিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া, যেন গ্রাহ্যই করে না এমন ভাবে বলিল,

"আমি পার্‌ব না!"

"কিন্তু পার্‌তে যে হবেই, আমি যে ছাড়ব না!"

কেজিয়ার মুখখানা লাল্‌ হইয়া উঠিল—বলিল,

"এ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে একবার 'না' বললে 'হাঁ' বলাতে পারেনি—তোমার ত' আস্পর্দ্ধা কম নয়! সর, পথ ছাড়,—আমাকে যেতে দাও বল্‌ছি!"

"সে আমি পারব না। তুমি পরের জমিতে ঢুকেছ—সে হুঁস্‌ আছে? ওই যে কাঠখানায় লেখা রয়েছে "অনধিকার-প্রবেশের জন্য অভিযুক্ত করা যাইবে"—তা' কি তোমার চোখে পড়ে নি?"

কেজিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি এবার চেঁচাব কিন্তু! তা' হলেই কেউ না কেউ এসে পড়বে।"

"সেটি মনেও কোরো না, কেউ শুন্‌তে পাবে না। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়।"

"তুমি আজ আমাকে ভারী বাগে পেয়েছ—না! আমার সাতজন্মে যে কাজ করিনি, তাই আজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাও?—নির্দ্দয় পশু কোথাকার!"

রেফ্ পারাম্যুর কেমন একটা অর্থহীন স্নেহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল,

"এতে তোমার উচিত শিক্ষা হবে, কেজিয়া। একদিন তুমি আমায় বড় অপমান করেছিলে, আজ আমি তার শোধ তুল্‌ব। ওই বড় পাথরগুলো আগে তুল্‌তে হবে—নাও, চট্‌পট্ লেগে পড়।"

সেই বিবাহ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার পর আজ এই প্রথম কেজিয়া তাহার চোখে চোখ তুলিয়া চাহিল। রেফ্ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শক্তভাব ধারণ করিল। সে যে সত্যই এত সুন্দর তাহা যেন কেজিয়া এতদিন জানিত না—আজ তাহার সেই জ্যাকেট ও ওয়েষ্টকোট্‌-খোলা দেহের উপর শাদা ধব্‌ধবে ঘর্ম্মসিক্ত শার্টখানি দেখিয়া কেজিয়া বুঝিতে পারিল, আশপাশের সকল গ্রামের মধ্যে পুরুষ-নামের উপযুক্ত যদি কেহ থাকে তবে সে এই।

সে তখন তাহার দুই হাতের হলুদ-রঙের দস্তানা খুলিয়া ফেলিল। তাহার ঠোঁট দুখানি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, সে কাঁপুনির অর্থ বুঝা দুষ্কর—সে হাসিবে কি কাঁদিবে নিজেই ঠিক করিতে পারিল না, তাহার চোখদুইটি যেন জ্বলিতেছে।

একবার অস্ফুট স্বরে বলিল, "তোমাকে আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে! আচ্ছা যদি করতেই হয়, তবে না হয় করি। কিন্তু এত পরিশ্রমে আমি বাঁচব না।"

শুনিয়া রেফ্ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "সে পাপের বোঝা আমি বইতে চাইনে। কাজটার মধ্যে যেটুকু বেশী মেহন্নৎ, সে না হয় আমিই করব। বড় বড় পাথরগুলো আমিই তুলবো 'খন, তুমি যেগুলো সব চেয়ে ছোট সেইগুলোই তুলে দিও।"

তাহারা নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। রেফ্ দেখিয়া খুশী হইল

[illegible] যে পাথরগুলা আনিতেছে তাহা আপেল ফলের চেয়ে বড় নয়, এবং এক একটি আনিতে তাহার পাঁচ মিনিট লাগিতেছে। প্রথম দুই সারি গাঁথা না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথা বলিল না।

অবশেষে রেফ বলিল, "এমন ঢিমে-তেতালায় কাজ করলে কাজ সারা হ'তে যে সন্ধে হয়ে যাবে! এখনই ত' খাবার সময় হ'ল। আমার রুটি, পনির ও বিয়ার মদ আছে—খাবে? ওই গাছ তলায় রেখেছি—চল, ভাল ক'রে খাওয়া যাক।"

কেজিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "লোকে শুনলে বলবে কি? আমি সে কিছুতেই পারব না।"

রেফ্ অতি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "পারতেই হবে! আমি কাউকে ব'লে দেব না।"

সুতরাং তাহাকে বাধ্য হইয়া খাইতে হইল। রুটি ও পনির তাহার গলায় বাধিতে লাগিল, বিয়ার সে খাইল না বলিলেই হয়। সে তখনই আবার কাজ করিবার জন্য উঠিতে গেল, রেফ্ তাহাকে ধরিয়া আরও কিছুক্ষণ পাশে বসাইয়া রাখিল।

"খাওয়ার পরে একটু পাইপ না খেলে আমার চলে না। ততক্ষণ বসে' বসে' ছেলেবেলাকার গল্প করি এস। একবার একটা 'হার্ণ' পাখী মেরে তার ঝুঁটিটা কেটে তোমায় দিয়েছিলাম—মনে পড়ে? পাখীটা গাছে আট্‌কে গিয়েছিল—হ্যাসন্-বাগানের সবচেয়ে উঁচু গাছের মগ্‌ডালে উঠে' আমি সেটাকে নামিয়ে এনেছিলাম।"

কেজিয়া অতিশয় ক্রোধভরে বসিয়া রহিল—এই সব মন-ভুলানো কথা তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। একটু পরেই সে জোর করিয়া উঠিয়া আবার পাথর কুড়াইতে লাগিল, এবার সে আরও মন দিয়া কাজ করিতে লাগিল। কিন্তু যে কারণেই হোক, কেজিয়া যতই তাড়াতাড়ি করে, রেফ্ ততই কাজে ঢিল্ দেয়! বেলা যখন চারিটা বাজিল তখন গর্ত্তটার অর্দ্ধেক মাত্র সারা হইয়াছে।

এবার সে সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল,—শুনিতে পাইয়া রেফের নিঃশ্বাস আরও দ্রুত পড়িতে লাগিল। সে অতি কোমল কণ্ঠে বলিল,

কেজিয়া, ভাই, তোমাকে বড্ড খাটিয়ে নিয়েছি! আচ্ছা তুমি তবে যাও, বাকিটুকু আমি একাই সেরে ফেল্‌তে পারব।"

সে কথায় কাণ না দিয়া কেজিয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া আরও শীঘ্র শীঘ্র পাথর তুলিতে লাগিল। তার এই জিদ দেখিয়া রেফ্‌ও হাত চালাইয়া দিল। আর দুই ঘণ্টার মধ্যেই দেয়াল-গাঁথা শেষ হইল।

তখন কেজিয়া তাহার ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তাহার মুখে আর বাক্য ছিল না, মাথাটি যেন সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। রেফের ভয় হইল, বুঝি সে একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। সেজন্য সে প্রাণে বড় দুঃখ পাইল।

সে দ্রুতপদে তাহার পিছু লইল এবং ফটক পার হইবার পূর্ব্বেই তাহার পার্শ্বে আসিয়া পৌছিল।

সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "কেজিয়া, আমায় ক্ষমা কর!" কেজিয়া ঝুড়িটি মাটিতে নামাইয়া নিজের হাত দু'খানি তাহাকে দেখাইল,—স্থানে স্থানে নোন্‌ছা পড়িয়াছে, আঙুলের মুড়িগুলায় রক্ত পড়িতেছে! রেফ্‌ চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

"কি দুঃখই তোমাকে দিয়েছি, কেজিয়া! আমায় ক্ষমা কর,—করবে না?"

হঠাৎ কেজিয়ার মুখখানা প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—বাধ-বাধ কণ্ঠে বলিল,

"তুমি একটা পাষণ্ড! তবু তোমায় আমি ক্ষমা করলাম। আর কথ্‌খনো তোমার দেয়াল আমি ভাঙবো না।"

রেফ্‌ আরও নিকটে আসিয়া তাহাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। বলিল,

"তোকে ভালবাসি বলেই ত' এ কাজ করেছি, নইলে করতাম কি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, রেফ্‌! তোমারই জিৎ।" বলিয়া কেজিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিল। রেফ্‌ তাহার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া চলিল।

———•———

খোলা-জানালা

(ভৌতিক গল্প)

মেয়েটির বয়স পনেরো, খুব সপ্রতিভ,—আগন্তুককে একবার মাত্র আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, "পিসিমা এখনই নেমে আসবেন, আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না, মিঃ নুটেল; ততক্ষণ আমার সঙ্গেই আলাপ ক'রে খুশি হবার চেষ্টা করুন"।

ফ্রাম্‌টন নুটেল ইহার উত্তরে এমন দুই চারিটি শিষ্ট বাক্য বলিতে চেষ্টা করিলেন, যাহাতে উপস্থিত ভাইঝিটির মন খুশি হইয়া উঠে, অথচ অনুপস্থিত পিসিমার গৌরব লাঘব না হয়। তাঁহার মত ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিয়া বেড়ানো যে আদৌ সুফলপ্রদ হইবে না, সে বিষয়ে তাঁহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না; স্বাস্থ্যলাভের জন্যই তিনি এই নূতন স্থানটিতে সম্প্রতি আসিয়াছেন।

এই নিভৃত পল্লীটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সেখানে গিয়ে যা করবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি,—কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে না, দিনরাত চুপটি ক'রে ঘরের ভিতর বসে থাকবে। তাতে তোমার মনের অসুখ আরও বেড়ে যাবে। আমি যাঁদের যাঁদের চিনি, তাঁদের নামে চিঠি দিচ্ছি, সকলের সঙ্গে পরিচয় কোরো—যতটা মনে পড়ে, তাঁদের কেউ কেউ সত্যিকার ভাল লোক।"

ফ্রাম্‌টন ভাবিতেছিলেন, আজ যে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছেন তিনি সেই ভালো লোকদের মধ্যে পড়েন কিনা।

আলাপটা একটু বেশীক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিতেছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল, "এখানকার অনেককেই চেনেন বোধ হয় ?"

"প্রায় কাউকেই নয়। আমার দিদি প্রায় চার বছর আগে এখানকার রেক্টরের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। তাই তিনিই যা আমার সঙ্গে খানকয়েক পরিচয়পত্র দিয়েছেন।" ভদ্রলোক শেষ কথা কয়টি একটু দুঃখের সহিতই বলিলেন।

তখন সেই অতি সপ্রতিভ মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "তা হলে আমার পিসিমার সম্বন্ধেও আপনি কিছুই জানেন না ?"

আগন্তুককে তাহা স্বীকার করিতেই হইল, বলিলেন, "না, কেবল তাঁর নাম আর ঠিকানা মাত্র জানি।" তাঁহার মনে এমন প্রশ্নও জাগিতে-ছিল যে গৃহস্বামিনী সধবা না বিধবা ? ঘরখানির চেহারা দেখিয়া কিন্তু মনে হয়, এ ঘরে পুরুষেরাই সর্ব্বদা চলাফেরা করিয়া থাকে।

"পিসিমার জীবনের সেই ভয়ানক ঘটনা, তিন বছর আগে—ঠিক এইদিনেই ঘটেছিল, আপনার দিদি চ'লে যাওয়ার কিছু পরেই।"

"ভয়ানক ঘটনা !—তাঁর জীবনের ?"—ফ্রাম্‌টন একটু চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন। এমন শান্ত স্তব্ধ পল্লীপ্রদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদের জীবনে কোনরূপ ভীষণ কিছু ঘটিতে পারে বলিয়া তো মনে হয় না। ভদ্রলোক একটু দমিয়া গেলেন।

"এই অক্টোবর মাসেও আমরা ঐ জানালাটা কেন খুলে রেখেছি, তা ভেবে আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছেন।"—বলিয়া মেয়েটি একটি বড় জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। জানালাটির নীচে একটি প্রশস্ত ঘাসের জমি দেখা যাইতেছে।

"হাঁ—না—তা' এ সময়ের পক্ষে দিনটা বেশ গরমই বলতে হবে। তবু ঐ জানালার সঙ্গে সেই দুর্ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে না কি ?"

"তিন বছর আগে, ঠিক এই দিনে, আমার পিসেমশাই আর দুই কাকা ওই জানালা দিয়েই সমস্ত দিনের মত শিকার করতে বেরিয়ে গেছলেন।* তাঁরা আর ফেরেন নি। বিলের ধারে যেখানে খুব কাদাখোঁচা পাওয়া যায়,

* ও দেশে ঘরের জানালায় গরাদে থাকে না।

সেইদিকে যাবার পথে এক জায়গায় চোরাবালির মত একটা প্রকাণ্ড পাঁকের কুণ্ড ছিল, না জেনে তার উপর দিয়ে যেতে গিয়ে তিন জনেই একেবারে তলিয়ে গেলেন। সেবার গ্রীষ্মকালে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, তাই অন্য বছর যে সব জায়গায় কোনও বিপদ থাকে না, সে বছর সেই রকম জায়গাতেই পায়ের তলায় মাটি ব'সে গেল—আগে থেকে জানবার যো ছিল না। তাঁদের দেহও আর পাওয়া যায় নি, সেইটেই হ'ল আরও ভয়ানক।" এইখানে মেয়েটির সেই শক্ত সপ্রতিভ ভাব আর রহিল না, সাধারণ মানুষের মতই তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। "বেচারী পিসীমা আমার! সেই থেকে কেমন যে হয়ে গেলেন! তাঁর এখনও বিশ্বাস, নিশ্চয় তাঁরা ফিরে আসবেন; যেমন গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই ক'রেই—তেমনই অভ্যাসমত ঐ জানলা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকবেন; তাঁদের সেই পোষা কুকুরটাও সঙ্গে সঙ্গে আসবে। কুকুরটাও সঙ্গে ছিল কিনা—তারও কোন খবর আর পাওয়া যায়নি। এই জন্যেই, রোজ এমনি সময়ে, যতক্ষণ না অন্ধকার হয়ে আসে, ওই জানালাটা খুলে রাখা হয়। আজ ঠিক সেইদিন ব'লে পিসীমা একটু বেশী ব্যস্ত, বেশী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। আহা, পিসীমার কি অবস্থাই ঘটল! সেইদিনকার সেই কথা ছাড়া আর কথা নেই—সেই শিকারে যাওয়ার গল্প আর শেষ হ'ল না। পিসেমশাই হাতের উপর সেই সাদা ওয়াটারপ্রুফ কোটটা চাপিয়েছেন, আর রণি (আমার ছোটকাকা) সেই গানটা গাইতে গাইতে চলেছেন— 'বার্টি, তুমি লাফাও কেন'। পিসীমা ঐ গানটা মোটেই পছন্দ করেন না, তাই ছোটকাকা তাঁকে ক্ষেপাবার জন্যে কেবলই ওই গানটা গাইতেন। বলতে কি, আমারও ঠিক এমন নিঃঝুম সন্ধ্যেবেলাটিতে গা'টা যেন থেকে থেকে ডোল্ হয়ে ওঠে, মনে হয় ওরা যেন এখনই ওই জানলাটার ভিতর দিয়ে ঘরে এসে উঠবে।"—বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিয়া সে থামিয়া গেল।

ঠিক এই সময়ে তাহার পিসীমা খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া, অতিথিকে এতক্ষণ বসাইয়া রাখার জন্য একরাশ ত্রুটী স্বীকার করিলেন। বলিলেন, "ভেরা যা গল্প করতে পারে! আপনার সময় নিশ্চয় মন্দ কাটেনি?"

"হাঁ, ওঁর কথাবার্তা বড়ই মুগ্ধকর বটে।"

"জানলাটা খোলা রয়েছে ব'লে, আপনার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না

তো ?”—কথাগুলি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই বলিলেন। “আমার স্বামী আর দুই ভাই আজ শিকারে বেরিয়েছেন, এখনই ফিরবেন। ওই জানলাটা দিয়েই তাঁরা যাওয়া-আসা করেন। আজ তাঁরা এখানকার বিলে কাদাখোঁচা শিকার করতে গেছেন; কাজেই আমার এই গাল্‌চেগুলোর আজ যা চেহারা হবে! আপনাদের—পুরুষদের—কি বিশ্রী স্বভাব! সত্যি নয়, বলুন?”

এমনই খুব প্রফুল্লভাবে তাঁহার গল্প চলিতে লাগিল। কেবল শিকারের গল্প; এ অঞ্চলে এ সময়ে পাখী বড় কম; শীতকালে পাতিহাঁস খুব পাওয়া যায়—এই সব কথা। শুনিয়া ফ্রাম্‌টনের অবস্থা ক্রমেই দারুণ হইয়া উঠিতে-ছিল। এই ভয়াবহ প্রসঙ্গ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তিনি একবার অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলেন, মহিলাটির মন আদৌ তাঁহার দিকে ছিল না; তাঁহার চোখ দুইটি কেবলই, অতিথিকে ছাড়াইয়া, সেই খোলা জানালা এবং জানালার বাহিরে সেই মাঠখানির পানে ছুটিতেছিল। বৎসরের ঠিক এই দিনটিতেই তিনি যে এ বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছেন, ইহার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

ফ্রাম্‌টনের একটি ভুল ধারণা ছিল, এ ভুল ধারণা অনেকেরই আছে যে, যাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত—যাহাদের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয়—তাহারা মানুষের অসুখের খবর শুনিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে—সে যতই সামান্য অসুখ হোক; কেমন করিয়া হইল, কি করিয়া সারিল—না জানিয়া ছাড়িবে না। তাই ফ্রাম্‌টন গত্যন্তর না দেখিয়া অবশেষে নিজের সম্বন্ধে বলিয়া ফেলিলেন—

“ডাক্তাররা সকলেই বলেছেন, আমার এখন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার; কোনরকম মানসিক উত্তেজনা তো নয়ই, শরীরের উপরেও একটু জোর-জুলুম চলবে না।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া মনে হইল, যেন একটু ফল হইয়াছে, তাই বলিয়া চলিলেন—“কেবল পথ্যের বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পারেন নি।”

“তাই নাকি?”—গলার স্বরে বোঝা গেল, মহিলাটি হাই তুলিতে-ছিলেন, শেষে তাহাই চাপা দিবার ছলে ঐ কথাটি বলিলেন। ইহার পর

তিনি যেন একটু সজাগ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সে আগন্তুকের কথা শুনিবার জন্য নয়। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

"এই যে—এতক্ষণে—ওঁরা সব এলেন! ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। আর একটু দেরী হ'লে চায়ের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যেত। দেখ, দেখ! পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে কাদামাখা! মাগো!"

ক্রাম্‌টনের দেহ সামান্য একটু কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি ভাইঝিটির দিকে একবার চাহিলেন, সে চাহনিতে মেয়েটির দুঃখে তাঁহার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইল। মেয়েটিও ভীতিবিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে খোলা জানালার ভিতর দিয়া মাঠের দিকে চাহিয়াছিল। এইবার ক্রাম্‌টনের বুকের ভিতরটা হিম হইয়া আসিল; একটা কি-জানি-কি-রকমের ভয়ে চকিত হইয়া তিনি তাঁহার আসন ঘুরাইয়া সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তিনটি মূর্ত্তি ঘাসের জমিখানির উপর দিয়া হাঁটিয়া এই জানালার দিকেই আসিতেছে। তাহাদের তিন জনের হাতেই বন্দুক, কেবল একজনের কাঁধের উপরে একটা সাদা রঙের ওয়াটারপ্রুফ কোট অতিরিক্ত বোঝার মত চাপান রহিয়াছে; সকলের পিছনে একটা কটা রঙের স্পেনিয়েল কুকুর আসিতেছে। তাহারা অতিশয় নিঃশব্দে বাড়ির নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, এবং সহসা অতিশয় ভাঙা-গলায় একজন যুবক যেন গাহিয়া উঠিল—"বার্টি, তুমি লাফাও কেন!"

ক্রাম্‌টন পাগলের মত তাঁহার হ্যাট ও ছড়িগাছটি হাতড়াইয়া হস্তগত করিলেন; তারপর সেই ঊর্দ্ধশ্বাস গতির মধ্যে, হল-ঘরের দরজা, কাঁকর-বিছানো রাস্তা ও সর্ব্বশেষে ফটক প্রভৃতি পথের চিহ্নগুলা একে একে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়িল। রাস্তার উপরে একজন সাইকেল-আরোহী ধাক্কা বাঁচাইতে গিয়া সবেগে পাশের বেড়ার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

সাদা ওয়াটারপ্রুফধারী পুরুষ জানালার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "পৌঁছনো গেছে এতক্ষণে! কাদা মন্দ লাগে নি, কিন্তু শুকিয়ে গেছে সবটাই। ও লোকটা কে বল তো? আমাদের আসতে দেখে অমন ক'রে ছুটে বেরিয়ে গেল কেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "কে জানে বাপু, কে একজন মিঃ হুটেল; এমন

মানুষও দেখি নি! কেবল অসুখের কথা ছাড়া আর কথা নেই। তুমি আসবামাত্র একেবারে ভোঁ-দৌড়,—না করলে একটা নমস্কার, না ব'লে গেল কিছু! যে রকম ক'রে গেল—মনে হয়, যেন ভূত দেখেছে।"

ভাইঝিটি অতিশয় নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিল, "আমার মনে হয়, এর কারণ ওই কুকুরটা। আমাকে বলছিলেন, কুকুর দেখলে ওঁর বড় ভয় করে। একবার নাকি, ভারতবর্ষে গঙ্গানদীর তীরে ওঁকে একপাল নেড়ি-কুত্তায় তাড়া করেছিল, শেষে একটা সদ্য-খোঁড়া গোরের ভিতর ঢুকে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন। বললেন, সারারাত্রি সেই গোরের উপরে দাঁড়িয়ে কুকুর-গুলোর কি চীৎকার, কত রকমের যে ডাক! সে আর থামে না। এতে মানুষের প্রাণ খাঁচাছাড়া না হয়ে পারে? বেচারীর দোষ কি?"

রোমাঞ্চকর ঘটনা হাতে হাতে সৃষ্টি করিবার বিশেষ দক্ষতা ছিল এই মেয়েটির।

পিঁপড়ায়-মানুষে

"উহারা যদি এ পথ ধরিয়া আসে—না আসিবারই বা কারণ কি, তবে জোর দুইদিনের মধ্যেই আপনার আবাদে পৌঁছিয়া যাইবে।"

লাইনিন্‌গেন প্রশান্তভাবে একটা মোটা চুরুট চুষিতে লাগিলেন; কোন জবাব না করিয়া চিন্তাকুল জেলা-কমিশনারের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে ঠোঁট হইতে চুরুটটি সরাইয়া লইয়া সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিলেন, পরে মৃদুস্বরে কহিলেন—

"আপনি মহানুভব, আমাকে এই সংবাদটা দিবার জন্যই আপনি সারাটি পথ সাইকেলে চড়িয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আপনি যখন আশা ছাড়িয়া দিতে বলিতেছেন, তখনই যে আমি আরও বেশী উৎসাহ বোধ করিতেছি। ন. মহাশয়, একপাল বন্য মহিষও আমাকে আমার আবাদ থেকে এক পাও নড়াইতে পারিবে না!"

"লাইনিন্‌গেন!"—জেলা-কমিশনার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আপনি উন্মাদ! আপনি কি মনে করেন তাহারা জন্তু যে, আপনি তাহাদের সঙ্গে লড়িবেন?—সে একটা অন্ধ-শক্তি—ভগবানের মার! দৈর্ঘ্যে দশ এবং প্রস্থে দুই মাইল জুড়িয়া পিঁপড়ার সারি—শুধু পিঁপড়া আর পিঁপড়া! এক একটি যেন মূর্ত্তিমান যমদূত; তিনবার থুথু ফেলিতে যে সময় লাগে তাহারই মধ্যে উহারা একটি হৃষ্টপুষ্ট মহিষের সমস্ত মাংস খাইয়া হাড়খানা মাত্র অবশিষ্ট রাখিবে। আমার কথা শুনুন, আপনি যদি এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ছাড়িয়া না যান, তবে আপনার ঐ আবাদের মত আপনারও কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না।"

লাইনিন্‌গেন বিদ্রূপ-হাস্য করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ভগবানের মার, না আর-কিছু! আমি অসহায় স্ত্রীলোক নই যে, এইরূপ প্রাকৃতিক উপদ্রবের ভয়ে পলায়ন করিব। তিন বৎসর পূর্ব্বে যেদিন আমি এই আদর্শ-কৃষিকুঠী স্থাপন করিয়া আবাদের কাজ সুরু করিয়াছিলাম, তখনই সকল সম্ভব-অসম্ভব দুর্য্যোগ সম্বন্ধেই আমি ভাবিয়াছি; আজ, পিঁপড়া কেন, যে কোন বিপদের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

লাইনিন্‌গেন জেলা-সাহেবকে নদীতীর পর্য্যন্ত পেঁছাইয়া দিলেন। সরকারী জাহাজটি নোঙর-বাঁধা ছিল। জাহাজ ছাড়িয়া গেল। বহুক্ষণ নদীর ঐ বাঁকে জাহাজটি অদৃশ্য হইয়া গেছে, লাইনিন্‌গেন যেন তখনও তাঁহার আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছেন—"আমি বলিতেছি, আপনি উহাদের জানেন না, চিনেন না!"

ঐ শত্রুদের কাহিনী লাইনিন্‌গেনেরও অজানা ছিল না, এবং আত্মরক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে-ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন, তাহাতে এই ঘনায়মান দুর্য্যোগ কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়ই। তাছাড়া, আবাদের তিন বৎসরের মধ্যে অনাবৃষ্টি, বন্যা, প্লেগ এবং আরও কত বিপাকেই না তিনি পড়িয়াছেন—কিন্তু বিধির সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা তিনি জয় করিয়াছেন; সেই দুর্দ্দিনে আর আর আবাদীরা উদ্ধারের কোন উপায় বা ব্যবস্থাই করিতে পারে নাই। এই নিরবচ্ছিন্ন একটানা সাফল্যের মূলে ছিল তাঁহার জীবনব্যাপী এই একটি নীতির প্রতি সুদৃঢ় আস্থা—"মানুষের বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই, তবেই প্রকৃতিকে জয় করা যাইবে।" তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুর্নিবার পিঁপড়ার চেয়ে তিনি বহুগুণে শক্তিমান।

ঐদিন অপরাহ্নেই লাইনিন্‌গেন তাঁহার কর্ম্মচারীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন, আর কাহারও নিকটে এই খবর শোনা পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন না। তাহাদের অনেকেই এই জেলার বাসিন্দা; "ঐ পিঁপড়া আসিতেছে!" শুনিবামাত্রই তাহারা ভীত ত্বরিতপদে পলায়ন করিত। কিন্তু এমনই ছিল লাইনিন্‌গেনের প্রতি তাহাদের আস্থা, তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতি অবিচলিত ভক্তি যে, লাইনিন্‌গেন যেমন শান্তভাবে তাহাদিগকে দুঃসংবাদটি জানাইলেন, তেমনই শান্ত ও স্থির হইয়া তাহারা প্রভুর দেওয়া সেই খবর ও আসন্ন সংগ্রামের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সত্যসত্যই উহারা দেখা দিল। পরস্পর বিপরীত দিক হইতে ভীত বন্যপশুদের ত্রস্ত পলায়ন উহাদের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া গেল; চিতা বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলা শান্তস্বভাব নিরীহ মৃগের পাশ দিয়া দারুণ ভয়ে হতজ্ঞানের মত নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে।

অসংখ্য পিঁপড়া সারিবদ্ধভাবে পাহাড় বাহিয়া হুড়মুড় করিয়া আবাদের অভিমুখে নামিয়া আসিতেছে; আবাদের চতুষ্পার্শ্বে যে জলপূর্ণ পরিখা ছিল তাহা হইতে কিছু দূরে বামে ও দক্ষিণে তাহারা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তারপর নদীর দিকে বাধা পাইয়া তীর ধরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

আবাদের তিন দিকে ঘোড়ার নালের মত বিরাট পরিখা বেষ্টন করিয়া আছে। বার ফুট দীর্ঘ এই গড় যখন শুকাইয়া যায়, মানুষ এবং পশু সহজেই উহা পার হইতে পারে। নালের প্রান্তদুইটি নদীগর্ভে মিশিয়া আবাদের উত্তর অর্থাৎ চতুর্থ পার্শ্বের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। উহার মধ্যবর্ত্তী কুঠীবাড়ী এবং অন্যান্য গৃহগুলির শেষে একটি বাঁধ রহিয়াছে। ঐ বাঁধ খুলিয়া দিলে নদীর জলে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইত। লাইনিন্‌গেন বাঁধ খুলিয়া দিয়া আবাদের চতুষ্পার্শ্বে জলের বেষ্টনী সৃষ্টি করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ভেলা তৈয়ার করিবার বুদ্ধি না থাকিলে পিঁপড়াদের আবাদে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। প্রথমে স্ত্রীলোক ও শিশু, পরে পশুগুলাকে নদীর বাঁধের উপর স্থানান্তরিত করা হইল।—ধ্বংসকারীদের প্রস্থান না করা পর্য্যন্ত তাহারা ঐস্থানে নিরাপদেই থাকিবে।

কুঠিবাড়ীটি যে উচ্চস্থানের উপর অবস্থিত তাহাকে বেড়িয়া যে আর একটা ছোট গড় কাটা হইয়াছিল তাহা আগাগোড়া সিমেণ্টে বাঁধানো। সর্ব্বশেষে লাইনিন্‌গেন সেই গড়টি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ঐ উচ্চভূমির উপরে আছে গোলাবাড়ী, আস্তাবল এবং আরও বহুরকমের কোঠাবাড়ী। অতঃপর তিনটি পেট্রোল-ট্যাঙ্কের নল দিয়া গড় পূর্ণ করা হইল। কোন অলৌকিক উপায়ে পিঁপড়ার দল জল পার হইয়া আবাদে পৌঁছিলেও এই "পেট্রোলের প্রাচীর" অবরুদ্ধ অধিবাসীদের দুর্গ-প্রাচীরের মত হইবে। লাইনিন্‌গেন মনে মনে এই জল্পনাই করিতেছিলেন।

শত্রুদের সর্ব্বপ্রথম বাধা দিতে হইবে বড় পরিখার ধারে; গড়ের পাড়

ধরিয়া লোকগুলিকে দূরে ও নিকটে স্থাপন করা হইল। তারপর নিজের ঘরে ফিরিয়া তিনি দোলনায় শুইয়া তন্দ্রাবেশে পাইপ টানিতে লাগিলেন। এমন সময় চর আসিয়া জানাইল—বহুদূরে দক্ষিণে পিঁপড়া দেখা দিয়াছে।

তখনই উঠিয়া লাইনিন্‌গেন ঘোড়ায় চাপিয়া দক্ষিণমুখে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। যতদূর দৃষ্টি যায় পর্ব্বত-ভূমির ঊর্দ্ধদেশে একটি কৃষ্ণ রেখা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে; ওই কালো ছায়া ক্রমশঃ দীর্ঘতর ও বিশালতর হইয়া পাহাড়ের ঢালু পৃষ্ঠ আচ্ছন্ন করিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, তৎপর নিম্নদেশে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দীর্ঘ তরুশ্রেণীর ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে, কে যেন সবুজ ঘাসগুলি বিরাট কাস্তে দিয়া কাটিয়া দিতেছে; সেই চলমান ছায়া দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দ্রুতবেগে নিকটতর হইতে লাগিল।

বাঁধের পশ্চাতে, ওই শয়তান-সেনা ও জলপূর্ণ খাতের মধ্যে ব্যবধান যতই হ্রাস পাইতে লাগিল, ততই আবাদবাসীরা ভয়ে বাক্যহারা হইয়া গেল। সেই ভয়াল জনতা আরও নিকটে পেঁছিবার পূর্ব্বেই এই অংশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাহারা সন্দিহান হইয়া উঠিল। লাইনিন্‌গেন নিজেও সেই উদ্বেগের তাড়না হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। সম্মুখে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত দংষ্ট্রা তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আর—একটা অতি ক্ষুদ্র পরিখামাত্র ব্যবধানে তিনি ও তাঁহার ভৃত্যগণ অপেক্ষা করিতেছেন; 'তিনবার থুথু ফেলিতে যেটুকু সময় লাগে' তাহার মধ্যেই সকলে হাড়-পর্য্যন্ত মাংসহীন হইয়া যাইবে।

লাইনিন্‌গেনের চোয়াল দৃঢ় হইয়া উঠিল,—তাহারা এখনও তাঁহাকে ধরিতে পারে নাই, দেখিবেন কেমন করিয়া ধরে! যতক্ষণ তাঁহার বুদ্ধিনাশ না হয়, ততক্ষণ যমই হউক, আর পিশাচই হউক—কাহাকেও তিনি গ্রাহ্য করিবেন না।

(২)

শত্রুরা সুসম্বদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে—মানব-সৈন্য যতই সুশিক্ষিত হউক না কেন, এমন শত্রুর প্রতিরোধ করে সাধ্য কি? সোজা একমুখে তাহারা ক্রমশঃ খাতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সম্মুখে বাধা আছে,—যেন চরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া, দুইটি সৈন্যদল মূল বাহিনী হইতে পৃথক হইয়া গেল, এবং

খাতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কূট-বুদ্ধির সাহায্যে অবরোধ সমাধা করিতে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে, তাহারা নিশ্চয় ভাবিয়াছে, পার হইবার একটা কৌশল অবশ্যই আবিষ্কার করা যাইবে। তারপর দুই পাশের সৈন্যেরা চলিতে সুরু করিল; কিন্তু মধ্যস্থল এবং দক্ষিণাংশের সৈন্যেরা স্থির হইয়া রহিল। অবরুদ্ধ অধিবাসীরা এক্ষণে ঐ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত লোহিত-কৃষ্ণ পিঁপড়াগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল।

ইহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য যে, পিঁপড়া তো ছার, জন্তুদেরও চিন্তাশক্তি থাকিতে পারে। আসন্ন দুর্য্যোগের দারুণ দুশ্চিন্তায়, অধিবাসীদের বর্ব্বর-সুলভ বুদ্ধির তো কথাই নাই—এমন কি, লাইনিন্‌গেনের সভ্য-বুদ্ধিও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সকলেরই মনে হইতেছে—ওই বিশাল বন্যার মত পিঁপড়ার দল যেন একটি মাত্র কামনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে—'সম্মুখে খাত থাক বা না থাক, যত বিঘ্নই থাকুক, তোমাদের দেহগুলি আমাদের চাই-ই—আমরা পৌঁছিবই'। অভিযান সুরু হইল।

বেলা চারি ঘটিকার সময় শাখা-সৈন্যদুইটি পরিখা-প্রান্তে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইল—সম্মুখে নদীর অকূল বিস্তার। যেন কোন্ গোপন সঙ্কেতে সমগ্রসেনাবাহিনীতে এই খবর পৌঁছিয়া গেল। দূরে পরিখার ধারে অশ্বারূঢ় লাইনিন্‌গেন· মধ্যবর্ত্তী পিঁপড়া-সৈন্যের ব্যস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করিলেন—তাহাতে মনে হয়, সম্মুখে বাধার খবর জানিতে পারিয়া তাহাদের মধ্যে ঐ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। খাত অতিক্রম করিবার পথ না পাইয়া পিঁপড়াগুলি যেন অন্যত্র সহজ শিকারের লোভে আবাদ ছাড়িয়া যাইবার জল্পনা করিতেছে।

কিন্তু তাঁহার স্বপ্ন ভাঙ্গিতে দেরী হইল না। প্রহরীদের চীৎকারে তিনি নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া দ্রুত অশ্বচালনা করিলেন। তারপর যে দৃশ্য চাক্ষুষ করিলেন তাহাতে তাঁহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিল।

শতগজ দীর্ঘ একটা বিপুল কৃষ্ণবর্ণ স্রোত খাতের ঢালু পাড় বাহিয়া নামিয়া আসিতেছে। অসংখ্য পিঁপড়া যেমনই সেই ধীরগতি জলধারায় ডুবিয়া যাইতেছে, অমনই পশ্চাৎ হইতে বহুতর পিঁপড়া সেই কাতারে কাতারে নিমজ্জমান পূর্ব্বগামীদের অনুসরণ করিতেছে; এইরূপে পশ্চাদ্বর্ত্তীদের জন্য সেতু-রচনার কাজ চলিতে লাগিল।

লাইনিন্‌গেন একটা ভুল অনুমান করিয়াছিলেন এই যে, রাশি-রাশি দেহ পুঞ্জীভূত করিয়া খাত ভরাট করিতে না পারিলে পিঁপড়ার দল উৎরাইতে পারিবে না। এখন দেখা গেল, পূর্ব্ববর্ত্তীদের একমাত্র কাজ, খাতের জলে ডুবিয়া, ভাসিয়া, সাঁতরাইয়া অনুগামীদের জন্য কেবলমাত্র পাদপীঠ রচনা করিয়া দেওয়া।

অশ্বারোহী ভৃত্যের দল লাইনিন্‌গেনের পাশে দাঁড়াইয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি তাহাদের একজনকে দিয়া জাঙ্গালে বলিয়া পাঠাইলেন—বাঁধের যন্ত্রটা খুব জোরে চালাইতে না পারিলে খাতের জল বেশ বেগে বহিবে না। দ্বিতীয় একজনকে গুদাম-ঘর হইতে কোদাল ও পেট্রোল-পাম্প আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় অশ্বারোহী প্রহরীগণ ব্যতীত আর সকলকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডাকিয়া আনিবার জন্য ছুটিল। খাতের নিকটস্থ ভূমি এখনও নিরাপদ।

কিন্তু পিঁপড়ার দল দ্রুত খাত পার হইতে লাগিল—লাইনিন্‌গেন যে সময় আন্দাজ করিয়াছিলেন তাহার আগেই। একটা পিঁপড়া ডুবিলে তাহার শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ডজন ডজন ছুটিতে লাগিল। লাইনিন্‌গেনের লোক পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শত্রুরা প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। মনিবের নির্দ্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কুলিরা তাড়াতাড়ি নদীর কিনারা খুঁড়িয়া মাটীর ঢেলা ও বালুমুষ্টি শত্রুর উপরে ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

লাইনিন্‌গেন লক্ষ্য করিলেন তাহাদের আক্রমণ ক্রমেই ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। এই সামান্য কয়েকজন লোক আর মুষ্টিমেয় পেট্রোলবর্ষণকারী লইয়া এই অবস্থায় তিনি কি করিতে পারেন? আক্রমণের পরিধি যেভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে—তাহাতে বিপদ সত্যসত্যই দেখা দিল বলিয়া।

এদিকে বিপদের উপর বিপদ—কালো পিঁপড়ার সেই বিস্তীর্ণ গালিচার উপর মাটীর যে ঢেলা নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সেগুলি ঘূর্ণির ঝাপটায় টুকরা টুকরা হইয়া তাহাদের দিকেই ফিরিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যে অন্ধকার পিঁপড়ার সারি পাড় বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ঐ কীটগুলার প্রবাহমধ্যে একটা কোদালের আঘাত করিয়া দেখা গেল, কোদালটা টানিয়া তুলিতে না তুলিতে উহার কাঠের হাতল বাহিয়া কয়েকটি

পিঁপড়া উঠিয়া আসিল। তখন জলের মধ্যে কোদালটি ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু উহারই মধ্যে কয়েকটি পিঁপড়া লোকটার দেহ আশ্রয় করিয়াছে; তদ্দণ্ডেই লোকটার অনাবৃত দেহে তাহারা যেন সাঁটিয়া গেল। উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়গুলি হুল দিয়া তীব্র বিষ ঢালিয়া দিল। বিষের নিদারুণ জ্বালায় লোকটি চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাগিল, শেষে দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল।

হঠাৎ ওই হতভাগ্যের আর্ত্তনাদ ছাপাইয়া লাইনিন্‌গেনের সমুদ্রগর্জ্জনবৎ কণ্ঠ শোনা গেল, "মূর্খ, পেট্রোলের মধ্যে হাত ডুবাও।" মুহূর্ত্তে লোকটির সেই ঘূর্ণন থামিয়া গেল। কে যেন তাহার দেহটি এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়াছে! জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে পেট্রোলের জালার মধ্যে কাঁধ পর্য্যন্ত হাত ডুবাইয়া রাখিল। কিন্তু তখনও পিঁপড়াদের কামড় কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। সঙ্গীরা তাহার দেহ হইতে পিঁপড়াগুলি কোন রকমে টানিয়া ছাড়াইয়া লইল। ইত্যবসরে আবাদের আদিবাসী এক বৃদ্ধ চিকিৎসক কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রস্তুতকরা একটি বিষঘ্ন ঔষধ তাহাকে পান করাইল।

ইতিমধ্যে খাতের জল বাড়িতে লাগিল। তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, নদীর শক্ত বাঁধের মুখে জল-ভর্ত্তির কাজ রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে জল বাড়িতে লাগিল; ভীষণ হইতে ভীষণতর বেগে পাক খাইতে খাইতে নদীর জল পিঁপড়ার সেই কালো আস্তরণ ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল।

(৩)

সুনিশ্চিত পরাজয় জয়রূপেই দেখা দিল। উন্মত্ত জয়োল্লাসে আবাদের অধিবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া মাটীর ঢেলা ও বালুমুষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

এতক্ষণে অপর পারের পিঁপড়ার স্রোত ক্ষীণতর হইয়া নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল—বোধ হয় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং ঢালু পাড় বাহিয়া তাহারা নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল।

খাতের জলে এ পর্য্যন্ত তাহারা বৃথাই ডুবিয়া মরিল। নিমজ্জমান পিঁপড়া-

গুলি তখন হাজারে হাজারে স্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছিল, কেহ বা সাঁতরাইয়া কিনারায় পৌঁছিতে প্রাণান্ত প্রয়াস পাইতেছিল, কিন্তু আবাদীদের হাতে তাহারা কেহই রক্ষা পাইল না।

ঘাঁটীগুলিতে সত্বর খবর পৌঁছিতেই দলে দলে হাস্যমুখর বিশৃঙ্খল জনতা খাতের পাড় ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল।

দিনের শেষে সূর্য্যদেব তেঁতুলবনের আড়ালে অন্তর্হিত হইলেন। প্রদোষের অস্ফুট আলোক ধীরে ধীরে রাত্রির গভীর অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আশা করা যাইতেছে, সম্ভবতঃ পরদিন উষা পর্য্যন্ত উহারা শান্তভাবে বিশ্রাম লইবে। তথাপি তাহাদের পার হইবার শেষ উদ্যমও ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর বাঁধ খুলিয়া দিয়া খাতের স্রোতোবেগ তীব্রতর করা হইল। লাইনিন্‌গেন কর্ম্মচারীদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া, সারারাত মোটরে রোঁদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। মোটরের বাতি এবং টর্চ্চের আলো জ্বালাইয়া রাখিবার বন্দোবস্তও করা হইল। এইরূপে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সমাধা হইলে মালিক পরম পরিতৃপ্তিভরে রাত্রির আহার শেষ করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন—সেই কুড়ি মাইল ব্যাপী অপেক্ষমান শত্রুর দুর্ভাবনা লাইনিন্‌গেনের গভীর নিদ্রার কোন ব্যাঘাত করিতে পারিল না।

* * * * *

পরদিন প্রত্যূষে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সতেজ দেহে লাইনিন্‌গেন পরিখার কিনারা ধরিয়া ঘোড়ার উপরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন অবরোধকারী শত্রুর এক নিস্তব্ধ নিশ্চল বিরাট সমাবেশ। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তাঁহার মনে হইল, পিঁপড়াদের খাত পার হওয়ার আর কোন আশাই নাই। যুদ্ধকালে মনে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ হইয়াছিল—এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে।

লাইনিন্‌গেন খাতের পূর্ব্বে ও দক্ষিণদিকে অশ্বারোহণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, সব ঠিকই আছে। তেঁতুলবনের বিপরীত দিকে পশ্চিম পার্শ্বে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন, রণক্ষেত্রের অন্যান্য স্থলের তুলনায় এখানে শত্রুসেনা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পিঁপড়াগুলি খাতের পরপারে বৃক্ষকাণ্ড, শাখা এবং লতাগুল্মগুলি ঢাকিয়া ভিড় জমাইয়াছে।

পাতাগুলি তখন-তখনই না খাইয়া বোঁটাগুলি কট্ কট্ করিয়া ছেদন করিতেছে, ফলে মাটীর উপরে পাতার একটা সবুজ আস্তরণ পড়িয়াছে। লাইনিন্‌গেন, এই দৃশ্যে কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। কেন না তিনি জানিতেন, নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অপূর্ব্ব সত্ত্ব-বুদ্ধি সবই উহাদের আছে।

বনের অপরপ্রান্তস্থ সৈনিকদের নিকটে ঝরা পাতাগুলি টানিয়া লইয়া যাওয়ার কৌশল লক্ষ্য করিতেই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, একটা অতর্কিত আক্রমণের আয়োজন বা তোড়জোড় চলিতেছে। এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সবুজ পাতার বর্ষণ চলিতেছিল।

প্রত্যেকটি পাতা ঠেলিয়া টানিয়া পিঁপড়াগুলি সরাসরি খাতের কিনারায় লইয়া যাইতেছিল। লাইনিন্‌গেন ইহাতেও বুদ্ধি হারাইলেন না। তথাপি ইহাও বুঝিলেন যে, গতদিনের পরিস্থিতির তুলনায় আজিকার অবস্থা সত্যই আরও গুরুতর। তিনি তখনই আবাদের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে অশ্বারোহণে ঘোষণা করিতে লাগিলেন—"রণক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে পেট্রোল-পাম্প লইয়া চল। বনভূমির সম্মুখভাগের লোকদের প্রত্যেকের হাতে কোদাল তুলিয়া দাও।" সম্মুখে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক দ্রুতসংঘটিত অথচ গুরুতর ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।—দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া একটা কি বস্তু তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে—ঠিক ছুটিয়া নয়, যেন ধনুষ্টঙ্কারের মত ঘুরিয়া, বাঁকিয়া, গড়াইয়া আসিতেছে। চতুষ্পদ জন্তুর মতই,—তবু একটা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত দেহটা দেখাইতেছে। মাথাটা কদাকার, চারিটা পা ক্রমাগত পরস্পর ঠোকাঠুকি করিতেছে। ঐ মূর্ত্তিটি খাতের অপর পারে, লাইনিন্‌গেনের ঠিক বিপরীত দিকে পেঁছিয়া ঢলিয়া পড়িল; তিনি চিনিতে পারিলেন—সেটা একটা হরিণ, তাহার সর্ব্বাঙ্গ পিঁপড়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

মৃগটি যূথভ্রষ্ট হইয়া শত্রুর এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারাও যথারীতি প্রথমেই তাহার চক্ষুদুইটি আক্রমণ করে। তারপর সেই দৃষ্টিহারা জন্তুটা অসহ্য বেদনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া একেবারে শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ করিল—এক্ষণে মৃত্যু-যাতনায় অস্থির হইয়া সম্মুখে-পিছনে দুলিতে লাগিল।

লাইনিন্‌গেন একটি গুলির আঘাতে তাহার সকল যাতনার অবসান

করিলেন। একবার ঘড়িটি বাহির করিয়া তিনি সময় দেখিয়া লইলেন। যদিও এখন এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলিবে না, তথাপি পিঁপড়াগুলি কতক্ষণে তাহাকে শেষ করে তাহা দেখিবার কৌতূহল তিনি প্রাণান্তে দমন করিতে পারিলেন না—একরকম নিজেরই প্রয়োজনে। দেখিলেন ছয় মিনিটের মধ্যেই কেবলমাত্র মসৃণ শুভ্র একটা কঙ্কাল পড়িয়া রহিল। তাঁহারও ঐ দশা হইবে; এইরূপ—এক, দুই,—লাইনিন্‌গেন একবার থুথু ফেলিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

শত্রুর শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব ভুল হইয়াছিল; বুদ্ধিতে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে হইলে তাঁহাকে আরও তৎপর হইতে হইবে। তিনি স্থির বুঝিতে পারিলেন, এইবার একটা দারুণ মার আসিবে—খাতের পশ্চিম ভাগ যেখানে দক্ষিণমুখে বাঁকিয়া গেছে ঠিক সেই স্থান হইতে। সেইখানে পৌছিবামাত্র দেখিলেন, তিনি যে ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। বাঁকের ধারে পাতাগুলি স্রোতের টানে ঘনবদ্ধ হওয়ায়, ওপারের পিঁপড়াদের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া গিয়া সেতুরচনা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সত্য বটে, পেট্রোল ও মাটির ঢেলার অবিরাম বর্ষণে খাতের এপারে তাহাদের অবতরণ এখনও নির্বিঘ্ন হয় নাই; কিন্তু জলের উপরে যে-ভাবে গাছের পাতা দ্রুত জমিয়া উঠিতেছিল তাহাতে অনতিকালের মধ্যে ক্রোশব্যাপী এক সবুজ সেতুপথের উপর দিয়া লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ার সারি যে বেগে ধাবিত হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

নদীর পাড়ের উপরে যে কল বসান আছে তাহার সাহায্যে উহার জল উঠান এবং নামান হয়। লাইনিন্‌গেন জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া সেইখানে পেঁাছিলেন। অতঃপর যে লোকটা কল চালাইতেছিল তাহাকে তিনি জল একেবারে খাতের তলা পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরে আবার সেই জল বেগে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। এই কৌশলে প্রথমে বড়ই কাজ হইল—পরিখার জল নামার সঙ্গে সঙ্গেই পাতার চাদরটাও নামিয়া গেল। পরে এক প্রবল স্রোত পুনরায় শূন্য-খাত পূর্ণ করিয়া পাতা ও পিঁপড়া দুইই সবেগে ভাসাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু একই কালে এখানে ওখানে কতকগুলি অগ্রগামী পিঁপড়ার দল এদিকের পাড়ে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। পিঁপড়াগুলি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, তাহা সম্পাদন

করিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না,—তৎক্ষণাৎ আবাদবাসীদের আর্ত্ত চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

জল ক্রমাগত উঠিতে ও নামিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জলমগ্ন পিঁপড়া ও পাতার রাশি ভাসিয়া চলিল। কিন্তু ইহার মধ্যে খাতের জল যখন এক সময়ে একেবারে তলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন যাহারা প্রাণপণে যুঝিতেছিল তাহারা দেখিল, জল ওঠা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। লাইনিন্‌গেন বুঝিতে পারিলেন সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বাঁধের কল বিগড়াইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একজন পিয়াদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"সব পার হইয়া গেছে!"

(৪)

ঐ বনের ঠিক অপর পারেই ইহারা আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল; তখন যে-দিকটায় বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা কম মনে হইয়াছিল এখন সেইখানেই আসল যুদ্ধ বাধিল। এখানে প্রতিরোধকারীরা সংখ্যায় ছিল অল্প, এবং দূরে দূরে ছড়াইয়া ছিল; তার কারণ, যতগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল, কেবল ততগুলিই আবাদের দক্ষিণাংশে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

বাঁধের কলে যে ব্যক্তি কাজ করিতেছিল সে যেমনই খাতের তলা পর্য্যন্ত জল নামাইয়া দিল, অমনই পিঁপড়ার দল পূর্ব্বদিনের মত অতি দীর্ঘ স্থান জুড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—জলশূন্য খাতের মধ্যে তাহারা দুর্ব্বার বেগে নামিয়া আসিল। কল-ঘরের লোকটি পুনরায় খাতে জল প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাইল, চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ পিঁপড়ার দল তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। সে তখন আর সকলের মত ছুটিতে আরম্ভ করিল—প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

এই খবর শুনিবামাত্র লাইনিন্‌গেন বুঝিতে পারিলেন, আবাদের আর রক্ষা নাই। যাহা অবশ্যই ঘটিবে তাহার জন্য হা-হুতাশ করিয়া তিনি সময় নষ্ট করিলেন না। যতক্ষণ উদ্ধারের বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। এখন আর প্রতিরোধের কোন চেষ্টা—শুধুই নিষ্ফল নহে, বিপজ্জনক। এইবার তিনি আকাশ লক্ষ্য করিয়া তিনবার

পিস্তলের আওয়াজ করিলেন। ইহাই ছিল ছোট পরিখার ভিতরে আশ্রয় লইবার সাঙ্কেতিক আদেশ। তিনি নিজে 'র‍্যান্স'-বাড়ীর দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

ঐ বাড়ী আক্রমণ-স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে। অতএব পিঁপড়াদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার এই যে দ্বিতীয় সীমানা—ইহাকে সুদৃঢ় করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। র‍্যান্স-ঘরের নিকটে যে তিনটা প্রকাণ্ড পেট্রোলের ট্যাঙ্ক ছিল তাহার একটা প্রায় অর্দ্ধেক খালি হইয়া গিয়াছে। বাকি অর্দ্ধেকটায় মাটীর তলাকার পাইপের সাহায্যে সেই বাঁধান খাতটা ভর্ত্তি করা হইল। ঐ খাত র‍্যান্স-বাড়ী ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ঘরগুলির চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে।

এইখানে দুইজন তিনজন করিয়া লোকগুলি আসিয়া পেঁ ছিল। তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়ের আশা তাহারা প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। লাইনিন্‌গেন তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—

"দেখ, বন্ধুগণ, আমরা প্রথম বাজি হারিয়াছি। কিন্তু এখনও আশা আছে—ঐ দুর্বৃত্তগুলাকে মারিয়া গুঁড়া করিতে পারিব; তোমরা ভাবিও না। যদি কাহারও সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে তবে এখনই বেতন লইয়া সরিয়া পড়িতে পার।"

একজনও নড়িল না।

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার এই নীরব নিদর্শনে খুশী হওয়ার ছলে লাইনিন্‌গেন একটু হাসিলেন—সে হাসিতে একটা কঠিন শুষ্ক আওয়াজ বাহির হইল। —"এই তো চাই! মজাটার শেষই যদি না দেখিলে, তবে আর কি হইল?—তাই না? মজাটা কাল সকালের আগে সুরু হইবে না। একবার এই বদমায়েসগুলা পিট্‌টান দিলেই তোমাদের সকলেরই কাজও যেমন বাড়িবে, তেমনই মজুরীও বেশি করিয়া পাইবে। আচ্ছা, এইবার একটু দৌড় দাও দেখি,— কিছু খাইয়া লও, যে পরিশ্রম করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের ওটা পাওনা হইয়াছে।"

দিনভোর লড়াইয়ের উত্তেজনায় তাহাদের আহারের ফুরসৎই হয় নাই।

এখন পিঁপড়াগুলা কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়ায় এবং 'পেট্রোলের' বেড়া' তাহাদের মনে একটু সাহস সঞ্চার করায় যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইল।

কংক্রিটে-গাঁথা পরিখাটির উপরে যে ব্রিজ ছিল তাহা সরাইয়া লওয়া হইল। এখানে ওখানে দুই একটি পিঁপড়া খাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। সামনের পেট্রোলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহারা কি ভাবিয়া বেগে প্রস্থান করিতে লাগিল। বেশ বোঝা গেল, ঐ অলক্ষণ খাতটার অপর পারে যাহা আছে তাহার জন্য উপস্থিত তাহারা বিশেষ ব্যস্ত নহে; আবাদের জমিতে যে সকল শস্য রহিয়াছে তাহার প্রাচুর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয়।

শীঘ্রই চতুর্দ্দিকের গাছপালা ও ক্ষেত্রগুলির উপরিভাগে পিঁপড়ার গাদি লাগিয়া গেল। এতদিনের এত পরিশ্রমের ফসল তাহারা পরম উৎসাহে সাবাড় করিতে লাগিয়া গেল।

লাইনিন্‌গেন হেড-লাইট এবং টর্চ্চ-সহ সর্ব্বত্র প্রহরী বসাইয়া দিলেন; তারপর অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করিতে বসিলেন। ইহার পর, শয্যা আশ্রয় করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলেন—এমন চিন্তা তাঁহার নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করিল না যে, পরদিন হয়তো একটা শাদা পালিশ্-করা কঙ্কাল ভিন্ন তাঁহার দেহের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম হইতে জাগিয়া তিনি প্রথমে বাড়ীর ছাদে গিয়া উঠিলেন। তাঁহার চারিদিকে যে দৃশ্য দেখিতে পাইলেন তাহা যেন হুবহু কবি দান্তে-বর্ণিত একটি দৃশ্য। যতদূর দৃষ্টি চলে, চারিদিকে বহু মাইল ব্যাপিয়া একটা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিশাল জনতা সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে! সে আর কিছু নয়—সেই অতি-ক্ষুধার্ত্ত সর্ব্বভুক্ পিঁপড়ার বাহিনী। গুরুভোজনের পরে উহারা যেন এখন বিশ্রাম করিতেছে।

উহাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি নাই!—আবাদের চারিশত মানুষ, অসংখ্য ঘোড়া এবং গোলাভরা প্রচুর শস্য তাহাদের চাই-ই, এমন লোভের বস্তু তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না।

এক একবার আশা হয়, পেট্রোলে-ভর্ত্তি এই খাত তাহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির

পক্ষে একটা অন্তরায় হইবে ; কিন্তু পর-মুহূর্তে সাঁতার কাটিয়া পার-হওয়ার সম্ভাবনাটা তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না। একটু পরেই দেখা গেল, পূর্ব্বদিন যেমন তেঁতুলপাতার সাহায্যে ভেলা তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, আজও তেমনই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে এক সুদীর্ঘ পিঁপড়ার শোভা-যাত্রা তেঁতুলের পাতা বহন করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

খাতের পেট্রোলে কোথাও একটু বিক্ষোভ নাই, একেবারে শান্ত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহার উপরিভাগের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া পিঁপড়ার ভীড় জমিয়া গেল। সরাসরি আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। আক্রমণের আয়োজন সুরু হইলে লাইনিন্‌গেন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সারাক্ষণ শান্তভাবে তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন ; তাঁহার হাতের একটি পেশীও নড়িল না। আবাদের রক্ষীদের উপরও আদেশ ছিল, তাহারা যেন উহাদের অগ্রগতির পথে কোনও বাধার সৃষ্টি না করে। সুতরাং তাহারাও নিশ্চিন্ত-নীরবে প্রভুর পরবর্ত্তী আদেশের অপেক্ষায় খাতের পারে বসিয়া রহিল।

এই অবসরে অসংখ্য পিঁপড়ায় পেট্রোল ছাইয়া ফেলিল। তাহাদের কয়েকটি কংক্রিটের দেয়াল বাহিয়া উপরে উঠিয়াই রক্ষীদের দিকে ধাওয়া করিল।

লাইনিন্‌গেন বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন, "খাতের ধার হইতে সকলে সরিয়া এস।" তাঁহার আদেশের অর্থ না বুঝিয়াই সকলে পলাইয়া আসিল।

লাইনিন্‌গেন তখন সম্মুখে ঝুঁকিয়া খুব সাবধানে খাতের মধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে, পাতার সেই গালিচা ও তাহার উপরের পিঁপড়ার গাদা ফাঁক হইয়া গিয়া নীচের পেট্রোল চকচক করিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে দেশলাইয়ের একটি জ্বলন্ত কাঠি সেই পেট্রোলের মধ্যে প্রবেশ করিল। লাইনিন্‌গেন তৎক্ষণাৎ পিছনে লাফাইয়া পড়িলেন,—নিমেষে এক গগনস্পর্শী 'অগ্নি-প্রাকার' দুর্গরক্ষীদের চারিদিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল।

তদ্দণ্ডেই শত্রুদের এই 'জ্বলন্ত' পরাজয়ে আবাদবাসীরা উল্লাসে মাতিয়া উঠিল ; বাজী দেখিয়া বালকেরা যেমন হাততালি দেয় ও নাচিতে থাকে তাহারাও সেইরূপ নাচিতে লাগিল।

খাতের তলদেশ পর্য্যন্ত পুড়িয়া পেট্রোল শেষ হইয়া আসিল। ধোঁয়ার

কুণ্ডলী ধীরে ধীরে শূন্যে বিলীন হইল, আগুনের শিখাও স্তিমিত হইয়া আসিল। শত্রুদল অগ্নিকুণ্ড হইতে দূরে বৃত্তাকারে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল।

তথাপি তাহাদের উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না; বরং বারংবার পরাজয়ে তাহাদের যেন জিদ চাপিয়া গেছে। ইতিমধ্যে খাতের কংক্রিটের দেয়াল ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে; স্তিমিত অগ্নিশিখা ম্লান হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক হইতে তখন পুনরায় পেট্রোল ছাড়িয়া দেওয়া হইল; হুবহু পূর্ব্ব-ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হইল, আবার হাজার হাজার পিঁপড়া আগুনে পুড়িয়া উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

শত্রুরা পুনরায় পিছু হটিয়া গেল। আবার খাতে পেট্রোলের বান ডাকিল। এই আশাহীন কর্ম্মের উদ্যম—এই আত্মাহুতি যে একান্তই অর্থহীন, ইহা কি উহারা কিছুতেই বুঝিবে না? সত্যই ইহার কোন অর্থ হয় না—হয় কি? হাঁ, নিরর্থক হইতে পারিত, যদি অফুরন্ত পেট্রোল থাকিত।

লাইনিন্‌গেনের চিন্তা যখন এই পর্য্যন্ত পৌঁছিল, তখন সেই প্রথম তিনি অনুভব করিলেন যে, তাঁহার মনের জোর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত শরীর শিরশির করিতে লাগিল, তিনি জামার কলার আলগা করিয়া দিলেন।

কোন রকমে ঐ যমদূতগুলা যদি খাতের এপারে একবার পৌঁছিতে পারে, তবে তাঁহার এবং এই মানুষগুলির যমালয়ে আশ্রয় লইলেও রক্ষা নাই। হা ভগবান! জীয়ন্তে উহাদের পেটে যাওয়াই কি তবে তাঁহাদের ভবিতব্য?

তৃতীয় বার সহস্র সহস্র আক্রমণকারী পেট্রোলের আগুনে পুড়িয়া মরিল। তথাপি, যেন কিছুই ঘটে নাই—তেমনই ভাবে পিঁপড়ার দল সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তখন তাঁহার স্মরণ হইল, কাছেই জিনিষ পত্র রাখিবার একটি ঘরে বহুদিনের অব্যবহৃত দুইটি পুরাণো দমকল পড়িয়া আছে। পেয়াদারা চালার ভিতর হইতে ঐগুলি টানিয়া বাহিরে আনিল।

প্রকৃতপক্ষে, নিশ্চিত পরাজয় ও মৃত্যুকে কিছুক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিবার ইহা একটা শেষ উপায় বইত নয়। পেয়াদাদের কেহ হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা

করিতে লাগিল, কেহ বা উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া ঐ অন্ত-নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ জনতার দিকে পিস্তলের গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। অবশেষে দুইজনের মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হইয়া গেল। লাইনিন্‌গেন দেখিতে পাইলেন, আবাদবাসীদের একজন উলঙ্গ হইয়া খাতের উত্তর পার্শ্বে নাচিতে সুরু করিল, তারপর আর একজন। তাহারা অসম্ভব দ্রুতগতিতে নদীর দিকে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু এত দৌড়াইয়াও তাহারা রক্ষা পাইল না—সেতুর নিকটে পেঁাছিবার পূর্ব্বেই পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ শত্রুরা ছাইয়া ফেলিল। এখন যাতনায় অধীর হইয়া হতভাগ্যেরা সেই বিস্তীর্ণ নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল—হয়ত জলমধ্যে পিঁপড়াদেরই মত হিংস্র আর একপ্রকার শত্রু তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। অপর সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহাদের পরিণাম লক্ষ্য করিতে লাগিল—মৃত্যু-যাতনার সেই হৃদয়বিদারক চীৎকার শুনিয়া কাহারও জানিতে আর বাকি রহিল না যে, পিঁপড়াদের তুলনায় কুমীর এবং তীক্ষ্ণ-দন্ত জলজন্তুগুলি কিছু কম বুভুক্ষু, বা শিকার-কার্য্যে কম দক্ষ নহে।

এই ভীষণ পরিণাম চাক্ষুষ করিয়াও ক্রমে আরও অনেকে ঐ শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতেই মনস্থ করিল। যাহা ঘটিবার ঘটুক, তথাপি দেহগুলাকে এইরূপে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে সঁপিয়া দেওয়া অপেক্ষা নদীমধ্যে কুমীরের মুখে পড়াও ভাল।

(৫)

মাথা টলিতেছে; তথাপি যেমন করিয়া মুমূর্ষু ঘোড়াকে চাবুকের দ্বারা চাঙ্গা করিতে হয়, লাইনিন্‌গেন তেমনই তাঁহার বুদ্ধিকে যেন তীব্র কশাঘাতে সজাগ করিতেছেন।—জগতের কোথাও কি এমন কেহ নাই যে এই দুষমন-গুলাকে জাহান্নমে পাঠাইতে পারে?

এই চরম অবসাদ ও বিমূঢ়তার ফলেই তিনি যেন মরীয়া হইয়া উঠিলেন—আছে, এখনও আশা আছে! একমাত্র উপায়—ঐ বাঁধের কল যদি সম্পূর্ণ খুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয়, তবে শুধু খাতটাই নয়, এই বিশাল প্রান্তরটাই ভাসাইয়া দেওয়া যাইবে। রাজ-বাড়ী এবং সদরবাড়ীগুলার ভিটা উঁচুই আছে, সুতরাং উহাদের ভিত পর্য্যন্ত প্লাবনের জল পৌঁছিতে পারিবে না।

হাঁ সম্ভব, নিশ্চয় সম্ভব! কেবল ঐ বাঁধটায় পৌঁছিতে পারিলেই হয়। রাজ-বাড়ী হইতে ঐ বাঁধ দুই মাইল মাত্র। কিন্তু সারাপথ পিঁপড়ায় ছাইয়া গিয়াছে—তাঁহার ঐ পিয়নদুইটা সিকি-পথ পার না হইতেই প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার পরেও এমন কে দুঃসাহসী আছে, যে ঐ পুরা পথটা ছুটিয়া যাইবে? অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ঐ বাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছান যদি সম্ভবও হয়, ফিরিয়া আসিবার কোন আশা আছে কি?

না, ঐ একটি কাজই করিবার আছে, এবং সে কাজ তাঁহাকেই করিতে হইবে। তা' ছাড়া, শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই আশা ছাড়িলে চলিবে না। পিঁপড়াগুলা তো আর সর্ব্বশক্তিমান নহে। কিন্তু সাপ যেমন শিকারকে মোহাবিষ্ট করিয়া তাহার সর্ব্বশক্তি হরণ করিয়া লয়, ইহারাও তাঁহাকে তেমনই করিয়াছে—তাঁহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইতিমধ্যেই পিঁপড়াগুলি সেতু-রচনা সুরু করিয়া দিয়াছে। লাইনিন্‌গেন একটি চেয়ারের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিলেন—"শোন বন্ধুগণ, শোন!" লোকগুলা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আদেশে খাতের চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহারা স্খলিত পদে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহারই মধ্যে তাহাদের মুখের উপর মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়াছে।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে লাইনিন্‌গেন বলিতে লাগিলেন "শোন বন্ধুগণ! ঐ নদীর জলে সমস্ত আবাদ ভাসাইয়া দিতে পারিলে, আমরা এখনও বাঁচিয়া যাইতে পারি—তবে যদি কেহ ফিরিবার আশা ত্যাগ করিয়া ঐ বাঁধে পৌঁছিতে পারে। সে কাজ আমি তোমাদের কাহাকেও করিতে দিতে পারি না; যদি দিই, তবে আমাকে ধিক্! আমি কি পিঁপড়াদের চেয়েও অধম? আমার কৃতকর্ম্মের ফল আমাকেই ভোগ করিতে হইবে। তোমরা কেবল আমার এই কথাটি স্মরণ রাখিও—যে-মুহূর্ত্তে, আমি খাতের ওপারে পৌঁছিব, তৎক্ষণাৎ তোমরা পেট্রোলে আগুন ধরাইয়া দিবে। সে আগুন নিবিবার আগেই বন্যার দ্বারাই কার্য্য হাসিল হইয়া যাইবে। তোমাদের একমাত্র কাজ হইবে আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত শান্তভাবে অপেক্ষা করা।—না না, আমি ফিরিয়া আসিবই, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

লাইনিন্‌গেন একজোড়া খুব মজবুত বুটজুতা পরিলেন; দুই হাতে লোহার দস্তানা পরিয়া, শেষে বুট ও হাফপ্যাণ্ট, দস্তানা ও বাহু, এবং সার্ট ও

গলার ম্যখের ফাকগুলিতে পেট্রোলে-ভিজান ন্যাকড়া জড়াইয়া লইলেন। তারপর এমন একজোড়া ঠুলি চোখে পুরিলেন যাহার ভিতরে মশাও গলিতে পারে না; কারণ, তিনি জানিতেন পিঁপড়ারা প্রথমেই শিকারের চোখ-দুইটা অন্ধ করিয়া দেয়। সবশেষে তুলা দিয়া নাক ও কাণের ছিদ্র বুজিয়া দিলেন; তারপর ভৃত্যেরা প্রভুর পোষাকটি পেট্রোলে ভিজাইয়া দিল।

এইবার তিনি যাত্রা করিবেন; এমন সময়ে আদিবাসী সেই বৃদ্ধ চিকিৎসক আসিয়া জানাইল যে, এক-জাতীয় পোকা হইতে সে যে এক আশ্চর্য্য আরক তৈয়ারী করিয়াছে, তাহার উৎকট গন্ধ পিঁপড়াদের পক্ষে অসহ্য; এই গন্ধই পোকাগুলিকে ভীষণতম পিঁপড়ার আক্রমণ হইতেও রক্ষা করিয়া থাকে। ইহা বলিয়া চিকিৎসক বার বার সাহেবের বুট, দস্তানা এবং মুখমণ্ডলে ঐ আরক মাখাইয়া দিল। এইবার সেই বিষম্ন ঔষধের কথা লাইনিন্গেনের স্মরণ হইল—খাতের পারে পিঁপড়ার দংশনে জর্জ্জরিত ভৃত্যদের যে ঔষধ পান করান হইয়াছিল, তাহারই এক গ্লাস চিকিৎসক তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতেই তিনি এক নিঃশ্বাসে সবটাই পান করিলেন, ঔষধের কটু স্বাদ কিছুমাত্র অনুভব করিলেন না; কারণ, তখন ঐ বাঁধে পৌঁছনোর ভাবনাই তাঁহার সমস্ত চৈতন্য আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

লাইনিন্গেন খাতের দূর উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে রওনা হইয়া গেলেন; তারপর এক লম্ফে খাত পার হইয়া একেবারে পিঁপড়াদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন।

(৬)

লাইনিন্গেন তীরবেগে ছুটিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার বুটে আরক মাখান থাকিলেও, এবং সমস্ত পোষাক পেট্রোলে ভিজানো হইলেও, পিঁপড়ারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবেই; কিন্তু ইহাও জানিতেন যে, বাঁধে তাঁহার যাওয়া চাই-ই, যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে পৌঁছিতেই হইবে।

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে না করিতেই তিনি অনুভব করিলেন, কয়েকটি পিঁপড়া এখনই পোষাকের নীচে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, এবং আরও কয়েকটি তাঁহার মুখমণ্ডল আশ্রয় করিয়াছে। তিনি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া জোরে পা চালাইতে চালাইতে, কদাচিৎ দংশন-জ্বালা অনুভব করিয়া, কেবল অভ্যাসবশে তাহাদের উপর হস্তচালনা করিতে লাগিলেন। স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন তিনি বাঁধে পৌঁছিলেন বলিয়া,—পথ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, আর পাঁচশত গজ মাত্র—তিনশত—দুইশত—আর একশত মাত্র।

লাইনিনগেন এখন বাঁধে পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়াই পিঁপড়ার আক্রমণ [illegible] চাকাটি [illegible] ঘুরাইতে চাপিয়া ধরিলেন। চাকাটি স্পর্শ করিবামাত্র [illegible] পিঁপড়ার দল তাঁহার বক্ষে বাহুতে ঝাঁকিয়া ধরিল—মুখমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি এক [illegible] শক্তিবলে উন্মত্তবৎ তাঁহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; ওষ্ঠ তখন দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু যদি শ্বাস গ্রহণের জন্য খুলিতে হয় তবে—

বারংবার চাকা ঘুরাইতে লাগিলেন; নদীর জলে খাত পূর্ণ হইয়া ছাপিয়া উঠিল; আবাদেও প্লাবন সুরু হইয়া গিয়াছে।

এইবার তাঁহার কর্তব্য শেষ—তিনি চাকা ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে পিঁপড়ার তীক্ষ্ণ দংশনজ্বালা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসহ্য যাতনায় উন্মত্ত হইয়া নদীর জলে সকল জ্বালা জুড়াইবার অদম্য ইচ্ছা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিতেছে,—কিন্তু সে কি ঐ জলজন্তুগুলার তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় খণ্ডবিখণ্ড দীর্ণ-বিদীর্ণ হইবার জন্য? তিনি নদীর দিক হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; দস্তানার তলা হইতে এবং রক্তাক্ত মুখের উপর হইতে পিঁপড়াগুলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, পোষাকের নীচের গুলি পিষিয়া মারিলেন। ঠুলি-চশমার কিনারার ঠিক নীচে তাহাদের একটি কামড়াইয়া ধরিয়াছে; তিনি উহা টানিয়া ফেলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই বিষের ক্রিয়া সুরু হইয়া গিয়াছে—তিনি অন্ধবৎ ছুটিতে লাগিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পেট্রোলের ওই আগুনের বেড়া যেন কতদূরে—বহুদূরে!—মনে হয়, সে পথের যেন শেষ নাই! অর্দ্ধেকও বুঝি অতিক্রম করা যাইবে না। সেই সময়ে, সেই মুহূর্তে, তাঁহার মস্তিষ্কের এক ভাগে, দ্রুত-বিলীয়মান কত চিত্র—অতীত জীবনের ঘটনা—চমকিয়া উঠিতেছে! কিন্তু অপর এক ভাগে

মরুর মায়া

মঃ মার্টিনেব পশুশালা থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে সঙ্গিনী মহিলাটি বলে' উঠলেন—"ওর সবই বিশ্রী, দেখলে গা' কেমন করে! ঐ হায়েনাটাকে নিয়ে লোকটা যা কবলে—মনে হয়, ওব যেন প্রাণের মায়া নেই।"

এর পরেও বলতে লাগলেন "ঐ রকম হিংস্র জন্তুদের কি কৌশলে এমন বশ করা যায় যে, শুধু পোষ-মানা ব'লেই মনে হয় না—যেন তারো বেশি কিছু!"

আমি বাধা দিযে বললাম, "আপনার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে খুবই স্বাভাবিক।"

"তাই নাকি?" বলে' তিনি একটু অবিশ্বাসেব হাসি হেসে নিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি বুঝি মনে করেন, জন্তুদের কোন প্রবল হৃদয়বৃত্তি নেই—কোন বকম সু বা কু কামনা নেই ওদের? ঠিক তার উল্টো; আমাদের এই সভ্য-জীবনের যতকিছু ভাব সবই ওদের ভিতবেও ঢুকিয়ে দে[illegible]া যায়।"

তার [illegible] বললাম, মার্টিনেব ঐ খেলাটা আমিও যখন প্রথম দেখি তখন ঠিক তাঁর মতই চমকে উঠেছিলাম। সে সময়ে আমার পাশেই বসেছিল একজন বৃদ্ধ সৈনিক, তার ডান পা'টা নেই,—আমবা এক সঙ্গেই ঢুকেছিলাম, তার মুখের চেহারা ভারি অদ্ভুত; যুদ্ধ-বৃত্তি বলতে যা' বোঝায় ঠিক সেই বস্তুটি তার কপালে চিবুকে—আর মুখখানায় মাখানো রয়েছে, যেন সম্রাট নেপোলিয়নের সব ক'টা যুদ্ধেব সংবাদ তার সেই মুখ থেকে পড়ে' নেওয়া

যায়। তা' ছাড়া, মানুষটা এমন প্রাণ-খোলা—এমন সরল সহজ যে, লোকটাকে আমার বড় ভালো লাগল। তাকে সেই শ্রেণীর মানুষ বলে' মনে হ'ল, যারা সাধারণ সিপাহীর জীবন যাপন করার ফলে কিছুতেই অবাক হয় না, ভয়ও পায় না; কোন সমস্যার ধার ধারে না তারা, মনে কোন মিছা তর্ক বা সংশয় নেই; গুলি-গোলার মধ্যে যেমন অটল থাকে, তেমনি অতিশয় নির্মমতার কাজও হাসিমুখেই করে; সঙ্গীদের মৃত্যুযাতনা-কাতর মুখের দিকে চেয়ে একটুও বিচলিত হয় না, সে সব গ্রাহ্যই করে না। পশুশালার সেই মালিকটার কেরামতি দেখে সে বেশ যেন একটা কৌতুক বোধ করছিল; যখন ক্রীড়ামঞ্চ থেকে লোকটা নেমে এল, তখন আমার এই সঙ্গীর মুখে স্পষ্ট বিদ্রূপ, এমন কি, একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে; ভাবখানা যেন এই যে, ও সব বাহাদুরী তার কাছে চলবে না, তাকে ঠকানো এত সহজ নয়। পরে আমি যখন তার কাছে মঃ মার্টিনের ঐ রকম সাহসের প্রশংসা একটু বেশি করেই করলাম, তখন সে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে একটু হাসল, বললে—"ওসব আমার জানা আছে।" আমি বললাম, "তার মানে? জানোই যদি, তা হ'লে ভিতরের কথাটা আমায় একটু খুলেই বল না!"

কয়েক মিনিট আলাপ-পরিচয়ের পরে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে সামনে যে রেস্তোরাঁ পেলাম তাইতেই দুজনে ঢুকে পড়লাম। আহারের শেষে এক বোতল শ্যাম্পেনের গুণে মন-প্রাণ যখন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখন বুড়া সৈনিকের স্মৃতিশক্তি বেশ সজীব হ'য়ে উঠল। সে তখন তার সেই কাহিনী আমাকে সবিস্তারে শুনিয়ে দিলে; শুনে বললাম, "হাঁ, 'সব জানা আছে' এমন কথা তুমি বলতে পারো বটে।"

সেই গল্প শোনবার জন্যে—বাড়ী ফিরে এসে—আমার সঙ্গিনী নাছোড়-বান্দা হ'য়ে এমন আবদার করতে লাগলেন, এবং পুরস্কারস্বরূপ এমন কিছুর লোভ দেখালেন যে, শেষ পর্য্যন্ত সেই বুড়া সৈনিকের আত্ম-কাহিনী তাঁকে শোনাতেই হ'ল। পরদিন লিখিত আকারে যে রচনাটি তিনি তাঁর পদ্মহস্তে উপহার পেলেন, তাকে কোন মহাকাব্যের অন্তর্গত একটা খণ্ড কাহিনী বলা যেতে পারে, এবং তাঁর নাম দেওয়া যেতে পারে—"মিশরের রণভূমে করাসী সৈনিক।"

উত্তর-মিশরে অভিযান-কালে জেনারেল 'দেসাই'-এর অধীনস্থ সেনাদলের একজন ফরাসী সৈনিক 'মানগ্রাবিন'-নামক একদল আরব-দস্যুর হস্তে বন্দী হয়, তাহারা তাহাকে নীল-নদের প্রবাহ-পথ হইতে অনেক দূরে মরুভূমির মধ্যে লইয়া যায়।

ফরাসী সেনার সহিত দূরত্ব রক্ষা করিবার জন্য ঐ দস্যুদল সারা দিন-মান অতি দ্রুতবেগে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কেবল রাত্রিকালে বিশ্রাম করিত। খেজুরগাছ-বেষ্টিত ঝরণার চারিপাশে তাহারা তাঁবু ফেলিত, তথায় পূর্ব্ব হইতেই গুপ্তস্থানে খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করা থাকিত। বন্দী যুবা যে পলায়নের মতলব করিতে পারে এমন আশঙ্কার কারণ ছিল না, তাই তাহারা তাহার হাত-পা বাঁধিয়া, ঘোড়াগুলাকে আহার দিয়া, এবং নিজেরা কিছু খেজুর খাইয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন হইত।

ফরাসী সৈনিক যখন দেখিল, শত্রুগণ আর তাহাকে পাহারা দেয় না, তখন একদিন সে দাঁতের দ্বারা একখানা তলোয়ার তুলিয়া, দুই জানুতে তাহা চাপিয়া ধরিয়া, তাহারই সাহায্যে হাতের বন্ধন-রজ্জু কাটিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিল। অতঃপর সে একটা বন্দুক ও একখানা ছোরা হস্তগত করিল, এবং ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া, একছালা শুঁঠা-খেজুর, ঘোড়ার জন্য কিছু দানা, এবং থলিতে কিছু বারুদ ও ছররা ভরিয়া লইল; তারপর কোমরে একখানা প্রকাণ্ড তরবারি বাঁধিয়া, উহাদেরই একটা ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়া উঠিয়া,—যে দিকে ফরাসী সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা সেইদিকে অশ্বচালনা করিল। ফরাসী সেনানিবাসে পৌঁছিবার জন্য সে এতই অধীর যে, ঘোড়ার দেহটাকে পদতাড়নায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল; একেই বেচারী বিশ্রাম করিতে পারে নাই, তার উপর এইরূপ তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া সে কিছুদূর ছুটিয়াই ভাঙ্গিয়া পড়িল, মৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হইল না। তখন সেই সৈনিক-যুবা বিশাল মরুভূমির মধ্যে একেবারে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িল। জেল-ভাঙা কয়েদীর মতই অপরিমিত সাহস সঞ্চয় করিয়া সে সেই বালুকারাশির উপর দিয়া পদব্রজে কতকদূর চলিল বটে, কিন্তু শীঘ্রই দিবাবসান হইতে দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পূর্ব্বদেশের রাত্রি যদিও রমণীয় তথাপি তাহার দেহের শক্তি ফুরাইয়াছিল, সে আর এক পা'ও হাঁটিতে পারিল না

ভাগ্যক্রমে নিকটে একটি ছোট পর্ব্বতের সন্ধান মিলিল,—দূর হইতে তাহার চূড়ায় কয়েকটি হরিৎ-শীর্ষ খেজুরগাছ দেখা যাইতেছিল। ইহাতেই সে প্রাণে একটু সাহস পাইল।

একটা ছোট গ্রানিট-পাহাড়; তাহার মাথার কাছে একটা গহ্বর—যেন কেহ খেয়ালের বশে পাথর কাটিয়া একটা শয়ন্-স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে। সৈনিক এতই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে তৎক্ষণাৎ তাহাতে প্রবেশ করিয়া সেই কুলুঙ্গীর মত স্থানটিতে উঠিয়া নিদ্রায় দেহ ঢালিয়া দিল—কোন বিপদের ভাবনা করিল না। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার প্রখর রশ্মি পর্ব্বতগাত্রে পড়িয়া অসহ্য উত্তাপ সৃষ্টি করিয়াছে। সৈনিক একটা ভুল করিয়াছিল, খেজুর গাছগুলার দিকে না শুইয়া বিপরীত দিকে শুইয়াছিল। বাহির হইয়া আসিয়া সেই নির্জ্জনে দণ্ডায়মান গাছগুলার পানে চাহিতেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

গাছগুলা একবার সে গণিয়া দেখিল, তারপর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার বুক একেবারে দমিয়া গেল। সম্মুখে যেন এক সীমাহীন সমুদ্র, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বালুকারাশি দিক-দিগন্ত জুড়িয়া বহিয়াছে; তাহার উপর খররৌদ্র প্রতিফলিত হওয়ায় সেই বালুকা যেন ইস্পাতের মত ঝকমক করিতেছে! তাহা হইতে একরূপ আগ্নেয় বাষ্প অতিসূক্ষ্ম শিখার আকারে উত্থিত হইতেছে, এবং তাহারই কারণে সমগ্র বালুভূমি যেন মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে। আকাশ এমন ভীষণ নির্ম্মল যে, তাহার উপরে চোখ রাখা যায় না—সে এক প্রচণ্ড শোভা; যেন ভূতলে-গগনে আগুন লাগিযাছে! আর সে কি ভীষণ নৈঃশব্দ্য—যেমন অভাবনীয়, তেমনই মহিমা-ব্যঞ্জক; মনে হয় যেন চারিদিক হইতে অনন্ত অসীম বিরাটের চেতনা হৃদযকে চাপিয়া ধরিতেছে। আকাশে একটু মেঘ নাই, বাতাসে শ্বাস নাই, বালুকারাশির বুকে কোথাও একটু দাগ নাই—কেবল মৃদু হিল্লোল মাত্র আছে। পরিষ্কার দিবালোকে সমুদ্রের দিক্-সীমা যেমন দেখিতে হয়, ইহারও দিক্-সীমা তেমনই একটা সুস্পষ্ট আলোক-রেখায় চিহ্নিত রহিয়াছে, সেই রেখা যেন একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারির ছেদ-রেখা।

ফরাসী সৈনিক একটা খেজুরগাছকে জড়াইয়া ধরিল, সে যেন তাহার কতই প্রিয়জন! তারপর সেই গ্রানিট-শৈলের যে স্থানটিতে খেজুরগাছের

ছায়া একটা রেখার মত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, সেই ছায়ায় বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। নির্জ্জনতা যে কত গভীর তাহাই অনুভব করিবার জন্য সে তাহার কণ্ঠ যতদূর সাধ্য মুক্ত করিয়া দিল। সেই কণ্ঠস্বর দূরে—বহুদূরে, পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে যেন হারাইয়া গেল; ধ্বনিটাই ক্ষীণ হইয়া গেল, কোন প্রতিধ্বনি হইল না—তাহার নিজের বুকেই সে একটা প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। যুবকের বাড়ী ফ্রান্সের প্রোভান্স জেলায়, তাহার বয়সও মাত্র বাইশ বৎসর,—সে তাহার বন্দুকে বারুদ ভরিল।

ঐ অস্ত্রই তাহার একমাত্র ভরসা, উহাই তাহাকে এই যাতনা হইতে মুক্তি দিবে। ভরা বন্দুকটা মাটির উপরে রাখিয়া সে আপন মনে বলিল—"থাক্‌না, সময় আসুক, উহার জন্য ভাবনা কি?"

হঠাৎ মরীচিকার কথা মনে পড়িল—সে বড় ভয়ানক। এই পাহাড়ের যে পার্শ্ব দিয়া সে পূর্ব্বদিন আরোহণ করিয়াছিল, তাহার উল্টা দিক দিয়া নামিয়া গেল। একস্থানে কয়েক টুকরা কম্বল দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এখানে তাহার আগে তাহারই মত আর কেহ আশ্রয় লইয়াছিল। একটু দূরে আরও কয়েকটা খেজুরগাছ দেখা গেল, তাহাতে প্রচুর খেজুর ফলিয়াছে। উহা দেখিয়া আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইল—জীবমাত্রেরই উহা সহজাত সংস্কার। তাহার আশা হইল, এই পথে কোন মরুযাত্রী আরবের সহিত দেখা হইতে পারে,—সেজন্যও হয়তো বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে। কিম্বা দূর হইতে কামানের শব্দও পৌঁছিতে পারে, কারণ এই সময়ে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী মিশরের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই চিন্তাই তাহায় দেহে প্রাণসঞ্চার করিল। তখন সুপক্ক খেজুরগুলিও ড় সুস্বাদু মনে হইল—প্রাণধারণের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। গভীর নৈরাশ্যের পর সে হঠাৎ একটা উন্মাদ-আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তখন পাহাড়ের শিখরে পুনরায় আরোহণ করিয়া সে একটা নিস্ফলা খেজুরগাছ কাটিতে লাগিয়া গেল, তাহাতেই বাকি দিনটা কাটিয়া গেল। তাহার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আশঙ্কা অজ্ঞাতসারে বিদ্যমান ছিল—মরুচারী জন্তুদের কথা। পাহাড়ের তলদেশে দাঁড়াইয়া কিছুদূরে যে ঝরণাটি দেখা যায়, তাহাতে উহাদের কেহ যদি রাত্রে জলপান করিতে আসে! ঐ শয়ন-গুহার প্রবেশ-দ্বার যেমন করিয়া হোক বন্ধ করিতে হইবে।

কিন্তু গাছটাকে কাটিয়া ফেলিলেও, বহু পরিশ্রম ও প্রাণপণ শক্তি-সত্ত্বেও, সে তাহাকে আবশ্যকমত খণ্ড খণ্ড করিতে পারিল না। তখন গাছটার সবুজ, সুপ্রশস্ত শাখা-পল্লব কাটিয়া লইয়া সে তদ্দ্বারা তাহার শয্যার আস্তরণ প্রস্তুত করিল। অবশেষে দিনের উত্তাপে এবং পরিশ্রমে নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া—গুহামুখে সন্ধ্যাকাশের রক্ত-যবনিকা মাত্র তুলিতে দেখিয়া, সে তাহার আর্দ্র শিলা-শয্যার উপরে শয়ন করিল, সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল।

মধ্যরাত্রে একটা অদ্ভুত শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল। কিন্তু সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সে কেবল একটা নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইল—তেমন প্রবল বেগযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস মানুষের বলিয়া মনে হয় না।

একে ঘোর অন্ধকার ও ভীষণ নিস্তব্ধতা, তার উপর সদ্য-জাগরিত অবস্থায় মাথার ভিতরে নানা অসম্ভব কল্পনা; এই সকল কারণে যুবা-সৈনিক বড়ই ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল—তাহার বুক শুকাইয়া গেল, মনে হইল মাথার চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারে যথাসাধ্য দৃষ্টি-বিস্তার করিয়া সে দুইটা অস্পষ্ট পীতবর্ণের আলোক-বিন্দু দেখিতে পাইল। প্রথমে মনে হইল, সে যেন তাহারই চক্ষুদুইটার প্রতিবিম্ব, কিন্তু ক্রমে সেই অন্ধকারেরই অত্যুজ্জ্বল বিভায় সে গুহামধ্যস্থ বস্তুগুলার অবস্থান ও আকৃতি নিরূপণ করিতে পারিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই দেখিল, তাহার সম্মুখে—মাত্র দুই পা দূরে—একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার শুইয়া আছে। সেটা সিংহ, না বাঘ, না কুমীর? প্রোভান্স-বাসী যুবকের এমন লেখাপড়া জানা ছিল না যে, কোন জন্তুর জাতি বা শ্রেণী সহজেই নির্ণয় করিতে পারে। সে কেবল ঐ প্রাণীটার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিতে লাগিল, সেটা এত কাছে যে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিতেও ভয় হইতেছিল। বন্য শিয়ালের গায়ে যেমন এক প্রকার বোটকা গন্ধ থাকে, সেই রকম—আরও তীব্র, আরও ঝাঁজালো গন্ধে গুহা ভরিয়া উঠিয়াছে। এই গন্ধ পাইবামাত্র সে প্রাণের আশা সত্যই ত্যাগ করিল—সে যে ঐ মরুর অধীশ্বর এক ভীষণ জন্তুর শয়নাগার দখল করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

কিছুক্ষণ পরে, চাঁদ আকাশ প্রান্তে নামিয়া আসায়, গুহার ভিতরটা জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইল; সেই আলোকে জন্তুটার গাত্রচর্ম্মে যে গোল-

গোল দাগ স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহাতে সন্দেহ রহিল না যে, সে এক দুর্দ্দান্ত জাতের চিতা-বাঘ (ইংরেজীতে যাহাকে 'প্যান্থার' বলে)।

উহাই মিশরদেশের পশুরাজ; দেখিতে একটা বৃহদাকার কুকুরের মত। দেহটা কুণ্ডলী করিয়া সে ঘুমাইতেছিল; চোখ দুইটা একবার মাত্র খুলিয়া তখনই আবার মুদ্রিত করিল। তাহার মুখ ছিল মানুষটার দিকে ফিরানো। যুবা-সৈনিকের মাথায় অনেক রকমের এলোমেলো চিন্তা ঘুরিতে লাগিল। প্রথমে ভাবিল বন্দুকের এক গুলিতে উহাকে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত নিকট হইতে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করা যায় না; লক্ষ্য যদি ভ্রষ্ট হয়, এবং আওয়াজে তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠে—ভাবিতেও গায়ের রক্ত হিম হইয়া যায়! দুইবার সে তরবারিতে হাত দিল, মতলব—উহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু উহার ঐ ছোট ছোট শক্ত লোম—এক কোপে কাটা যাইবে কিনা সন্দেহ, যদি বাধিয়া যায় তবে মৃত্যু অবধারিত। সে তখন উহার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে যাহা ঘটে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল; প্রতীক্ষাও বেশিক্ষণ করিতে হইল না, শীঘ্রই রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল।

এতক্ষণে জানোয়ারটাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইল। উহার মুখবিবরের বহির্ভাগ ও নাসিকা রক্তময়। মনে মনে বলিল, "আহারটা ভালরূপই সমাধা হইয়াছে দেখিতেছি।"—নরমাংস কিনা, সে চিন্তা করিল না; কেবল ইহাই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল যে, জাগিয়া উঠিয়া তখনই ক্ষুধার্ত্ত হইবে না।

বাঘ নয়—বাঘিনী। তাহার পেটের উপরকার ও দুই পাশের লোমগুলা শাদা—উজ্জ্বল শ্বেত-বর্ণ। পা'গুলার নিম্নভাগে মখমলের পটির মত গোল গোল দাগ বড় সুন্দর দেখাইতেছে, সেগুলা যেন অলঙ্কার। দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সুপুষ্ট লাঙ্গুলটিও শাদা, তাহার উপরেও বলয়ের মত কালো কালো দাগ। গায়ের উপরকার চর্ম্মাবরণটি যেন পালিশহীন সোনায় নির্ম্মিত—বড় কোমল কোথাও কুঞ্চন নাই; তাহাতে ফুল-কাটার মত ছাপ রহিয়াছে; এই ছাপ কেবল এই জাতের বাঘের গায়েই থাকে।

গুহাধিষ্ঠাত্রী এই ভীষণা গৃহিণীটি তখন অতিশয় শান্ত সুগভীর নিদ্রায় নাসিকাধ্বনি করিতেছে; নরম গদির উপরে বিড়াল যেমন করিয়া শুইয়া

থাকে, উহার শয়নভঙ্গিও তেমনই মনোহর। অতি সুগঠিত, সবল বাহু-প্রান্তে রক্তাক্ত থাবা দুইটি মাথার সম্মুখদিকে প্রসারিত রহিয়াছে—সেই থাবাই উপাধান হইয়াছে। মুখের দুই পাশে রূপার তারের মত কয়েক গাছি খাড়া-খাড়া রোম গুম্ফের মত শোভা পাইতেছে।

এমন একটি পশুকে সে যদি পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় দেখিত, তবে প্রোভান্স-বাসী যুবক নিশ্চয় তাহার রূপের প্রসংশা না করিয়া পারিত না,—তাহার গাত্রচর্ম্মের কি শোভা, রঙের কি সুষমা! এমন জমকালো পোষাক সম্রাজ্ঞীর উপযুক্তই বটে। কিন্তু এই সময়ে, ঠিক এই অবস্থায়, ঐ সৌন্দর্য্যের সহিত একটি মহা আতঙ্ক জড়িত হইয়া আছে।

ঘুমন্তেও ঐ ঘুমন্ত বাঘিনীর ভয়াল দেহকান্তিই যুবকের মনের উপরে ঠিক সেইরূপ মোহিনী শক্তি বিস্তার করিল—অজগরের দুই-চক্ষু যেমন নাকি পাখীকে মোহাবিষ্ট করে।

গোলা-বারুদ ভরা কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহার বক্ষের সাহস আরও বাড়িয়া যায়—আজ এই বিপদে সে-হেন সৈনিকের বুকও ক্ষণকালের জন্য দমিয়া গেল। কিন্তু তখনই একটা দুরূহ সংকল্প মনের মধ্যে উদয় হওয়ায় তাহার মনটা যেন হাল্‌কা হইয়া গেল—কপালে যে শীতল ঘর্ম্ম বহিতে ছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। মানুষ যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে উদ্ধারের কোন উপায় আর নাই, তখন মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া সে যেমন দেহটাকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে সমর্পণ করে, তেমনই এই ঘটনাকে চরম দুর্দ্দৈবমাত্র মনে করিয়া সে অতঃপর ইহাই স্থির করিল যে, অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত নিজের পুরুষোচিত মর্য্যাদা সে রক্ষা করিবেই।

দুইদিন আগে সেই আরব-দস্যুর হস্তে তাহার মৃত্যু-সম্ভাবনার কথা মনে পড়িল, অতএব জীবনটা তো একরূপ গিয়াই আছে। এইরূপ ধারণা করিয়া সে নির্ভয়ে এই নূতন শত্রুর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল—কি ঘটে তাহাই দেখিবার একটা প্রবল কৌতূহল তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

সূর্য্য উঠিবামাত্র ব্যাঘ্রী চক্ষু উন্মীলন করিল। তারপর থাবাগুলা খুব জোরে সঞ্চালিত করিয়া সে যেন দেহের আড়ষ্টতা দূর করিল। অতঃপর

হাই তুলিতেই তাহার সেই ভীষণ মুখগহ্বর ও তন্মধ্যস্থ খর-কর্কশ তীক্ষ্ণ-জিহ্বা নিমেষে সবখানি প্রকাশ পাইল।

ইহার পর তাহাকে ধীরে ধীরে এবং ভঙ্গিমাভরে আরাম করিয়া গড়াগড়ি দিতে দেখিয়া ফরাসী-যুবক মনে মনে বলিল—"হাঁ, শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তন্বঙ্গী রাজকুমারীই বটে!" বাঘিনী তাহার থাবার ও মুখ-নাসিকার রক্তচিহ্নগুলা চাটিয়া পরিষ্কার করিল, এবং সেই থাবা দ্বারাই বারবার এমন ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল যে তাহার প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে একটি সুষমা ফুটিয়া উঠিতেছিল। যুবক তাহা দেখিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—"হাঁ, ইহাই তো চাই'; বেশ ভালো করিয়া সাজসজ্জা করিয়া লও—তাহার পরে প্রাতঃকালীন প্রীতিসম্ভাষণ করিলেই চলিবে।" তাহার প্রাণে সাহসের সঙ্গে একটু আমোদের ভাবও জাগিতেছিল। অতঃপর সে সেই আরব-শিবির হইতে চুরী-করা ছোট ছোরাখানি মুষ্টিবদ্ধ করিল; ঠিক সেই সময়ে বাঘিনী মানুষটার দিকে মুখ ফিরাইল এবং নিস্পন্দভাবে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

তাহার দুই চোখের সেই তৈজস-পদার্থের মত কঠিন দীপ্তি দর্শনে যুবকের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—আরও কারণ, বাঘিনীটা তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। তখন প্রাণের দায়ে যুবক তাহার চোখের উপরে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া তাহাকে বশীকরণ করিতে চেষ্টা করিল—বড় কোমল আবেগ ভরা চাহনিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। একটুও নড়িল না, বাঘিনীকে খুব কাছে আসিতে দিল। তারপর যেন একটি পরমসুন্দরী রমণীর অঙ্গসেবা করিতেছে এমনই ভাবে সে অতি ধীরে ধীরে বাঘিনীর সারাদেহে—মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত—হাত বুলাইয়া দিল, তাহার সুনমনীয় পৃষ্ঠের উপরে মেরুদণ্ডের রেখাটি ধরিয়া সুড়সুড়ির মত করিয়া চুলকাইয়া দিল। বাঘিনী আলসে-লালসে তাহার লেজ নাড়িতে লাগিল, তাহার চক্ষুদুইটা কোমল হইয়া আসিল। যুবক যখন তৃতীয় বার এইরূপ অঙ্গসেবা করিল, তখন, বিড়াল যেমন সুখাবেশে একরূপ গলার শব্দ করে, বাঘিনীও তেমনই করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠের শক্তি এমনই যে, ঐরূপ সুখ-কুহরণেও সমস্ত গুহা স্পন্দিত হইতে লাগিল—ঠিক যেমন গম্ভীর-নাদী অর্গানের শেষ ঝঙ্কারে গির্জ্জার বিশাল কক্ষ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। তখন পুরুষটা তাহার শুশ্রূষার এই সুফল লক্ষ্য করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাই চালাইতে লাগিল; মহামহীয়সী ভয়ঙ্করী প্রেয়সীও তাহাতে চমকিত ও বিমূঢ় হইয়া গেল। যখন আর সন্দেহ

রহিল না যে, এই অতিশয় অস্থিরচিত্ত ভয়ঙ্করী সঙ্গিনীর হিংস্রভাব প্রশমিত হইয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব্বরাত্রে তাহার ক্ষুধা ভালরূপ মিটিয়াছিল—তখন সে গুহার বাহিরে যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, বাঘিনী তাহাতে কিছু করিল না। কিন্তু যেই সে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়াছে, অমনি, পাখীদের ডালে-ডালে লাফাইয়া চলার মত—যেন বায়ু-গতিতে, নিমেষের মধ্যে, সে যুবকের নিকটে পৌঁছিয়া তাহার পায়ে নিজের দেহ ঘর্ষণ করিতে লাগিল—বিড়ালের মত পিঠ ফুলাইয়া তুলিল। তারপর, সে এই নবাগত অতিথির পানে স্তিমিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া এমন এক আকুল চীৎকার-ধ্বনি করিল যাহাকে পশুপক্ষীবিদ্ পণ্ডিতগণ করাতের কর্কশ শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

যুবক একটু হাসিয়া মনে মনে বলিল—"মহিলাটির প্রেমে পাওনা-গণ্ডার হিসাব বড়ই কড়া দেখিতেছি।" এতক্ষণে তাহার সাহস বাড়িয়াছে, বাঘিনীর কান দুইটা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে তাহার ভয় হইল না; তাহার পেটের উপরেও হাত বুলাইয়া দিল, খুব জোরে মাথাটা আঁচড়াইয়া দিল। যখন দেখিল, এ সকলে কোন বিপত্তি ঘটিল না, তখন ছোরার ডগাটা দিয়া সে তাহার মাথার খুলির উপরে অতিমৃদু আঘাত করিল; সেটাকে উহার মাথায় বসাইয়া দিবার উপযুক্ত অবকাশ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু হাড় এত শক্ত যে পিছলাইয়া যাইবার ভয়ে তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

মরু-রাজ্যের সেই মহিমময়ী সুলতানা অতঃপর তাঁহার অনুরক্ত সেবকের প্রতি বিশেষ প্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন—গ্রীবা প্রসারিত করিয়া মাথাটি তাহার পানে তুলিয়া ধরিলেন, এবং অতিশয় শান্তভাব ধারণ করিয়া সুগভীর আহ্লাদ জ্ঞাপন করিলেন। ফরাসী সৈনিকের হঠাৎ মনে হইল, এই ভীষণা মরু-সুন্দরীর হত্যাসাধন করিতে হইলে, সজোরে ছোরার একটিমাত্র আঘাতে উহার কণ্ঠচ্ছেদ করিতে হইবে।

যেমনই সে ছুরীখানা তুলিয়াছে, বাঘিনীও ঠিক সেই সময়ে যেন আহ্লাদে তাহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া এমন দৃষ্টিতে যুবকের মুখপানে চাহিতে লাগিল যে তাহাতে আর উগ্রতা নাই—সে দৃষ্টি বড় কোমল হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী সৈনিক তখন একটা খেজুরগাছে ঠেস দিয়া খেজুর খাইতে আরম্ভ করিল। একবার সে দূরে মরুভূমির পানে চাহিয়া দেখে, উদ্ধারকারী কোন

জন-মানুষের চিহ্ন আছে কিনা, পরক্ষণেই সেই ভীষণা সহচরীর উপরে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তাহার ঐ মেহেরবানি আর কতক্ষণ থাকিবে কে জানে ?

খেজুরের আঁটিগুলা যেখানে পড়িতেছিল, বাঘিনী সেইদিকে তাকাইতেছিল ; সে যেমনই একটা একটা করিয়া ছুঁড়িতে থাকে অমনি বাঘিনীর চোখে ঘোরতর সন্দেহের ভাব ফুটিয়া উঠে।

সে এই মানুষ-জন্তুটিকে অতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে—একজন পাকা যাচনদারের মত যাচাই করিয়া লইল। যাচাইএর ফল ভালোই হইল, কারণ, সিপাহির সেই সামান্য আহার শেষ হইবামাত্র বাঘিনী তাহার ক্ষুরধার জিহ্বার দ্বারা যুবকের জুতা-জোড়া এমন করিয়া চাটিতে লাগিল যে, চামড়ার খাঁজে যেখানে যেটুকু ধুলা ছিল সব পরিষ্কার হইয়া গেল।

ফরাসী-সৈনিক ভাবিতে লাগিল, "এখন তো বেশ শান্তশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে ?" এই ভাবনায় শিহরিয়া উঠিলেও সে ঐ জন্তুটার দেহের গঠন ও তাহার অঙ্গশ্রী বেশ একটু আগ্রহ ভরে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ; বস্তুত ঐ জাতের বাঘ সাধারণতঃ যেরূপ সুন্দর হয় এই বাঘিনী তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। উঁচুতে তিন-ফুট, লম্বায়—লেজ বাদ দিয়া—চার ফুট, লেজটা প্রায় তিন ফুট লম্বা—গোল করিয়া কাটা একগাছা মোটা লাঠির মত ; তাহার বলও কম নয়। মাথাটির আয়তন সিংহিনীর সমান, এবং মুখের গঠনেও একটি সুকুমার আভিজাত্য আছে। বাঘিনীর মতই দেখিতে হিংস্র হইলেও, সে মুখ যেন ভোগপিপাসু সুন্দরী রমণীর মুখ। বলিতে কি, এই নির্জ্জনবিহারিণী মরু-সম্রাজ্ঞীর মুখে, সুরামত্ত রোম-সম্রাট ভিটেলিয়াসের মতই একটা প্রমোদ-পিপাসা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ! রক্ত পান করিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা শান্ত হইয়াছে, এখন সে একটু স্ফূর্ত্তি চায়।

সৈনিক-যুবার একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, সে একটু ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে কি না। বাঘিনী কোন আপত্তি করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কেবল চক্ষুর দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অতিশয় সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল ; সে দৃষ্টি প্রভুভক্ত কুকুরের মত নয়—যেন একটা প্রকাণ্ড বিড়ালীর দৃষ্টি।

ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় একটু এদিক-ওদিক চাহিতেই তাহার নজরে পড়িল, ঝরণার পাশে তাহার সেই ঘোড়াটার মৃতদেহের কতকাংশ পড়িয়া

আছে,—বাঘিনী তাহাকে অতদূর হইতে টানিয়া আনিয়াছে! প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই শেষ করিয়াছে। দেখিয়া তাহার প্রাণে একটু ভরসা হইল। গত সন্ধ্যায় বাঘিনী যে কেন ঘরে ছিল না, কেনই বা নিদ্রাবস্থায় তাহার উপরে কোন উৎপাত করে নাই, এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারা গেল। এখানে আসিয়াই এই যে সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, ইহার মত পরেও কোন শুভ-যোগ ঘটিতে পারে মনে করিয়া, সে একটু ভরসা পাইল; এমন অসম্ভব আশাও করিল যে, সারাদিনটা বাঘিনীর সঙ্গে ভাল ভাবেই কাটিবে,—ততক্ষণ সে তাহাকে পোষ মানাইবার ও প্রসন্ন রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

বাঘিনীর নিকটে ফিরিয়া আসিতেই সে যাহা লক্ষ্য করিল তাহাতে আনন্দের অবধি রহিল না। কাছে আসিতেই বাঘিনী তাহার লেজটা এত ধীরে নাড়িতে লাগিল যে, সহসা তাহা চোখেই পড়ে না। দেখিয়া সে নির্ভয়ে তাহার পাশটিতে বসিয়া পড়িল, তাহার সহিত খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। সে তাহার থাবা তুলিয়া ধরিল, মুখে হাত দিল, কান ধরিয়া টানিল, তাহাকে চিৎ করিয়া মাটির উপরে গড়াইয়া দিল, তাহার দেহের তপ্ত-কোমল পার্শ্বদেশে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে লাগিল। বাঘিনী তাহাকে তাহার খুশী-মত সবই করিতে দিল; সে যখন তাহার পায়ের নীচে থাবার উপরকার লোমগুলিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল তখন বাঘিনী থাবার নখগুলা অতি সাবধানে ভিতরে টানিয়া লইল, পাছে যুবকের হাতে আঘাত লাগে।

ফরাসী সৈনিক এক হাতে ছোরা রাখিয়াছিল; কেবলই ভাবিতেছিল, এখন বাঘিনীর মনে কোন সন্দেহ আর নাই, অতএব এই সময়ে তাহার পেটের মধ্যে ছোরাটা বসাইয়া দিলে কেমন হয়? কিন্তু ভয় হইল, পাছে মরণকালেও বাঘিনী সকল শক্তি একত্র করিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। তা ছাড়া, তাহার প্রাণে একটা দুঃখ হইতেছিল—আহা, সে তো তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই, বিনা দোষে তাহাকে হত্যা করিবে কেমন করিয়া? বরং এই সীমাহীন মরু-প্রান্তরে তবু একটা সঙ্গী জুটিয়াছে। হঠাৎ কেমন যেন আপনা হইতেই তাহার দেশের সেই তাহার প্রথম প্রণয়িনীর কথা মনে পড়িল; সে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'স্নেহময়ী' নাম দিয়াছিল, তার কারণ, সে ছিল যেমন সন্দিগ্ধা তেমনই হিংস্র-স্বভাব;

যতদিন সে তাহার সহিত প্রেম করিয়াছিল ততদিন তাহার ভয় ছিল, কোন্‌দিন সে তাহাকে ছুরী মারিয়া বসে।

সেই প্রথম যৌবনের স্মৃতি তাহার মনে একটা বুদ্ধি যোগাইয়া দিল। সে তো এক্ষণে অনেকটা ভয়শূন্য হইয়াই, ঐ বাঘিনীর রূপ-যৌবন দর্শন করিতেছে; তাহার আঁট-সাঁট পরিপুষ্ট দেহ, লঘু ললিত গতি, এবং সর্ব্বাঙ্গের কোমল স্পর্শ তাহাকে যখন এমন মুগ্ধ করে, তখন ঐ যুবতী-বাঘিনীকে সেই নামে ডাকিলে, এবং তাহাতেই সাড়া দেওয়ার অভ্যাস করাইলে মন্দ কি? ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ততক্ষণে সে তাহার সেই ভয়ানক অবস্থাটা প্রায় সহাইয়া লইয়াছে,—এমন কি, সেই অবস্থাই যেন প্রীতিকর হইয়া উঠিল! অবশেষে তাহার সঙ্গিনীরও এমন অভ্যাস হইল যে, যখনই সে তাহাকে আদরের সুরে 'স্নেহময়ী' বলিয়া ডাকে, তখনই সে মুখ তুলিয়া তাহার পানে চায়!

সূর্য্য পাটে বসিলে, 'স্নেহময়ী' কয়েকবার দৌড়াদৌড়ি করিল, শেষে একটি গভীর বিষাদপূর্ণ আওয়াজ করিল,—তাহা দেখিয়া যুবা-সৈনিক রঙ্গভরে বলিয়া উঠিল—"মেয়েটি বেশ সুশিক্ষিতা বটে; সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনাটা সারিয়া লইতেছে।" তাহার এই রসিকতার কারণ—সে লক্ষ্য করিল, বাঘিনী হঠাৎ অতিশয় শান্ত ও স্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। তখন সে মনে মনে স্থির করিল, বাঘিনীটা ঘুমাইয়া পড়িলেই সে যতশীঘ্র সম্ভব ঐ স্থান হইতে চম্পট দিবে, রাত্রিটার জন্য আর কোথাও একটু আশ্রয় খুঁজিয়া লইবে। তাই তখনই তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আর নয়, এসো কোমলাঙ্গী প্রেয়সী আমার! তুমিই আগে শয়ন করিবে চল।"

ইহার পর পলায়ন-কালের অপেক্ষায় সে অধীর হইয়া উঠিল; যেমনই সেই সময়টি আসিল অমনি সে উর্দ্ধশ্বাসে নীল-নদের অভিমুখে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু সেই বালুভূমির উপর দিয়া এক মাইলও না যাইতে সে শুনিতে পাইল, তাহার পিছনে বড় বড় লাফ দিয়া বাঘিনী ছুটিয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই করাত দিয়া কাঠ-কাটার মত শব্দ করিতেছে—সে শব্দ তাহার পদশব্দের চেয়ে ভয়ানক।

সৈনিক বলিয়া উঠিল—"বটে! এ যে দেখিতেছি আমার উপরে মহিলাটির প্রেম-দৃষ্টি পড়িয়াছে! আর কাহারও সহিত উহা ঘটে নাই বলিয়া মনে

হইতেছে, আমিই প্রথম,—তাহা হইলে একটু গর্ব্ব করিতে পারি।” কথাগুলি বলিবা মাত্র, সেই মুহূর্ত্তে যুবক একটা চোরা-বালির মধ্যে পড়িয়া গেল; পথিকদের পক্ষে এমন অবস্থা খুবই সাংঘাতিক, রক্ষা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। পা দুইটা হঠাৎ ঐরূপ বদ্ধ হইয়া যাওয়ায় সে দারুণ আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঘিনী তৎক্ষণাৎ তাহার মোটা জামার কলারটা দাঁত দিয়া ধরিয়া এমন জোরে পিছন পানে একটা লাফ দিল যে, তাহাতেই সে যেন যাদু-মন্ত্রবলে সেই চোরা বালির ঘূর্ণ্যাবর্ত্ত হইতে যুবককে বাহিরে টানিয়া আনিল।

তখন ফরাসী-সৈনিক তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে করিতে বলিল “আর কি, স্নেহময়ী! এখন হইতে আমরা জীবনে-মরণে পরস্পরের সাথী হইলাম—আর তামাসা নয় কিন্তু!” এই বলিয়া সে আবার তাহার সঙ্গে সেই গুহায় ফিরিয়া চলিল।

সেই দিন হইতে মরুভূমি আর নির্জ্জন মনে হইল না। অন্ততঃ এমন একজন আছে যাহার সঙ্গে সে কথা কহিতে পারে। বাঘিনীর সেই হিংস্রভাবও সে অনেকটা কোমল করিয়া আনিয়াছে। এই বন্ধুত্ব যে কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে না। রাত্রে জাগিয়া থাকিয়া জীবনটা নিরাপদ করিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হউক না কেন, তবু সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন সকালে জাগিয়া উঠিয়া সে ‘স্নেহময়ী’কে দেখিতে পাইল না। পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া দাঁড়াইতেই, দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বাঘিনী লম্বা লম্বা লাফ দিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল; ঐ জাতের জন্তুরা ঠিক ছুটিতে পারে না—শির-দাঁড়া অতিশয় নমনীয় বলিয়া, উহারা ঐরূপ লাফাইয়া চলে। ‘স্নেহময়ী’ নিকটে আসিলে দেখা গেল, তাহার মুখ রক্তমাখা; সেই অবস্থাতেই সঙ্গীর নিকটে তাহার প্রাপ্য আদর সে আদায় করিয়া লইল—তাহাতে তাহার যে কত সুখ হইতেছে তাহা ও গলার ঘড় ঘড় শব্দে প্রকাশ না করিয়া পারিল না। চোখ দুইটি যেন আলসে মুদিয়া আসিতেছে—বড় নরম সেই চাহনি—প্রোভান্সবাসী যুবকের পানে সে চাহিয়া আছে। পোষা জন্তুর সঙ্গে লোকে যেমন কথা কয়' সে-ও তাহার সঙ্গে তেমনই কথা কহিতে লাগিল।

"আহা, বড় ভালো মেয়ে তুমি, মাদ্‌মোয়াজেল! কেহ কি এমনটি কখনো দেখিয়াছে! ঠিকই ত! একটু বেশী আদর চাই বই কি! কিন্তু কি লজ্জার কথা বল দেখি! তোমার কি একটু লজ্জা নাই? নিশ্চয় আজ একটা মানুষ ধরিয়া খাইয়াছ! আরব, না আর কোন জাতের? না, তাহাতে খুব বেশি দোষ হয় না—তাহারাও তো প্রায় তোমারই মত জানোয়ার! কিন্তু তাই বলিয়া তুমি যেন ফরাসী-মানুষ ধরিয়া খাইও না। তাহা হইলে আমি আর তোমাকে আদর করিব না।"

ঠিক যেন মনিবের সঙ্গে পোষা-কুকুরের মত সে খেলা করিতে থাকে। তাহাকে গড়াগড়ি খাওয়াইয়া, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া, বা চাপড়াইয়া—যেমন করিয়াই খেলা কর তাহাতেই সে খুসী। এক একবার সে নিজেই যুবকের মুখের সম্মুখে তাহার থাবা তুলিয়া ঐরূপ করিবার জন্য তাহার বাসনা জানায়।

এমনই ভাবে কয়েকদিন কাটিল। এইরূপ একটি সঙ্গীলাভ করার পর প্রোভান্সবাসী যুবা মরুভূমির সুগম্ভীর রূপ ভালো করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইল। খাদ্যও প্রচুর মিলিতে লাগিল; মনে কত বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে লাগিল; জীবনটা আর একঘেয়ে রহিল না। সে এই নির্জ্জনতার রহস্যও যেমন, তেমনই তাহার রসও উপলব্ধি করিতে শিখিল। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে সে আকাশে এত রকমের শোভা দেখিতে পাইল, যাহা সাধারণ মানুষে কখনো দেখে নাই। মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া গেলে সে তাহার শব্দে এমন রোমাঞ্চ কখনো অনুভব করে নাই—সে যেন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা! মেঘগুলাকে এমন রং বদল করিতে ও পরস্পরের সহিত এমনভাবে মিশিয়া যাইতে সে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। রাত্রিকালে সেই বালু-সমুদ্রের উপরে জ্যোৎস্নার মায়াময় আলো-ছায়া সে মুগ্ধনেত্রে দেখিয়া থাকে; মরু-বায়ুর ঘূর্ণাবেগে সেই অপূর্ব্ব আস্তরণখানি আন্দোলিত হয়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই আন্দোলনের দিক্-পরিবর্ত্তন হয়। প্রাচ্যদেশের জ্যোতির্ম্ময় দিবা তাহার চক্ষু ঝলসিয়া দেয়; সীমাহীন বালুপ্রান্তরের উপর দিয়া মত্ত ঝটিকা ছুটিয়া আসে—আলোয় অন্ধকারে বালুকণা রক্তবর্ণ ধারণ করে। জললেশহীন কুজ্ঝটিকা ও মৃত্যুবর্ষী মেঘেদের গমনাগমনে দিনগুলা কুৎসিত হইয়া উঠে; শেষে যখন রাত্রি আসে, তখন প্রাণ পুলকিত হয়, কারণ তখন অগণিত তারার সঞ্জীবন সুখশীতল রশ্মিধারা ঝরিতে আরম্ভ হয়—আকাশে যেন একটা গানের সুর ছড়াইয়া পড়ে। তখন সেই নির্জ্জনতার আবেশে তাহার মনের ভিতরে স্বপ্নের

দ্বার খুলিয়া যায়—ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে তুচ্ছতম বস্তুর স্মরণ-সুখে মগ্ন হইয়া থাকে, অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইয়া দেখে।

অবশেষে সেই বাঘিনীর উপরে তাহার একটা মায়া জন্মিল—স্নেহ-মমতার একটা অবলম্বন যে বড়ই আবশ্যক। হয়তো নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে বাঘিনীর স্বভাব কোমল করিতে পারিয়াছিল; কিম্বা হয়তো, শিকারে বাহির হইয়া বাঘিনী সে সময়ে প্রচুর ভক্ষ্য সংগ্রহ করিতেছিল,—যে কারণেই হোক, সে মানুষটার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল, তাহার প্রতি হিংসা-দৃষ্টি করে নাই। সৈনিক যুবাও তাহাকে এমন পোষ মানিতে দেখিয়া আর ভয় করিত না।

অধিকাংশ কাল সে ঘুমাইয়া কাটাইত; যদিও জালের মধ্যে উপবিষ্ট মাকড়সার মত তাহার দৃষ্টিকে সর্ব্বদা সজাগ রাখিতে হইত—পাছে দূর দিগন্তরেখার উপরে কোন মনুষ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব তাহার চক্ষু এড়াইয়া যায়,—তাহার মুক্তিলাভের লগ্নটি ভ্রষ্ট হইয়া যায়। নিজের শার্টখানা খুলিয়া তাহাকে নিশানার মত করিয়া সে একটা খেজুর গাছের মাথায় আটকাইয়া দিয়াছিল; পাছে ঢাকা পড়ে, সেজন্য গাছটার ডালপালা কাটিয়া দিয়াছিল। আবার পাছে বাতাসে তাহা গুটাইয়া যায়, দূর হইতে মরুযাত্রী পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, তাই কতকগুলি কাঠের সাহায্যে শার্টখানাকে সে ছড়াইয়া রাখিয়াছিল।

যখন সময় আর কাটিতে চাহিত না, উদ্ধারের আশাও ক্ষীণ হইয়া আসিত, তখনই সে বাঘিনীটাকে লইয়া একটু প্রফুল্লতার চেষ্টা করিত। সে এখন তাহার রকমারি আওয়াজের অর্থ বুঝিতে পাবে, চোখের চাহনিব নানা ভঙ্গি এখন আর তাহার অপরিচিত নয়। বাঘিনীর গায়ের সেই সোনার বসন-খানির উপরে যে সব খেয়ালী নক্সা আঁকা রহিযাছে, সে তাহা ভালো করিয়া পরীক্ষা করিত। তাহার লেজের অগ্রভাগে যে লোমের পুচ্ছটি রহিয়াছে, সে যখন সেইটি তুলিয়া ধরিয়া বালার মত গোল গোল দাগগুলা গণিয়া দেখিত—আর সেগুলা গহনার মতই সূর্য্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিত, তখন 'স্নেহময়ী' কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইত না। তাহার সেই আঁট-সাঁট পরিপুষ্ট দেহের সুন্দর ডৌল-রেখা, পেটের উপরকার লোমগুলির সেই শুভ্রতা এবং মাথার গঠন-ভঙ্গীর একটি অপূর্ব্ব শ্রী—এই সবলের প্রতি নিবিষ্ট মনে চাহিয়া থাকিতে বড়ই ভাল লাগিত। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগিত খেলা করিবার সময়ে তাহার

সেই রূপ উপভোগ করিতে। তাহার যৌবন-সুলভ চাঁপল্য—চলা-ফেরার সেই লঘু-ললিত ভঙ্গি সৈনিক-যুবার নিত্য-নব বিস্ময় উৎপাদন করিত। সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিত, ঐ যুবতী বাঘিনী কেমন অবলীলায় তাহার দেহখানি নোয়াইয়া বাঁকাইয়া লাফ দেয়—নামে-উঠে; গাত্রমার্জ্জনা-কালে লোমগুলি কেমন সমান করিয়া লয়; মাটির উপরে উঁচু হইয়া বসিয়া লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করে। সে যতই দ্রুত লাফাইতে থাকুক, নামিবার পথে পাহাড়ের গা যতই পিছল হউক, একবার 'স্নেহময়ী' বলিয়া ডাকিলেই তৎক্ষণাৎ থামিয়া যাইবে।

একদিন দুপুর বেলায় জ্বলন্ত রৌদ্রে আকাশে একটা প্রকাণ্ড পাখী উড়িয়া যাইতেছিল। যুবক বাঘিনীকে ছাড়িয়া এই নূতন আগন্তুকটির পানে চাহিয়া রহিল; তাহাতে, মুহূর্ত্তমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্গীর এই অনাদরে, মহারাণী গভীর স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"আরে! ইহারও যে ঈর্ষ্যা আছে!"—বলিযা সৈনিক-যুবা ফিরিয়া চাহিতে দেখিল, বাঘিনীর চোখদুইটার চাহনি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তখন সে বলিয়া উঠিল—"উহার দেহে আমার ভার্জ্জিনীর আত্মা নিশ্চয় ঢুকিয়া বসিয়াছে!"

ঈগলটা দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল; সৈনিক তখন মুগ্ধনেত্রে বাঘিনীর দেহ-সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ কবিতে লাগিল।

সত্যই কি সুন্দর তাহার দেহ-শ্রী! যৌবন যেন উছলিয়া উঠিতেছে। সুন্দরী যুবতীর মতই তাহাব অঙ্গলাবণ্য। সোনাব মত গৌরবর্ণ তাহার ঐ রোমাবলী,—উদরতলের অতি-কোমল শ্বেত-আভাব সহিত কেমন সুষমায় মিলিয়া গিয়াছে!

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের অপরিমিত আলোকে, প্রাণীদেহের সেই জীবন্ত স্বর্ণপট ও তাহার উপরকাব সেই ঈষৎ-রক্তিম ছাপগুলি এমন একটি প্রভা ধারণ করিল যে তাহার প্রতি চাহিলে চোখ আর ফিরাইতে পারা যায় না।

মানুষ ও বাঘিনী দুইজনে দুইজনের পানে চাহিল—সে চাহনির ভাষা দুইজনেই বুঝিল। প্রিয়জনের হাতখানি যখন তাহার মাথার উপরে মৃদু আঘাত করিতে লাগিল, তখন স্পর্শসুখে সেই হাবভাবময়ী, বিলাসিনী ব্যাঘ্র-ললনার সারাদেহে শিহরণ জাগিল; তাহার চোখদুইটি একবার

বিদ্যুতের মত জলিয়া উঠিয়াই তখনই দৃঢ়-মুদ্রিত হইয়া গেল। বালুকা-রাজ্যের অধীশ্বরীর এই স্তব্ধতা লক্ষ্য করিয়া যুবা-সৈনিক বলিয়া উঠিল—"মানুষের মত ইহারও আত্মা আছে!" তারপর সে তাহার সেই নিশ্চল মূর্ত্তির প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল; চারিদিকের বালুকারাশির মতই তাহার নিঃসঙ্গতা,—সে তেমনই শুভ্র, তেমনই স্বর্ণকান্তি, তেমনই বহ্নিময়!

আমার সেই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি বললেন "হাঁ, আমি আপনার গল্প পড়েছি। পশুদের পক্ষ থেকে আপনার যা' বলবার আছে তা' বুঝলাম, কিন্তু শেষটা কি হ'ল তা' তো লেখেন নি?—ঐ দু'জন মানুষ আর পশু—ওদের মধ্যে এমন একটা মিল, এমন যে বোঝাপড়া, তার পরিণামটা কি দাঁড়ালো—সেটাও জানা চাই তো?"

"জানেন তো, প্রেম যেখানে খুব বড় আর গভীর হয়ে ওঠে, সেখানে একটুখানি ভুল-বোঝার দোষে কি সর্ব্বনাশ হয়ে যায়! ওদেরও তাই হয়েছিল। কোন কারণে একজন আর একজনকে হয়তো অবিশ্বাসী মনে করে; অভিমান ক'রে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেও চায় না—স্রেফ্ জিদের বশে একটা বিবাদ বাধিয়ে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে।"

"তবু মাঝে মাঝে এমনও তো হয় যে, কোন শুভ মুহূর্ত্তে, একটি কথায় বা একটি চাহনিতেই সব মিটে যায়। সে যাই হোক, আপনি গল্পটা শেষ ক'রে ফেলুন।"

"সে এমন একটা ব্যাপার যে ভাষায় প্রকাশ করা মুশ্কিল। বুঝতেই পারছেন, সে-কথা সেই বুড়ো বদমায়েসটা শ্যাম্পেনের মুখেই বল্‌তে পেরেছিল। বললে, 'তার লেগেছিল কিনা বলতে পারিনে; কিন্তু সে তখনই ঘাড় ফিরিয়ে—যেন রেগে উঠে' তার ভীষণ দাঁতগুলো দিয়ে আমার একটা পা কামড়ে' ধরলে, অবিশ্যি খুব জোরে নয়—আস্তে। কিন্তু তাতেই আমার ভয় হ'ল বুঝি এইবার আমায় খেয়ে ফেলবে! দিলাম তখনই আমার সেই ছোরাখানা তার গলায় আমূল বসিয়ে। সে মাটির উপর গড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা আর্ত্তনাদ করে উঠল যে, শুনে আমার বুকের রক্ত হিম হ'য়ে গেল। আমার চোখের উপরেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেল,—

তখনো তার চাহনিতে একটু ক্রোধের চিহ্ন নেই! আহা, যদি সর্ব্বস্ব দিয়েও তার প্রাণটা ফিরিয়ে আনতে পারতাম! আমার মনে হ'ল, আমি যেন একটা সত্যিকার মানুষ খুন করেছি। পরে, আমার সেই নিশানটা দেখতে পেয়ে সৈনিকেরা যখন আমাকে উদ্ধার করতে এলো, তখনো আমার কান্না থামেনি'।"

"একটু চুপ করে' থাকার পর আমাকে বললে, 'দেখ হে, ঐ ঘটনার পরে, জার্ম্মেনি, স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স সর্ব্বত্র যুদ্ধ করেছি, আমার এই লাসখানা অনেক দূর ব'য়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু মরুভূমির মত এমন আর কিছু দেখলাম না—সত্যিই কি সুন্দর!"

আমি বললাম, "তেমন জায়গায় কী এমন ভাব জাগত তোমার প্রাণে?"

"আহা! সে কি বোঝানো যায় হে ছোকরা? তা ছাড়া, সেই খেজুর গাছ আর সেই বাঘিনীটার জন্যে আমি সব সময়ে মন খারাপ করি নে; তা' করলে কি আর রক্ষে আছে? প্রাণটা যে একেবারে মুষড়ে পড়বে! মরুভূমিতে কেমন যেন সবই আছে, আবার কিছুই নেই!"

"জানলাম, কিন্তু কথাটা একটু বুঝিয়ে বল দেখি?" প্রশ্নটা তার যেন ভাল লাগল না, একটু জোর দিয়ে ব'লে উঠল, "বল্‌ব তবে? সেখানে যেন একমাত্র ঈশ্বর আছেন, মানুষ নেই।"*

---

* 'ঈশ্বর' অর্থে—প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি; 'মানুষ নেই'—ইহার অর্থ, মানুষের যতকিছু হিতাহিত বোধ, ন্যায় ও নীতির সংস্কার সেখানে অচল। —অনুবাদক।

সাগরিকা

কাল ৩১শে ডিসেম্বর গিয়াছে।

আমি আমার বাল্যবন্ধু জর্জ্জেস্ গেরিনের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছি, এমন সময়ে তাহার ভৃত্য একখানা শীল-করা চিঠি আনিয়া দিল, তাহাতে পোষ্ট-চিহ্ন ও বিদেশীয় ডাক-টিকিট রহিয়াছে।

জর্জ্জেস্ বলিল, 'তোমার আপত্তি নাই ?'

'কিছু না।'

সে তখন ইংরাজীতে, মোটা-মোটা অক্ষরে, বাঁকা লাইনে লেখা আট-পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রখানি পড়িয়া যাইতে লাগিল। যেরূপ ধীরে ধীরে অতিশয় মনোযোগ করিয়া পড়িতেছিল, তাহাতে বুঝিতে পারিলাম, পত্রে তাহার অতি প্রিয় সমাচার আছে।

শেষ হইলে পত্রখানি ম্যাণ্টেল্‌পীসের উপর রাখিয়া আমাকে বলিল, ও একটা ভারী মজার ব্যাপার,—তোমাকে এতদিন বলি নাই,—একটা নভেলি কাণ্ড,—সে একবার হয়েছিল। ওঃ, সেবারকার নববর্ষের দিনটা কি অপূর্ব্ব হয়েই উঠেছিল! সে আজ বিশ বৎসরের কথা,—আমার বয়স তখন ত্রিশ, আর এখন পঞ্চাশ।

আমি তখন জাহাজ-বীমা-অফিসের ইন্‌স্পেক্টার, এখন যেখানকার চেয়ার-ম্যান হয়েছি।

১লা জানুয়ারী দিনটা সাধারণ পর্ব্বদিন বলিয়া পারী-তে যাপন করিব স্থির করিলাম, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পত্রে জ্ঞাত হইলাম

যে আমাকে তৎক্ষণাৎ 'আইল-দে-রে' নামক স্থানে যাইতে হইবে, সেখানে আমাদের আফিসে বীমা-করা এক খানি জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। তখন বেলা আটটা, আমি দশটার সময় কোম্পানীর আফিসে গিয়া পরামর্শ লইলাম এবং সেইদিনই অপরাহ্ণের ট্রেনে উঠিবা পরদিন 'লা রোসেলে' নামিয়া পড়িলাম। সে দিন ৩১শে ডিসেম্বর।

প্রায় দুই ঘণ্টা 'লা রোশেলে'র প্রাচীন রাজপথে ঘুরিয়া আসিয়া যথা সময়ে একখানি কালো ষ্টীমারে 'আইল-দে-রে' অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দিনটা নিরানন্দ, অতিশয় অবসাদকর ছিল; এমন দিনে চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়, অন্তর পীড়িত হয়—যেন সমুদয় শক্তি ও উদ্যম লুপ্ত হইয়া যায়; অতি শীতল ধূসরালোক দিবা, ঘন কুয়াসা বৃষ্টিপাতের মত চারিদিক ভিজিয়া দিতেছে।

এই কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন আকাশের নীচে, বহুদূরবিস্তৃত বালুকিনারায়, অগভীর এবং হরিদ্রাভ সমুদ্রজলে তরঙ্গের লেশ ছিল না—একটুও কম্পন, জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না। ষ্টীমারখানি স্বভাববশে একটু দুলিয়া যাইতেছিল, পশ্চাতেব আন্দোলিত জলরাশি শীঘ্র শান্ত হইতেছিল।

আমি কাপ্তেনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলাম; লোকটি খর্ব্বাকৃতি, পদযুগল হ্রস্ব; দেহ জাহাজখানির মতই গোলাকার এবং সর্ব্বদাই দুলিতেছে। আমি যে দৈববিপাকের অনুসন্ধানে যাইতেছিলাম, তাহাবই বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা আমার উদ্দেশ্য। 'সেণ্ট্-নাগেয়ার' নামক স্থান হইতে 'মারী জোসেফ্'-নামক একখানি বড় জাহাজ 'আইল-দে-রে'-র সন্নিকটে বালুচরে প্রবেশ করিয়াছে।

যে ব্যক্তির সম্পত্তি, তিনি লিখিয়াছেন, ঝড়ে জাহাজখানি এত উপরে উঠিয়া পড়িয়াছিল, যে তাহাকে সে অবস্থায় বাহিব করিয়া আনা অসম্ভব, এবং সময়ও এত অল্প ছিল যে, মালপত্র বা জাহাজের খুলিয়া লইবার মত সাজসজ্জা বাঁচাইবার উপায় ছিল না। সেজন্য জাহাজখানির প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য, তাহার মূল্য কত হইতে পারে এবং তাহাকে সেখানে ফেলিয়া আসিবার পূর্ব্বে ভাসাইবার কোনও চেষ্টার ক্রটি হইয়াছিল কি না, এই সকল অনুসন্ধানের ভার আমার উপরে ছিল। আমি

কোম্পানীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলাম। যদি ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায় তবে তাহাদের পক্ষে আমাকে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

আমি রিপোর্ট পাঠাইলে পর কোম্পানীর পরিচালকগণ আমাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যাহা কিছু করিবার করিবেন।

কাপ্তেন ঘটনাটা খুব ভালরূপই জানিত, কারণ জাহাজ ও মালপত্র রক্ষা করিবার জন্য সেও ষ্টীমার লইয়া যোগ দিয়াছিল। সে অতি সংক্ষেপে আসল কথাটা এইরূপ বিবৃত করিল। 'মারী-জোসেফ্' ভীষণ বাত্যা-বিতাড়িত হইয়া রাত্রিকালে পথ হারাইয়া ফেলে; সমুদ্র তখন ফেনময়,—কাপ্তেন বলিল, 'দুধের মত শাদা', সে তাহারই উপর অন্ধ হইয়া চলিতে চলিতে এখানকার এক বালুচরে বাধিয়া গিয়াছে। এইরূপ অল্পজলমগ্ন বালুচর ভাঁটার সময় এদিক্‌কার উপকূলে বহুদূরবিস্তৃত সাহারা-মরুভূমির মূর্ত্তি ধারণ করে।

গল্প করিতে করিতে আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। দূরে সমুদ্রের উপর আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ঠিক মাঝখানে, অনেক দূর চক্ষু চলিতে পারে—এমন একটি স্থলভাগ দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,

"ঐ কি 'আইল-দে-রে' দেখা যাইতেছে?"

"হাঁ, মহাশয়।"

হঠাৎ সম্মুখের দিকে দক্ষিণ হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া, আমাকে দূরে, কূল এবং দিগন্তরেখার প্রায় মধ্যস্থলে, একটা অতি অস্পষ্ট পদার্থ দেখাইয়া বলিল,

"ঐ দেখুন আপনার জাহাজ!"

"মারী জোসেফ্?"

"হাঁ"

আমি বিস্মিত হইলাম। এই প্রায় অদৃশ্য কৃষ্ণবিন্দুটি কূল হইতে অন্ততঃ তিন মাইল দূর হইবে। আমি আপত্তি করিলাম, বলিলাম,

"কিন্তু কাপ্তেন, তুমি যে স্থানটি দেখাইতেছ, ওখানে জল দুই শত হাত গভীর হইবে।"

সে হাসিতে লাগিল।

"দু'শো হাত! কি বলেন, মশায়! দু' হাতও হবে না, বলে দিচ্ছি।"

লোকটার 'বোর্দো'য় বাড়ী। পুনরায় বলিল,

"এই এখন সাড়ে ন'টা, জোয়ার এসেছে। আড়াইটার সময় হোটেলে আহারাদির পর হাতদুটি পকেটে রেখে এই বালির উপর দিয়ে চলে যাবেন, ভাঙ্গা জাহাজে পৌছতে জুতায় একটুও জল লাগ্‌বে না! কিন্তু সাত কোয়ার্টার বা দু'ঘণ্টার বেশী যেন ওখানে থাকবেন না, তা হলে জোয়ারের মুখে পড়বেন। এখানকার চড়াও ঠিক ছারপোকার পিঠের মতন সমান-করা। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিটের সময় ফিরবেন, দেখবেন যেন দেরী না হয়—তা' হলে সাড়ে সাতটার সময় ষ্টীমারে নির্ব্বিঘ্নে পৌছবেন, আর আজই সন্ধেয় 'লা রোসেল'এর জেটিতে নেমে পড়তে পারবেন।"

আমি কাপ্তেন্‌কে ধন্যবাদ দিয়া একটু অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র 'সেণ্ট্‌ মার্টিন' সহর দেখিতে লাগিলাম—তখন অনেক নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমি একটা ক্ষুদ্র অন্তরীপ-মুখে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; তারপর সমুদ্র যখন দ্রুত নামিয়া যাইতে লাগিল, আমিও বিস্তৃত বালুকারাশি পার হইয়া দূরে—অতি দূরে জলের উপর যে একটা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরস্তূপের মত দেখা যাইতেছিল, তাহার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অতি দ্রুতপদে এই হরিদ্রাবর্ণ বালুভূমির উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম, বোধ হইল যেন একটা কোমল মাংসপিণ্ডের উপর দিয়া চলিবাছি; পদতলে যেন স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এইখানে সমুদ্র ছিল, এখন কত দূরে চলিয়া যাইতেছে! এখনই সমুদ্র ও বেলাভূমির সীমান্ত-রেখা আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যেন কোনও ইন্দ্রজালের সাহায্যে আমি এই অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখিতে পাইতেছিলাম। আটলাণ্টিক মহা-সাগর এই একটু পূর্ব্বে আমার সম্মুখে বর্ত্তমান ছিল, আর এখন এই বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে; যেন রঙ্গমঞ্চের অন্তর্দ্বার দিয়া এই মহাদৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে, আর আমি এখন এক মরুভূমির মধ্যে বিচরণ করিতেছি। কেবল-মাত্র একটা সৌরভ, লবণাক্ত সমুদ্রজলের মৃদুগন্ধ, তখনও চারিদিক ভরিয়া উঠিতেছিল। আমি সামুদ্রিক উদ্ভিদের গন্ধ, সফেন তরঙ্গের গন্ধ, ও সমুদ্র-তীরের উগ্র স্বাস্থ্যকর গন্ধ সেবন করিতে লাগিলাম। আরও দ্রুত

চলিতে লাগিলাম, আর শীত বোধ হইল না। দূরে অচল ভগ্নাবশেষ জাহাজখানা ক্রমে বড় হইয়া উঠিল, এক্ষণে তাহাকে একটা তিমি মাছের মৃতদেহের মত দেখা যাইতেছিল।

বোধ হইল, সেটা যেন মাটীর ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠিয়াছে; এই অসীম, সমতল, হরিদ্রাবর্ণ ভূমির উপরে তাহার আয়তন বিস্ময়কর দেখাইতে লাগিল। একঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া জাহাজে পৌঁছিলাম।

জাহাজখানি এখনি ভাঙ্গিতে শুরু হইয়াছে; তাহার দুই পার্শ্বে মৃত জন্তুর পঞ্জরাস্থির মত, আলকাতরা-মাখানো বড় বড় পেরেক-মারা কাষ্ঠপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র-বালুকা তাহার ভিতরে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ভগ্নদেহের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে কায়দা করিয়াছে, দখল করিয়াছে, আর ছাড়িবে না। সে যেন সেই বালুকার মধ্যে শিকড় গাড়িয়াছে, তাহার সম্মুখ-ভাগ সেই কোমল বালুস্তরে বসিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাৎভাগ আকাশে উৎক্ষিপ্ত; একটি কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ-ফলকে শাদা-অক্ষরে 'মারী জোসেফ' এই দুটি কথা লেখা রহিয়াছে—সে যেন উর্দ্ধ আকাশে প্রেরিত একটি আকুল অন্তিম প্রার্থনা।

আমি এই মৃত জাহাজখানির উপর তাহার সর্ব্বনিম্ন পার্শ্ব দিয়া আরোহণ করিলাম; এবং পাটাতনের উপর পৌঁছিয়া জাহাজের নিম্নতলে নামিয়া গেলাম। পার্শ্বস্থ ছিদ্রপথে দিনের আলোক প্রবেশ করিয়াছে; একটা দীর্ঘ অন্ধকার কক্ষের মত স্থান সেই আলোকে আরও ম্লান দেখাইতেছে; কক্ষতল বালুকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

জাহাজখানির অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা লিখিয়া লইবার জন্য আমি একটা শূন্য সিন্দুকের পার্শ্বে বসিলাম। একটা বড় ছিদ্রপথে আলোক আসিতেছিল; তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের অনন্ত জলবিস্তার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে আমার দেহে শীত ও নির্জ্জনতাজনিত কি একটা কম্প হইতেছিল। আমি লেখা বন্ধ করিয়া ভগ্ন জাহাজের মধ্যে বহু প্রকার অস্ফুট শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলাম। কাঁকড়াগুলা দংষ্ট্রার মত নখরে ভর করিয়া কাষ্ঠের উপর বিচরণ করিতেছে, সহস্র সহস্র অতি ক্ষুদ্র জন্তু আর এক প্রকার শব্দ করিতেছে; আবার কাষ্ঠ-ধ্বংসী 'টিরীডো'-কীটও তাহার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা এক প্রকার মিষ্ট তাললয়যুক্ত শব্দ করিয়া অনবরত গর্ত্ত কাটিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করিতেছে।

সহসা আমার ঠিক পাশেই যেন মনুষ্যকণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইলাম। প্রেতের আবির্ভাবে লোক যেমন চমকিয়া উঠে, আমিও তেমনি চমকিয়া উঠিলাম। মুহূর্তের জন্য আমার সত্য সত্যই মনে হইয়াছিল, যেন সেই সঙ্কটসংকুল স্থানে দুইটা জলমগ্ন মূর্ত্তি আমাকে তাহাদের মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বলিবার জন্য উত্থিত হইয়াছে। সত্যই আমি পাটাতনের উপর উঠিয়া দাঁড়াইতেই গলুইএর নীচে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ ও তিনটি যুবতী—আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে—একজন ইংরাজ ও তিনটি 'মিস্'কে দেখিতে পাইলাম। অবশ্য, এই জনশূন্য ভগ্নপোতের উপর হঠাৎ একটা মনুষ্য-মূর্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহারা আমা অপেক্ষা অধিকতর ভয় পাইয়াছিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ বালিকাটি পলাইতেছিল এবং অপর দুইটি তাহাদের পিতাকে বিষম আশঙ্কায় ধরিয়া রহিল, তিনি শুদ্ধ হাঁ করিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থার পরিচয় দিলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরে কথা কহিলেন,

"ওঃ! মহাশয়ই তবে এই জাহাজের মালিক?"

"আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়।"

"জাহাজখানি কি আমরা দেখিতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

তিনি একটি দীর্ঘ ইংরাজী বচন বলিলেন, তাহার মধ্যে আমি 'সৌজন্য' এই কথাটি কয়েকবার প্রয়োগ করিতে শুনিলাম।

তিনি কোন্ দিক দিয়া কোন্ স্থানে উঠিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া আমি তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি আমার প্রসারিত হস্ত অবলম্বন করিয়া আগে উঠিলেন, পরে আমরা দুইজনে মিলিয়া বালিকা তিনটিকে সাহায্য করিলাম; তখন তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়াছে। তাহারা তিনজনেই অতি সুন্দরী, বিশেষতঃ বড়টি—তাহার বয়স আঠারো হইবে। অতি সুন্দর কেশগুচ্ছ, দেহটি ঠিক ফুলের মত সদ্য-বিকশিত—এত সুন্দর! বাস্তবিক, সুশ্রী ইংরাজ বালিকা যেন অতিপেলব সাগরসম্ভব সামগ্রী। এই বালিকাটিকে দেখিলে তোমার মনে হইত, সে যেন সমুদ্রবালুকা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে, বালুকার বর্ণ টি তাহার স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছে রহিয়া গিয়াছে। কি অম্লান সৌকুমার্য্য! বর্ণ টি কি কমনীয়! দেখিলে ঈষৎ-রক্তিম ঝিনুক ও শুক্তিজাত মুক্তার কথা মনে পড়ে—যাহা দুষ্প্রাপ্য ও বিস্ময়কর, যাহা অতল সমুদ্রগর্ভে উন্মীলিত হয়।

এই মেয়েটি তাহার পিতা অপেক্ষা ভাল ফ্রেঞ্চ কহিতে পারিত, এজন্য আমাদের কথাবার্ত্তায় সেই দোভাষীর কাজ করিতে লাগিল। জাহাজখানি কিরূপে ধ্বংস হইয়াছে আমাকে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হইল—অনেকটা কল্পনার সাহায্যও লইতে হইল, আমি যেন সেই সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত ছিলাম! অবশেষে সকলেই জাহাজের মধ্যে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা সেই স্বল্পালোক প্রায়ান্ধকার সুদীর্ঘ কক্ষদর্শনে বিস্ময় ও প্রশংসাসূচক অস্ফুট ধ্বনি করিলেন, এবং পিতা পুত্রী সকলে তৎক্ষণাৎ আপনাপন আঁকিবার খাতা বাহির করিয়া সেই বিচিত্র ও বিষাদগম্ভীর স্থানটির একসঙ্গে চারিখানি পেন্সিল-চিত্র আঁকিতে বসিলেন।

আমি জাহাজখানির পরীক্ষা কার্য্যে পুনরায় ব্যাপৃত হইলাম। বড় মেয়েটি আপনার কাজ করিতে করিতেই আমার সহিত গল্প করিতে লাগিল।

আমি তাহার নিকট শুনিলাম যে, তাহারা শীতকালটা 'বিয়ারিজে' কাটাইতেছে এবং সেইখান হইতেই এই বালুমগ্ন জাহাজখানি দেখিতে 'আইল-দে-রে'তে আসিয়াছে। ইংরাজসুলভ রুক্ষ স্বভাব এই সৎপরিবারটির আদৌ ছিল না। ইংলণ্ড হইতে পৃথিবীময় যে একশ্রেণী নির্ব্বিরোধী ও একটু বাতিকগ্রস্ত পর্য্যটকের দল বাহির হয়, ইহারা তাহাই।

মেয়েটির সবই মনোহর। এমন ফ্রেঞ্চ বলিবে, গল্প করিবে, হাসিবে, তোমার কথা বুঝিবে আবার বুঝিবে না, জিজ্ঞাসার ভাবে চোখ দুটি তুলিয়া এমন চাহিবে!—সেই সুনীল চক্ষু-তারকা, অতলস্পর্শ সমুদ্রের মত নীল! সময়ে সময়ে ছবি-আঁকা বন্ধ করিয়া তোমার কথা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিবে, আবার তখনি আপনার কাজে মন দিবে,—এসব আমার এত ভাল লাগিতেছিল যে, আমি যতক্ষণই হউক না কেন, সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতাম ও তাহার কাজকর্ম্ম দেখিতাম।

সহসা সে মৃদু স্বরে বলিল,

"জাহাজে যেন কি শব্দ হইতেছে।"

আমি কাণ পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম, আমারও মনে হইল, একটা কি শব্দ হইতেছে—যেন একটা অস্ফুট ও অবিশ্রান্ত শব্দ। কিসের শব্দ? আমি একটু উপরে উঠিয়া একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া দেখিলাম, দেখিয়া চীৎকার না

করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সমুদ্র ফিরিয়া আসিয়াছে, জাহাজের তলায় চারিদিকে জোয়ার বহিতেছে। আমি ছুটিয়া পাটাতনের 'উপর উঠিলাম। তখন আর সময় নাই। সমুদ্র আমাদিগকে বেড়িয়া ফেলিয়াছে ও প্রচণ্ডবেগে কূলাভিমুখে ছুটিতেছে—না, ঠিক ছুটিতেছে না, অতি নিঃশব্দে চুপে চুপে চলিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড ভিজা দাগ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বালুকার উপর দুই ইঞ্চির বেশী জল দাঁড়ায় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে এই গোপন-সঞ্চার জলস্রোতের অগ্র-সীমা আর দেখা যাইতেছিল না।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ দ্রুত প্রস্থানের অভিপ্রায় করিলেন, আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। পলায়ন অসম্ভব, কারণ মাঝে মাঝে যে সব গভীর খাত আছে তাহা এখন জলমগ্ন হওয়ায় আর দেখা যাইবে না, যে অনায়াসে ঘুরিয়া যাওয়া চলিবে। এখন যাইতে গেলেই ডুবিয়া মরিতে হইবে।

মুহূর্তের জন্য আমাদের প্রাণে ভীষণ উদ্বেগের সঞ্চার হইল। সেই সময়ে বড় বালিকাটি একটু হাসিয়া বলিল,

"আমরাই তবে ভগ্ন জাহাজের যাত্রী!"

আমিও হাসিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার প্রাণে সেই জোয়ারের মতই অলক্ষিতে একটা কাপুরুষোচিত ভয়ের উদ্রেক হইল। উপস্থিত অবস্থার ভীষণতা আমি একেবারে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলাম। সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কে শুনিবে?

ছোট বালিকা-দুইটি তাহাদের পিতার অতি নিকটে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল—সমুদ্র আমাদিগকে কিরূপ বেষ্টন করিয়াছে, তিনি অবাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলেন।

সমুদ্রের জোয়ারের মত রাত্রিও অতি শীঘ্র আসিয়া পড়িল। অন্ধকারটা যেন ভারী, স্যাঁৎসেতে ও বরফের মত ঠাণ্ডা।

আমি বলিলাম,
"আমরা আর কি করিব? এইখানেই সমস্ত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।"

ইংরাজ ভদ্রলোকটি বলিলেন,

"হাঁ, তা' বই কি।"

বালিকাদের মধ্যে একজনের বড় শীত করিতে লাগিল, তখন আমার জাহাজের নীচে নামিবার কথা মনে হইল—এই অতি শীতল বাতাস আমাদের মুখে যেন বিঁধিতেছিল। আমি পাটাতনের ফাঁক দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলাম। জাহাজের ভিতরেও জল ঢুকিয়াছে। তখন পাটাতনের উপরেই পশ্চাদ্দিকে, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া শুইয়া পড়া ছাড়া আর উপায় রহিল না। সেখানে দুইদিক একটু উঁচু করিয়া ঘেরা ছিল—বাতাস তত লাগিবে না।

আমরা একত্র হইয়া শুইয়া রহিলাম। চারিদিকে জল ও রজনীর গাঢ় অন্ধকার। আমার স্কন্ধে ইংরাজ বালিকার স্কন্ধ-স্পর্শ অনুভব করিলাম। সে কাঁপিতেছিল, মাঝে মাঝে তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার শরীরে তাহার অঙ্গের মৃদু উত্তাপ প্রবেশ করিতেছিল, এবং সেই অন্তর্বাহিত উত্তাপ চুম্বনের ন্যায় আমার মিষ্ট লাগিতেছিল।

আমরা কথা কহিতেছিলাম না, অতি স্থির ও নিস্তব্ধ হইয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিলাম, যেন ঝড়ের সময় কতকগুলা জানোয়ার একটা বেড়ার আড়ালে কোনও মতে জায়গা করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই রাত্রিকালে ও এই ভীষণ সঙ্কটে আমার প্রাণে একটা সুখ জাগিতেছিল—এই সুন্দরী কোমলাঙ্গী মনোহারিণী বালিকার এত কাছে থাকিতে পাইয়া এই দীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, এই উদ্বেগ-যাতনা এবং এই ভগ্ন কাষ্ঠ-শয্যাও আনন্দময় হইয়া উঠিল।

আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিলাম, এই মনোহরণ কোথা হইতে আসিল? এই আনন্দ, এই সুখ কেন?

কেন? কে বলিতে পারে? সে সেখানে ছিল বলিয়া? একটি অপরিচিতা ইংরাজ বালিকা! আমি তাহাকে ভালবাসি নাই, আমি তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তবু আমার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, আমাকে সে জয় করিয়াছে। আমার তাহাকে বাঁচাইবার ইচ্ছা হইল, তাহার জন্য প্রাণ দিতে চাহিলাম এবং তাহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার মূর্খতাচরণ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলাম।

আশ্চর্য্য! রমণীর সাহচর্য্য মাত্রেই আমাদের এমন চিত্তবিকার ঘটে কেন? তাহার অঙ্গ হইতে যে কান্তি নির্গত হয়, তাহাই কি প্রবল মন্ত্রশক্তির মত

আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে? না যৌবন ও সৌন্দর্য্যের মোহ সুরার মত আমাদিগকে মাতাল করিয়া দেয়?

বরং ইহাকে কি অলক্ষিত প্রেমস্পর্শ বলিয়াই মনে হয় না?—দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় প্রেম, যাহা চিরদিন মানবজগতে মিলন ঘটাইবার জন্য ফিরিতেছে। একটি নর ও একটী নারীকে মুখামুখী পাইলেই তাহার শক্তি পরীক্ষা করে, তাহাদের অন্তরের মধ্যে একটা নব চেতনা-প্রবাহ, একটা অস্পষ্ট, গভীর, মধুর ভাব সঞ্চার করে; যেমন প্রাবৃটের মৃদু ধারাস্পর্শে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে।

কিন্তু মাথার উপরকার নিঃশব্দ অন্ধকার ভীষণতর হইতেছিল। সমস্ত আকাশ নীরব। আমাদের চারিপাশে জলের একটা অবিরাম, অস্পষ্ট, কলশব্দ হইতেছিল—অতি মৃদু মর্ম্মর-ধ্বনির সহিত সমুদ্রজল বাড়িতেছে, আর জাহাজের পার্শ্বদেশে ক্রমাগত একই শব্দ করিয়া স্রোতোজল আঘাত করিতেছে।

হঠাৎ শুনিলাম, কে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে; সে সর্ব্বকনিষ্ঠা বালিকাটি, তাহার পিতা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজের ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। অনুমান করিলাম, পিতা বলিতেছেন, ভয় নাই, কিন্তু কন্যা শান্ত হইতেছে না।

আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে বলিলাম,

"তোমার বড় শীত করিতেছে বোধ হয়?"

"হাঁ, খুব করিতেছে।"

আমি তাহাকে আমার বহির্বাস দিতে চাহিলাম, সে লইবে না। কিন্তু আমি তখন খুলিয়া ফেলিয়াছি, তাই তাহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলাম। আপত্তিকালে আমার হস্ত তাহার হস্ত একবার স্পর্শ করিয়াছিল, সে সময়ে আমার সর্ব্ব শরীরে একটা পুলক-রোমাঞ্চ হইয়াছিল।

কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বাতাস বাড়িয়া উঠিয়াছে। জলের শব্দও তখন ক্রমে বেশি বোধ হইতেছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, মুখে ঝাপটা লাগিতে লাগিল। বাতাস আরও বাড়িয়া উঠিল।

ইংরাজ ভদ্রলোকটিও ইহা লক্ষ্য করিলেন। কেবল বলিলেন,

"বড় ভাল নয়!"

তাজ ত' নয়ই, সমুদ্র আর একটু বাড়িয়া উঠিয়া এই ভগ্ন জীর্ণ আশ্রয় খানিকে আঘাত করিতে থাকিলেই, তাহা প্রথম ঝড়ের মুখেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে—মৃত্যু অবধারিত।

প্রতি মুহূর্ত্তে ঝড়ও বাড়িতে লাগিল, আমাদের উৎকণ্ঠাও বাড়িতে লাগিল। এখন সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকারে শুভ্র রেখা সকল উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, দেখিলাম—সেগুলা ফেনচিহ্ন। এখন 'মারী জোসেফ'এ উপর প্রত্যেক তরঙ্গাঘাত আমাদের প্রাণের মধ্যেও যেন আঘাতের মত বাজিতে লাগিল। তরুণী ইংরাজবালার বড় ভয় হইতেছিল, সে আমার পা কাঁপিতে লাগিল। তাহাকে আমার বাহুপাশে বেষ্টন করিবার উন্মত্ত বাসনা হইল।

দূরে—আমাদের সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে ও পশ্চাতে, সমুদ্রের কূলে কূলে বাতিঘরের শ্বেত, পীত ও লোহিত আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সেগুলা বৃহদাকার চক্ষুর মত—যেন দৈত্যের চক্ষু, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিট্ মিট্ করিতেছিল; যেন আমাদের অন্তর্দ্ধানের প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া চাহিয়া আছে! তাহাদের মধ্যে একটা আমাকে আরও বিরক্ত করিতেছিল; সেটা ত্রিশ সেকেণ্ড্ অন্তর নিবিয়া আবার তখনই জ্বলিয়া উঠিতেছিল, ঠিক চক্ষুর মত,—তাহার দীপ্ত দৃষ্টিতে যেন মাঝে মাঝে পলক পড়িতেছিল!

ইংরাজ ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে দেশলাই জ্বালিয়া ঘড়ি দেখিতেছিলেন, আবার নীরবে পকেটে রাখিয়া দিতেছিলেন। হঠাৎ কন্যাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিলেন,

"মহাশয়, আপনার নববর্ষ সুখময় হউক!"

তখন দ্বিপ্রহর রজনী। আমি আমার হাতখানি বাড়াইয়া দিলাম, তিনি চাপিয়া ধরিলেন। তারপর ইংরাজিতে কি বলিলেন, আর হঠাৎ তিনি ও তাঁহার তিন কন্যা সমস্বরে ইংরাজের বিখ্যাত বিজয়-গীতি 'রুল ব্রিটানিয়া' গাহিয়া উঠিলেন। সেই সুগম্ভীর স্বরলহরী নিকষকৃষ্ণ অন্ধকার ও স্তব্ধ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ-আকাশে উঠিয়া গেল। প্রথমে আমার হাসি পাইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

সমুদ্রে পরিত্যক্ত অভিশপ্তদিগের কণ্ঠে এই গান যেমন ভীষণ, তেমনই মহিমা-ব্যঞ্জক। যেন স্তোত্রের মত, অথচ স্তোত্র অপেক্ষাও মহান্—সেই

ল্যাটিন গীতের মত—"হে সীজার! মরিবার সময়েও তোমাকে প্রণাম করি" —বধ্যভূমিতে দ্বৈরথ-যুদ্ধে হত হইবার পূর্ব্বে হতভাগ্যেরা যাহা বলিয়া সম্মুখে সিংহাসনাসীন রোম-সম্রাটকে অভিবাদন করিত।

তাহারা যখন থামিল, আমি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীকে একটি গান গাহিতে বলিলাম—একটি গাথা বা একটি ভাবপূর্ণ সংগীত, যাহা তাহার ভাল লাগে, এবং যাহাতে আমাদের কষ্টের একটু লাঘব হয়। সে সম্মত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিষ্কার তরুণ কণ্ঠস্বর লঘু ভঙ্গীতে নিশীথ-আকাশে উঠিতে লাগিল। গানের বিষয়টি নিশ্চয় করুণ হইবে, কারণ তাহার দীর্ঘোচ্চারিত বিলম্বিত পদগুলি অতি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আহত পক্ষীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে তরঙ্গের উপর লুটাইয়া পড়িতে লাগিল।

জল আরও বাড়িয়া উঠিয়া খোলা-জাহাজের বুকের উপর গড়াইয়া গেল।

আর আমি? আমি সেই গানই ভাবিতেছিলাম। আমার হোমার-বর্ণিত সেই সাগর-কূলবাসিনী মোহিনী রাক্ষসীর কথাও মনে হইতেছিল। যদি সে সময়ে কোনও তরণী আমাদের নিকট দিয়া বাহিয়া যাইত, তবে তাহার দাঁড়ীরা কি মনে করিত? আমার যাতনাবিদ্ধ মন তখন একটি স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। মোহিনী রাক্ষসী! এই সাগরকন্যা ইংরাজ-কুমারীও ত' সেইরূপ কুহকিনী! সে-ই ত' এই ভগ্নপোতে আমার বিলম্ব ঘটাইয়াছে, আর এখনি ত' সে আমাকে সঙ্গে লইয়া এই অকূল বারিধি-বক্ষে ডুবিয়া যাইবে!

হঠাৎ আমরা পাঁচজনেই পাটাতনের অপরদিকে উল্টাইয়া গেলাম, 'মারী জোসেফ' দক্ষিণদিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। ইংরাজ বালিকা একেবারে আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে আমার বাহুপাশে চাপিয়া ধরিলাম এবং অন্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া, জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহার গণ্ডদ্বয়ে, কপালে ও কেশে অজস্র চুম্বন করিলাম। ইহার পর জাহাজ আর নড়িল না, আমরা কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

পিতার কণ্ঠে শব্দ হইল—'কেট্!' আমি যাহাকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম সে উত্তর করিল, 'এই যে', এবং আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। আমার ইচ্ছা হইল, জাহাজখানা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাক, আর আমি তাহাকে লইয়া সমুদ্রগর্ভে নামিয়া যাই।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আবার কথা কহিলেন,

"একটু একপেশে হইয়াছে মাত্র, আমার কন্যা তিনটি এখনো আছে!"

জ্যেষ্ঠা কন্যাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, সে সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছে। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হঠাৎ সমুদ্রের উপর আমাদের খুব নিকটে একটা আলোক দেখিতে পাইলাম। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম, উত্তর আসিল। সে একখানা নৌকা, আমাদের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে। হোটেলওয়ালা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অসাবধানতা অনুমান করিয়াছিল।

তবে আমরা রক্ষা পাইলাম! আমার বড় দুঃখ হইল। তাহারা আমাদিগকে সেই ভগ্নপোত হইতে 'সেণ্ট মার্টিনে' লইয়া গেল।

ইংরাজ ভদ্রলোকটি আপনার হস্ত আমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন,

"খুব ভাল আহার চাই, খুব ভাল আহার!"

আমরা সত্যই নৈশভোজনে বসিলাম। আমার আদৌ স্ফূর্ত্তি ছিল না, 'মারী জোসেফ্' এর জন্য দুঃখ হইতেছিল।

পরদিনই বিদায় লইতে হইল। আমরা অনেক আলিঙ্গন করিলাম, এবং পরস্পরকে পত্র লিখিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।

ওঃ, সেবার কি ধরাই পড়িয়াছিলাম! আর একটু হইলেই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলিতাম। এক সপ্তাহ এক সঙ্গে থাকিলে নিশ্চয় বিবাহ হইত। মানুষ সময়ে সময়ে কি দুর্ব্বলতা ও অসারতারই পরিচয় দেয়!

দুই বৎসর তাহাদের কোনও সংবাদ পাই নাই। তারপর নিউইয়র্ক সহর হইতে একখানা পত্র পাইলাম। তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহাই আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছে। তখন হইতে আমরা প্রতি বৎসর, ১লা জানুয়ারি, পরস্পর পত্র-সম্ভাষণ করিয়া আসিতেছি। সে আমাকে তাহার নিজ জীবনের কথা, তাহার পুত্র কন্যাদের কথা, তাহার ভগিনীদের কথা,—সবই লেখে, কিন্তু স্বামীর কথা লেখে না। কেন? কেন লেখে না?.........আর আমি?— কেবল সেই 'মারী জোসেফ্'-এর কথাই লিখি। আমি বোধ হয় জীবনে

সেই একবার মাত্র একজন রমণীকে ভালবাসিয়াছিলাম—না ঠিক তা' নয় —আমার ভালবাসা উচিত ছিল; ওই ত!—কে জানে? ঘটনাস্রোতে মানুষ ভাসিয়া যায়, তারপর সব শেষ। সে এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে দেখিলে বোধ হয় আর চিনিতেও পারি না।—হায়! সেই অতীতকালের সে!—সেই ভগ্নপোতে—সে কি চমৎকার!—স্বর্গীয়! সে লিখিয়াছে, তাহার কেশ শুক্ল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে আমি বড়ই বিচলিত হইয়াছি। সেই তার কেশ —এমন সোনার রঙ্! নাঃ, সেই যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে আর নাই, —এ সব মনে করিতেও কষ্ট হয়।

শাস্তি

প্যারিস শহরের একটি নৈশ-ভোজনশালার দরজা খুলে' দু'জন বিলাসিনী বেরিয়ে এল, তাদের পোষাকের বড় বাহার; পিছনে কয়েকজন পুরুষ। ছোট দলটি 'বুলভারে'র উপর এসে দাঁড়াল—রাস্তাটা ক্রমে জনহীন হয়ে পড়েছে। খাবারের টেবিলে তাদের যে ফুর্ত্তির আলাপ চলছিল এখনও তার জের মেটেনি।

আলোকিত পান-শালার বাহিরে একটি অল্প বয়সের স্ত্রীলোক কিছুক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়েছিল, একখানি কালো রঙের লেসের কাপড়ে তার মাথাটা ঢাকা। দলটি বেরিয়ে আসতেই সে পা টিপে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল, পাছে দেখতে পায় ব'লে, অন্ধকারের দিকটায় ঘেঁসে চলতে লাগল। শেষে তাদের একজনের দিকে তার চোখ পড়ল, তার চেহারাটা বেশ লম্বা কিন্তু মুখের রঙটা একটু ফ্যাকাসে। যখন থেকে তার উপর চোখ পড়েছে, সে আর সেখান থেকে চোখ সরায়নি।

এইবার ঐ ফুর্ত্তিবাজের দলটি যে যার দিকে চলে গেল। স্ত্রীলোকটার প্রথমে একটু সঙ্কোচ বোধ হ'লো, তারপর এতক্ষণ যাকে সে চোখে চোখে রেখেছিল সেই পুরুষটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বললে, "কিছু যদি মনে না করেন—আপনি কি ম্যঁসিয় ফ্রাঁসোয়া ভেনিঁয়ে?

"কেন? কি চাই তোমার?"

"আমি আনেতের কাছ থেকে আসছি—আনেত্ ব্র্যাজ। এককালে তার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; সেই আমাকে আপনার খোঁজে পাঠিয়েছে—হতভাগিনী এখন মৃত্যুশয্যায়।"

শুনে লোকটা চমকে উঠল। আনেতের নাম শোনামাত্র তার পুরাণো স্মৃতি জেগে উঠলো, ক্ষণিকের জন্যে মনটা নরম হয়ে গেল। কিন্তু তার প্রমোদসঙ্গিনীটি তখন গাড়ীতে চেপে বসেছে। কাজেই সে তখন পকেট থেকে একটি গিনি বার ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে,—

"এই নাও, এইটে তাকে দিও।"

ল্যাম্পের আলোয় গিনিটা চক্‌চক্ করে উঠল।

মেয়েটি বললে, "আজ্ঞে, সে তো' টাকা চায় না; যদিও তার কিছুই নেই, তবু এ জিনিসের দরকারও নেই। সে কেবল আপনাকে একটিবার দেখতে চায়, আর কিছুই চায় না। তার এখন এমন অবস্থা যে, যে-কোন সময়ে মৃত্যু হতে পারে। মরতে বসেছে যে, তাকে আপনি নিশ্চয় দয়া করবেন!"

তারপর গলাটা বেশ নামিয়ে আবার বললে, "আপনি ভয় পাবেন না, আপনাকে ফাঁদে ফেলবার কোন মতলব তার নেই। এ তার একটা খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। 'এখনো সে আপনাকে দেবতার মত জ্ঞান করে!"

এমন সময় ফুলের মালা-জড়ানো একটা হ্যাট এবং তার তলায় একখানা পাউডার-মাখা গোলগাল মুখ গাড়ীর দরজার ফাঁকে দেখা দিলে।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "দেরী করছ কেন ফ্রাঁসোয়া?"

যুবক যেন একটু কাঁচমাচু হয়ে বললে, "এই দেখনা, একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছি।"

"কিন্তু বঁধুর আমার মুখখানি যে কেমন-কেমন দেখাচ্ছে! বলি, হৃদয়-বিদারক কিছু নয় তো?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

"তাহ'লে, উঠে এসো শীগ্‌গির।"

সে একবার ইতস্ততঃ করলে; মেয়েটি তখন সাহস করে' গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল।

বললে, "আমার কথাটি আপনিও তাহ'লে শুনুন, শুনলে আপনার নিশ্চয় দয়া হবে। আমি ওঁকে একটি দুঃখিনী মেয়ের কথা বলছিলাম, সে মরবার

আগে ওঁকে একবার দেখতে চেয়েছে; বন্ধুতার দাবী ছাড়া আর কোন দাবী তার নেই।"

রঙ্গিনীর ঠোঁট দু'খানি তখনও শ্যাম্পেন আর বরফ-দেওয়া ফলের রসে ভিজে রয়েছে, গন্ধ ভুরভুর করছে; সেই ঠোঁট দু'খানি খুলে ঈষৎ রঙ্গ-ভরে বলে উঠলো,—"একটা সৎকাজ করার সৌভাগ্য কি যখন তখন ঘটে? যাও, আর দেরী ক'রো না, শীগ্‌গির যাও।"

গাড়ী থেকে হাত বাড়িয়ে, তাকে একটু ঠেলে দিয়ে সে একাই চলে গেল; যুবক মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময় রাস্তা দিয়ে একখানা গাড়ী যাচ্ছিল, ফ্রাঁসোয়া সেটাকে থামিয়ে একটু বিরক্তভাবে বললে, "গাড়োয়ানকে তোমার ঠিকানা বলে দাও।"

"ষাট নম্বর, কান্তানিয়ারি ভোজিরার"। কথাগুলো তাড়াতাড়ি ব'লে সে গাড়ীর ভিতরে যুবকের পাশে এসে বসল। সে যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে, তবুও তার মনটা ভারী খুশী হয়ে উঠল। তখন সে চুপটি করে এই কথাই ভাবছিল যে, আর একটু পরেই সেই দুঃখিনীর না জানি কত আহ্লাদই হবে। যুবকের সঙ্গে কথা কইতে তার ভরসা হচ্ছিল না। প্রায় সপ্তাহখানেক আগে সে যখন সেই মৃত্যুমুখী মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, শহরের যে-অঞ্চলে সৌখীন যুবার দল ঘোরাফেরা করে, সেখান থেকে সে ফ্রাঁসোয়া ভেনিয়েকে খুঁজে বার করবেই, এবং তাকে নিয়ে আসবে, তখন সে ভাবতেও পারেনি সেই কথা সে রাখতে পারবে। আনেত কতবার তার কাছে সেই যুবকের রূপ বর্ণনা করেছে—"মাথায় খুব উঁচু, মুখের রঙটা খুব শাদা, গোঁফজোড়াটি যেমন পাকানো, দাঁতগুলিও তেমনি মুক্তোর মতো সারি-গাঁথা;—তাকে দেখলে মনে হয়, সে যেন একটা "মারকুইস" —প্রতিবারই তার সেই বর্ণনাতে একটা না একটা নতুন কিছু যোগ করতো, এমন কি তার থুঁতির উপরে যে কাটা দাগটি ছিল তাও তার মনে পড়ে যেতো। যে সব আড্ডায় সে প্রায় যাওয়া-আসা করে তাও সে বলতে পারতো। কিন্তু যে-বিধাতা মানুষের মঙ্গল করেন, এবার তিনিই দুঃখিনী মেয়েটির শেষ দশায় তাকে এই একটিবার কৃপা করলেন!

যুবক তার দিকে মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলে, "অসুখটা কি অনেক দিন ধরে' হয়েছে?"

উত্তর হলো, "তার কথা শুনে মনে হচ্ছে প্রায় এক বছর। মাস ছয়েক ধ'রে আমি তাকে দেখছি—যেদিন থেকে সে আমাদের ওখানে বাস করছে। সকলেই তাকে ভালবাসে, বড় মায়ার শরীর তার; আহা, যা' করে' আমার খোকাকে সে বাঁচিয়েছে—কি সেবাটাই না করেছিল! সেদিন থেকে আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম, তার বিপদে আমিও কোন দুঃখ, কোন কষ্ট মানবো না। ভেবে দেখুন, গত সাতদিন ধরে' আমি আপনার খোঁজে প্রায় অর্দ্ধেক রাত পথে-পথে কাটিয়েছি, এ কষ্ট কি লোকে যার তার জন্যে করে? অত রাত্রে ফিরে গিয়েও তার পাশে আরো কতক্ষণ জেগে থাকি। আহা, আর কয়দিনই বা! আপনি আর তার সে চেহারা দেখতে পাবেন না। এত দুঃখে, কষ্টে কি মানুষের কিছু থাকে?—বলাটা উচিত নয়, জীবনটা তাকে যে ভাবে কাটাতে হয়েছে, সেও একটা কারণ। আপনি ছেড়ে যাবার পর থেকেই তার দুর্গতি আরম্ভ হ'ল। একজন ফিরিওয়ালার সঙ্গে সে আমাদের এখানে আসে—বাউণ্ডুলেটা পয়সাকড়ি যা পেত, সব উড়িয়ে দিত, আর প্রতি রাত্রে তাকে ধ'রে মারত; তারপর যেদিন থেকে ওর ওই কাসি দেখা দিলে সেও অমনি ফেরার হলো। এসব কথা সে-ই আমার কাছে বলেছে, যদিও তার মান-জ্ঞান কম নয়।"

যতক্ষণ মেয়েটি কথা বলছিল, যুবক গাড়ীর জানলা দিয়ে নদীর বাঁ-ধারের নির্জ্জন রাস্তাগুলোর দিকে চেয়েছিল। ভাবছিল, সেদিনের নৈশ প্রমোদ-লীলার একি বিচিত্র পরিণাম! হঠাৎ তার ভারী রাগ হলো, তাকে নিয়ে ভাগ্যের একি চক্রান্ত! একটা দরিদ্র স্ত্রীলোকের পাশে এমনি ক'রে ব'সে গাড়ী ছুটিয়ে যেতে হবে! একবার ইচ্ছে হলো, স্ত্রীলোকটাকে খুব ধমক দেয়, কিংবা গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে; আবার ভয়ও হলো, হয়তো একটা ফ্যাসাদে পড়ে' লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হবে। তবুও পাশের ঐ স্ত্রীলোকটার কথাগুলো না শুনে পাচ্ছিলো না। আনেত্ ব্র্যাজ্‌কে সে কখনো ভোলেনি—তার সেই বড় বড় প্রেমপূর্ণ দুটি চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, নরম তার সেই গা, আর সেই স্নেহ-কোমল বুকখানা—সবই তার মনে আছে। একটি পুরো বছর সে তাকে ভালবেসেছিল, লোকে নিজের বৌটিকে যেমন ভালোবাসে; তার সেই ছোট্ট বাসাটিতে থাকবার মধ্যে ছিল একটা শেলায়ের কল, আর পূজোর জন্যে একটি কাঠের ছোট 'ক্রুশ'। এও সে জানতো যে, তাকে ছেড়ে চলে আসবার পর, মেয়েটি প্যারিস শহরের বিশাল জনসাগরের ঘূর্ণাবর্ত্তে ঝাঁপ দিয়েছে; বরাতে যাই থাক, ভাল-মন্দের

ভাবনা ভাবতে সে পারেনি। তখন সে-কথা ভেবে প্রাণে একটুও গ্লানি বোধ করেনি সে। কিন্তু এখন?—সেই একই স্রোতের টানে আবার যখন সে তার পায়ে এসে ঠেকেছে, তার দেহখানাও ভেঙ্গে গেছে, তখন সে কেমন ক'রে মুখ ফিরিয়ে থাকবে? বলবে, সে তাকে চেনে না!

জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, সত্যি কি সে মরতে বসেছে?"

"মরতেই বসেছে। এ পোড়া চোখে অনেক দেখেছি কিনা! সময়ে সময়ে যখন জ্বরটা একটু বেশী হয়, আর সেই জন্যে একটু চন্‌মনে হ'য়ে ওঠে, তখন দেখলে মনে হবে, বুঝি বা ভালো আছে। কিন্তু সারারাত ধ'রে পাশের ঘরে তার কাসি যদি শোনেন! আর এত রোগা হয়ে গেছে—শরীরে কিছু নেই!"

যুবক ভাবতে লাগলো, একটু পরেই তো তাকে দেখতে পাবে, কিন্তু কেমন চেহারা দেখবে তার! কেবল মনে পড়ছিল সেই আর এক কালের আনেতকে—যৌবনের মাধুরী যেন উছ্‌লে পড়ছে—কেবল হাসি আর গান, দেখলেই ছুটে আসতো তার দিকে।

এক জায়গায় গাড়ী এসে থামল। ফ্রাঁসোয়া ভের্নিয়ে মেয়েটির পিছু পিছু একটা সরু গলিপথ ধ'রে একখানা ছোট বাড়ীর দরজায় এসে পৌছল! দরজায় যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল, মেয়েটী তাকে ডেকে বললে, "তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, ম্যঁসিয় গোব্‌,—আমি মাদাম ফ্লুরাঁ।"

বাড়ির আঙিনাটা ছোট, তাও ভাল করে' বাঁধানো হয়নি; সেটা পার হয়ে তারা একটা সিঁড়ি ধ'রে উঠতে লাগল, সিঁড়িটাতে রেলিং নেই; ধাপগুলোও এত ছোট যে, জুতোর মুখে কেবলই ঠোক্কর লাগে। শ্রীমতী ফ্লুরাঁ খুব আস্তে আস্তে দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে কান পেতে রইল, কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। সে তখন দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর নিঃশব্দে প্রবেশ করলে, ফ্রাঁসোয়া বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ভিতর থেকে একটা ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই একটা চাপা উল্লাসধ্বনি শুনে তার বুকটা দুরূদুরু করে উঠলো। শেষে শ্রীমতী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

এসেই বললে, "আপনি ভিতরে আসুন, আমি আলো আনছি।"

গরীব রোগীদের ঘরে যেমন একটা ভাপ্‌সা গন্ধ বেরোয়, ঘরে ঢুকতেই সেই রকম একটা গন্ধ তার নাকে এল। অন্ধকারে কোন রকম্ ক'রে পা ফেলে, কেবল একটা শাদা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে—সে বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর খুব আস্তে আস্তে শান্ত স্বরে বললে, "কে, আনেত্ না ?"

আনেত্ উঠে বসল। যুবক আরো সামনে এগিয়ে গেল, তারপর, আনেতের জ্বরতপ্ত হাত দু'খানি লেপের উপরটায় ক্রমাগত নড়ছে দেখে, নিজের মুঠোয় সে দু'টিকে ধ'রে খুব আস্তে চেপে রইল; সেই অন্ধকারে একজনের নিঃশ্বাসের সঙ্গে আর একজনের নিঃশ্বাস মিললো।

আনেত্ খুব মৃদুস্বরে বললে, "সত্যিই তুমি এসেছো? তুমি যে এত দয়া করবে তা আমি আশা করি নি, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ ফ্রাঁসোয়া ?"

পিছনের তাকে বাতি জ্বলছে, সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে তার নিরতিশয় লাবণ্যহীন মুখ, আধখোলা সেমিজের ফাঁক দিয়ে শীর্ণ গলাটি বেরিয়ে পড়েছে। কপালের রগ দুটো বসে গেছে। এই অতি দুঃখের অবস্থাতেও তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আগেকার মতো হাসি ফুটলো তার মুখে, সে ফ্রাসোয়াকে নাম ধ'রে ডাকলে। হাঁ, সেই আনেত্‌ই বটে!

যুবক একটু ম্লান হাসি হাসল, বললে, "তুমি তাহ'লে অনেকদিন অসুখে ভুগছ? দেখবার শোনবার কেউ নেই? কাল আমি তোমার জন্যে একটা ভাল ওষুধ পাঠিয়ে দেব, তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

"ভাল? না, সে আর হবার নয়; তা'ছাড়া, এমন ক'রে বেঁচে থাকবার ইচ্ছেও আমার নেই।"

এইটুকুতেই সে ভেঙ্গে পড়লো, বালিশের উপর শুয়ে পড়ে' চোখ বুজলো। ফ্রাঁসোয়া তার পানে কেবল চেয়ে রইলো—এই আনেত্‌কেই সে একদিন ভালোবেসেছিল। আনেতের গাল দু'খানিতে আবার রক্তের আভা দেখা দিলে, মৃত্যুপাণ্ডুর মুখখানি আবার রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু তবু মুখে চোখে সর্বত্র অভিশপ্ত জীবনের কালিমা-চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে!

একটা অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে ফ্রাঁসোয়া ব'লে উঠলো, "তোমার কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি, আনেত্, তুমি কেন আরো আগে আমাকে খবর দাওনি?"

"আমি যে বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে আর তোমার দরকার নেই—নেই বলেই তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে। আমি তখনই ত বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে অনেকদিন লেগেছিল। তারপর এতদিন পরে আর তোমাকে ডেকে পাঠাতে সাহস করিনি। সেই থেকে কি কষ্টে যে আমার কেটেছে তা' যদি তুমি জানতে! মেয়েমানুষের যখন আর কেউ থাকে না, থাকে কেবল তার পাপ, তখন পথ যে আর শেষ হয় না! কিন্তু ভালবাসা আর সুখের কথা যদি বল, সে তো তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আমি পাইনি। তুমি তো জানো, অসতী হয় যারা, আমার তো তাদের মতো হবার কথা নয়!"

বলতে বলতে একটা কান্নার ফোঁপানিতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, সে তার কথা শেষ করতে পারলে না। হঠাৎ কি মনে হল, যুবক অতিশয় শ্রদ্ধাভরে হতভাগিনীর কপালে চুম্বন করলে, বললে "বলো আনেত্, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ?"

উত্তরে সে বললে, "ফ্রাঁসোয়া, তোমাকে যে আমি চিরদিন ক্ষমা করেছি; কারণ তোমাকে যে আমি চিরদিন ভালোবেসেছি। তোমার অবিশ্যি অনেক প্রণয়িনীই আছে, তাদের মধ্যে আমি অতি সামান্য একজন বই তো নই! কিন্তু আমার তুমিই সর্ব্বস্ব, আর কেউ যে ছিল না আমার! এরও চেয়ে ছোট একখানি ঘরে তুমি যখন আমার কাছে আসতে, তখন আমি যে তোমাকে আমার সব দিয়েছিলাম! তার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখও নেই, কারণ ভালোবাসার চেয়ে ভালো জিনিস আর কি আছে? আহা, কি ভালোবাসাই তোমাকে বেসেছিলাম, ফ্রাঁসোয়া! কেবল একটা কথা,—ভালবাসলে শুধু নিজেকে সঁপে দেওয়া নয়, সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু দিতে হয়; সে নিজের নয়, অপরের,—আমার বাপ-মা, ভাই-বোন—তাদেরও সুখ ও সুনামের অনেকখানি আমি সেই সঙ্গে বিলিয়ে দিয়েছি। তাই তো ভগবান আমায় এই শাস্তি দিলেন।"

"তারপর আর তাঁদের সঙ্গে বুঝি দেখা হয় নি?"

"না, আর তাঁদের কাছে মুখ দেখাই নি। তোমার কাছে যখন ছিলাম, দু'বার দুখানা চিঠি লিখেছিলাম, তোমাকে বলিনি, পাছে তুমি রাগ কর। সে চিঠির কোন জবাব পাইনি। তাতে আশ্চর্য্য হইনি, কারণ

বাবা আমার বড় তেজস্বী মানুষ; তাঁদের চোখে আমি মরে গিয়েছি, তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই। তুমি যখন আমাকে ফেলে চ'লে গেলে, তখন যে আমি আবার তাঁদের দরজায় গিয়ে দাঁড়াব—সে আমি মরে গেলেও পারতাম না। আমারও কি সেটুকু তেজ নেই! তা'ছাড়া আমি তখন কি হয়েছি—তা' দেখে তাঁদের আরও কষ্ট হ'ত, মুখ আরও হেঁট হয়ে যেত—তা কি আমি পারি! বরং আমি যে মরে গেছি—সেই বিশ্বাসই তাঁরা রাখুন। দু'দিন আগে-পিছে বই-ত নয়, এতে আর ক্ষতি কি ?"

এই সময়ে একটা ভয়ানক কাশির বেগ এলো, তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাঁপতে লাগল। ফ্রাঁসোয়া আস্তে আস্তে তার মাথাটা বালিশের উপর নামিয়ে দিলে, একটু চুপ করে থাকতে বললে। কিন্তু সে আরও অধীরভাবে বলতে লাগল—

"দেখলাম, মরণ কিছুতেই আসেনা, বড় দেরী করছে। দেখলাম, আমার পুঁজি যা ছিল, আমার আগেই তা ফুরিয়ে গেল। তারপর, হপ্তাখানেক আগে আমি একদিন ঘরের জানালাটা বেশ ক'রে খুলে দিয়ে তার উপর বসলাম, প্রায় একঘণ্টা এমনিভাবে কেটে গেল। ভাবলাম, জীবন যদি এত কষ্টের হয়, তাহলে মরণ যে সত্যিই মধুর—বড় সুখের! আমি মরে গেলে, একবারটি তুমি এসো, আমার সেই মরা মুখখানা একবার দেখো; না, ফ্রাঁসোয়া, দেখতেই হবে—বল তুমি আসবে ?"

কনুইএর উপর ভর দিয়ে সে আবার উঠে বসল, তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।

"মৃত্যুকে আমি বরণ করব বটে, কিন্তু মৃত্যু কী পাবে ? আমি ত' আর সেই সুন্দরী আনেত্ নই—নিষ্কলঙ্ক কুমারী বধূ? কেন তোমাকে আসতে বলেছিলাম আমি ? যাও, তুমি চলে যাও! এসব কথা শুনলেও ভয় করে, তুমি আর শুনো না। তুমি আমাকে মনে মনে ঘৃণা কর,—আমি জানি, তুমি ঘৃণা কর। পাপ ত' আমারই! তুমি যাও, ওগো আমাকে একা একা মরতে দাও, কেউ থেকোনা আমার কাছে!"

বিগত যৌবনের কথা স্মরণ করে' তার মুখখানা যাতনায় বিকৃত হয়ে গেল, কান্নার বেগ চেপে বিছানার উপর সে ঢলে' পড়ল।

পরক্ষণে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা ফ্রাঁসোয়া, আমি যদি আজও তোমার সেই আদরের আনেত্ হয়ে থাকতাম, তাহলে কি আমার এমন করে মরতে হত ?"

গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে যুবক তখন সেই হতভাগিনীর মাথাটি তুলে ধরে' দু'বাহু দিয়ে তাকে বেষ্টন করে' রইল; সে যেন তাকে বুক দিয়ে রক্ষা করতে চায়। একদিন এমনি করেই সে তাকে নিজের দুষ্ট প্রেমের অনুশোচনা থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করত—পাছে সেই অনুশোচনার বশে সে তাকে ত্যাগ করে' যায়। আজ এই ছোট ঘরখানিতে, এই স্তিমিত দীপালোকে সেইসব দিনের কথা তার মনে এল; মনে হ'ল, সে সেই চার বচ্ছর আগেকার আর একখানি ছোট ঘরে ব'সে আছে; যেমন করে' আজ সে আনেত্‌কে তার দুই বাহু দিয়ে ধ'রে রয়েছে তখনও সে তেমনি তাকে বুকে করে' আগ্‌লে রাখত—পাপের ভয়, ভগবান বা মানুষের দেওয়া শাস্তির ভয় থেকে তার প্রেমই রক্ষা-কবচের মত তাকে রক্ষা করত। সেদিন সে তাকে কত প্রবোধ, কত সান্ত্বনাই না দিয়েছে! কিন্তু আজ? কিছু বলবার নেই যে তার! দু'চারটে কথা বলতে গেল— বেধে গেল, কি যে বলবে তাও ভেবে পেলে না।

"ভয় কি রাণী? আবার তোমাকে সুস্থ নীরোগ ক'রে তুলব আমি, তাতে সন্দেহ নেই। তোমার কেবল একটু—"

শুনে' দুঃখিনীর মুখ তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ব'লে উঠল—"তাই বলি, তুমি ছাড়া এত দরদ আর কার কাছে পাবো! ওগো, তুমি আমার জন্যে আর এত কোরো না, তা'হ'লে, আমার আর মরতে ইচ্ছে হ'বে না। আমি আর কিছু চাইনে, শুধু তাঁরা যেন জানতে পারেন যে, আমার অনুতাপ হয়েছিল, জীবনে যা'ই করে থাকি, মরণকালে আমার মনে আর কোন দাগ ছিল না; ফ্রাঁসোয়া, আমি এর বেশী আর কিছু চাইনে। তোমাকে এ অনুরোধ করতে আমার সাহস হয়নি, কিন্তু শুধু এইজন্যেই একবারটি তোমার দেখা পেতে আমি এমন আকুল হয়েছিলাম। সেদিন মাদাম ফ্লুরাঁ একজন ধর্ম্মযাজককে ডেকে এনেছিলেন। তিনি আমাকে বড় দয়া করলেন—বললেন, ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। তখন আমার বাবা আর মার কথা কেবলই মনে হ'তে লাগল; তা'হলে তাঁরাও আমায়

ক্ষমা করবেন নাকি? এখন তাঁরা কোথায় আছেন তা' আমি জানিনে। এইবার তোমাকে বলি, আমি একটা কুকর্ম্ম করেছিলাম। সে প্রায় এক বছর আগের কথা। একদিন খুব জোর করে' মনে মনে বললাম, মা আমার বড় কষ্ট পাচ্ছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবই। যে পাড়ায় তাঁরা থাকতেন, সেইখানে গিয়ে মাদাম ব্ল্যাজের নাম করে' খোঁজ নিলাম। বড় লজ্জা করতে লাগল, পাছে পাড়ার চৌকিদার আমায় চিনে ফেলে তাই একটা মোটা ওড়নায় মুখটা ঢেকে গিয়েছিলাম। সে বললে, "তারা প্রায় তিনমাস হ'ল এখান থেকে উঠে গেছে"। আমি ফিরে এলাম, মনে হ'ল আর কোন আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বড় কান্নাই কাঁদলাম। পরে ভয় হল, হয়তো তাঁদের কোন বিপদ ঘটেছে—হয়তো বাবা আর বেঁচে নেই! যে কারখানায় তিনি কাজ করতেন, গেলাম ছুটে সেখানে; মজুরেরা যখন বেরিয়ে এলো, তাদের জিজ্ঞেস করায় বললে, "জমাদারের কাছে যাও"। তার কাছে শুনলাম, বাবা তখন আর এক কারখানায় কাজ করছেন। আমার সেইখানেই যাওয়া উচিত ছিল, নয় কি? কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন। ঘরে ফিরে এসে আমি কিছুতেই বললাম না—কোথায় গিয়েছিলাম; কাঁদতে লাগলাম, তারপর কি মারটাই মারলে! পরের দিন আর সাহস পেলাম না। উঃ, কত যাতনাই সহ্য করেছি—মনে করলে বুকটা কেঁপে উঠে!"

গলার স্বর যেন আর টানতে পারছিল না, তার দম ফুরিয়ে এসেছিল। ফ্রাঁসোয়া তাকে আর কথা বলতে দিলে না। এর পর সে তাকে আশ্বাস দিলে, তার বাপ-মার ঠিকানা যেমন করে' হোক সে বার করবেই, তাঁদের ক্ষমা যাতে পায় তা' করবে; তার এ দুঃখ সে রাখবে না।

অতি মৃদুস্বরে, যেন চুপি-চুপি, সে বললে—

"তোমার বড় দয়া!—আমার প্রাণের ধন্যবাদ! এইবার আমার মনের অশান্তি দূর হল। আর একটু আমার কাছে থাকো—ভেবেও একটু সুখ পাই যে, আবার সেই আগেকার দিন ফিরে এসেছে। ফ্রাঁসোয়া, তুমি তো যেমন ছিলে ঠিক তেমনি আছো—তোমার ভালোবাসা একটুও কমেনি, আজও তেমনি আছে দেখছি। হয়তো, এ আমার একটা অন্যায় করা হলো, তোমাকে দুঃখ দিলাম; আমার মরণের কথা তুমি যদি একেবারে না

জানতে—সেই ছিলো ভালো। কিন্তু আমার যে বড় একা বোধ হচ্ছিল, ফ্রাঁসোয়া!"

শেষ কথাগুলো আরও অস্ফুট হয়ে এলো। চোখ দু'টি বুজে একখানি হাত ফ্রাঁসোয়ার হাতে রেখে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল সে। ফ্রাঁসোয়া একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে রইল। ছোট জানালার বাইরে তখন বসন্তের রাত ভোর হচ্ছে। যুবক আস্তে আস্তে তার হাতখানা খুলে নিলে, মৃদুস্বরে বললে, "আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি। দেয়ালের তাকের উপর দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে—তারপর সে কোনরকম ক'রে, দেয়াল ধরে' সিঁড়ি ও দরজাগুলো পার হয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছল।

কেমন একটা অদ্ভুত ভাবের আবেশে তার মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, রাস্তার সেই কুয়াসা-ম্লান উষালোক যেন তখনও সেই দুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি দিচ্ছিল না। একবার বাঁয়ে, একবার ডাইনে, গলির মোড় ফিরে সে যেন সেই স্থান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, অথচ তেমন ইচ্ছেও করছে না। শেষকালে বাড়ী পৌঁছে, নিজের ঘরে এসে বসে,' সে যেন আবার সহজ অবস্থায় ফিরে এল—তার আসল 'আমি'টাকে ফিরে পেলে। তারপর তার মনের মধ্যে, গত কয়ঘণ্টার যতকিছু ঘটনা সব যেন এক নিমেষে এক সঙ্গে দ্রুত ঘটে' গেল। আপনা-আপনিই সে চেঁচিয়ে উঠল—

"বাপ! এমন যে একটা কাণ্ড ঘটবে তা' আমি কখনো ভাবতেও পারিনি।"

ভাববার ইচ্ছেও তার ছিল না। তাড়াতাড়ি সে পোষাক খুলতে লাগল, এখন বিছানায় শুয়ে পড়তে পারলে হয়—যত শীগ্‌গির ঘুম আসে। হঠাৎ মতলবটা ফিরে গেল,—তার গৃহ-চিকিৎসকের নামে একখানা টেলিগ্রাম লিখে পোষাক পরবার টেবিলে রেখে দিলে, যাতে সকালে তার চাকর সেখানা দেখতে পায়। তারপর বিছানায় পড়ে' অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

ডাক্তারের কাছ থেকে জবাব এলো পরের দিন সন্ধ্যের সময়ে। চিঠিখানা খাঁটি ডাক্তারী ধরণে লেখা—কোন আশা দেননি তিনি। রোগিণীকে হাসপাতালে পাঠিয়ে কোন লাভ নেই—বড় জোর দু'তিন সপ্তাহের বেশি সে বাঁচতেই পারে না।

চিঠিখানা সে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলে, তখনও তাতে কয়লাগুলো মিটিমিটি জ্বলছিল একখানা চেয়ারে বসে' পড়ে' দুইহাতে মুখখানা ঢাকলে। সমস্তদিন

সে আনেতের কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করেছিল; যখনই তার কথা মনে হয়েছে, তখনই সে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, আনেতের ভয়টা মিথ্যা; অভাবে, দুঃখে, দারিদ্র্যে তার ঐ অবস্থা হয়েছে—একটু যত্ন পেলে, দুঃখ-দারিদ্র্য ঘুচলে, সে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। এখন থেকে সে তার সব ভার নেবে, তার ঋণ সে শোধ করবে। এমন চিন্তা সে তার জীবনে কখনো করেনি—কোন বিষয়ে দায়িত্বজ্ঞান তার ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল, জগতে এমন কিছু ঘটতে পারে না, যাতে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হয়। এখন ডাক্তারের ঐ রায় দেখে তার সেই সুখ-বিশ্বাস চূর্ণ হয়ে গেল। কয়েকবার সে বলে উঠল, "আহা, বেচারী আনেত্!" একটা গভীর অনুকম্পা তার বুকটাকে যেন চেপে ধরলে; হঠাৎ এই ভেবে সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে, আনেতকে এত দুঃখ সে দিতে পারলে কি ক'রে! এই যে নতুন করে' একটা বন্ধন গড়ে' উঠেছে, তাতে সে অবাক হয়ে মনে মনে গুঞ্জরণ করতে লাগল, "আমি যে তোমাকে সত্যিই ভালোবেসেছিলাম! তবে, এমন করে' তোমায় ত্যাগ করেছিলাম কি ক'রে?"

এই সুখোষ্ণ, সুগন্ধময় কক্ষে—দেয়ালে, ডেস্কে—কতদিনের কত আনন্দের, কত প্রেমলীলার নিদর্শন—কত নিমন্ত্রণ-লিপি, কত থিয়েটারের প্রলোভন-পত্র চারিদিকে ভিড় করে' রয়েছে; তাদের সেই নিস্তব্ধতাই যেন এ প্রশ্নের জবাব দিলে।

তখন সে আপন মনে বলে উঠলো, "যাই ঘটুক না কেন, মরবার আগে তার সুখ এবং শান্তির কোন আয়োজন অসম্পূর্ণ রাখব না। আমি তাকে কথা দিয়েছি, তার বাপ-মার খোঁজ করব, কালই আমার বেরুনো চাই।"

পাছে তাকে আবার তার সেই চিরকালের স্বভাব—সেই আলস্য ও সুখসন্ধানের অভ্যাস পেয়ে বসে, সংকল্প ভেঙ্গে যায়, তাই সে তখনি তার ডেস্কের কাছে গিয়ে বসল, কলমটা তুলে নিয়ে ভাবতে লাগল, আনেতের আত্মীয়দের ঠিকানা সে কেমন করে' খুঁজে বা'র করবে।

প্যারিসের জনারণ্যের মধ্যে কোথায় তারা? কেমন ধরণের পরিবার? নিশ্চয় তারা সবাই খেটে খায়; সকলের বয়স হয়েছে, ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে; একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে, ছেলেরা এখন জোয়ান হ'য়ে উঠেছে। আনেতের মুখে সে যে বিবরণ শুনেছিল, তার থেকেই তাদের ঘর-দোর এবং তাদের চেহারার একটা ছবি সে মনে মনে তৈরী করে নিচ্ছিল। কিন্তু

এসব হাঙ্গামা তার কেন? ভালো বিপদেই সে পড়েছে! হাঁ, একদিন সেই এক সন্ধ্যায় যখন সে প্রথম আনেতকে একটা ভাড়া-করা ঘরে নিয়ে আসে, তখন একটু আশ্চর্য্য হয়েই গিয়েছিল এই ভেবে যে, প্রায় দুমাস আগে 'বুলভারে'র রাস্তায় যে মেয়েটির সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল, সে এমন করে' তার কাছে ধরা দিলে কেমন ক'রে? সেই রাত্রেই সে জেনেছিল, মেয়েটির আপন জন আছে, তার পথ চেয়ে থাকবে তারা; কারণ, সে যখন কাঁদতে কাঁদতে ঝুপ ক'রে আর্ম্ম-চেয়ারটায় ব'সে পড়ল, তখন তার মুখ থেকে 'মা' কথাটা অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে পড়েছিল বটে! শেষে পরস্পরেব মধ্যে এত ভালবাসা হয়েছিল যে, যেন তারা দুটি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই; প্রেমে পড়ে' মেয়েটির যে ভয, তাব সেই বুকের কাঁপুনি—সেই জন্যেই তো তাকে পাওয়ার লোভ আরো বেশী হয়েছিল।

স্বপ্ন-দেখা বন্ধ রেখে এইবার তার সেই কথা কেমন ক'রে যে রক্ষা করবে তাই ভাবতে লাগল। কোন বে-সরকারী ডিটেকটিভের সাহায্য নেবে? না, সে বড় বাড়াবাড়ি করা হবে। সব চেয়ে সোজা হচ্ছে, 'বিয়াঁকুরে'র কারখানায় নিজে গিয়ে সন্ধান করা, কিংবা ওখানকার ম্যানেজারকে একখানা চিঠি লিখলেও হয়, তাই ঠিক করলে। ডাইরেক্টরী থেকে ঠিকানা দেখে নিযে দুখানা চিঠি লিখলে। এতেও যদি না হয়, তাহ'লে সে আর কি করতে পারে?

তিন দিন পরে জবাব এলো। তাতে ঠিকানা এবং আর যা কিছু খবব সবই ছিল। মঃ ব্র্যাজ এখন 'হালু'ব কারখানায় কাজ করছেন প্রায় এক বছর ধরে'; তাঁর ঠিকানা—১২নং প্যাপ্লিযে ষ্ট্রীট, বিয়াঁকুর।

তাহ'লে ত সব ঠিক হয়ে গেল, এখন কেবল তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারলেই তার কাজটা মিটে যায়। খোলা চিঠিখানা হাতে ক'রে এইবার আর এক ভাবনা হ'ল,—কাজটা যে বেশ একটু শক্ত, এর আগে তা' বুঝতে পারেনি। কিন্তু করতেই হবে যে, নইলে আনেত্ শান্তি পাবে না। কিন্তু এই সাক্ষাতের ফলাফল নির্ভর করছে ঐ তার আত্মীয়-স্বজনের উপর। আনেত্ বলে দিয়েছিল, তার বাপ কিছুতেই মেয়ের এই কলঙ্ক সহ্য করবে না—তাকে মেয়ে বলে' আর স্বীকার করবে না। আচ্ছা, যদি নাই করে, সে ভাল করে বুঝিয়ে বলবে, তাতে নিশ্চয়ই তারা নরম হবে।

কথাটা ভেবে মনে বেশ উৎসাহ হ'ল। ভেবে দেখলে, সেইদিনই সন্ধ্যার

য় কারখানার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। শ্রমিকদের দল যখন বেরিয়ে আসতে থাকবে, তখন সে বেশ করে তাদের লক্ষ্য করবে। তা'হলে তো এখনই বেরিয়ে পড়তে হয়, নইলে দেরী হয়ে যাবে।

পরের দিন, অনেক কাজ,—অনেক জায়গায় যাওয়ার কথা। একবার ভাবলে আনেত্‌কে এখনই খবরটা দিলে কেমন হয়?—যে, তার বাবার ঠিকানা পাওয়া গেছে? না, তার চেয়ে একেবারে পুরো খবরটা দেওয়াই ভালো, নইলে একটা মিথ্যা আশা দিয়ে শেষে নিরাশ করা হবে।

কিন্তু শেষে একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল, ঠিক কোন্ সময়টিতে দেখা করলে ভাল হয় তাও একটা ভাবনার কারণ হয়ে উঠল। আচ্ছা, সকালের দিকে গেলে কেমন হয়? তখন বাড়ীতে ওর মা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। মায়ের প্রাণ নিশ্চয় কেঁদে উঠবে—একে মেয়েমানুষ, তাতে আবার মা। হাঁ, সেই ভালো, একা তাঁর সঙ্গেই কথা কইবে।

না, শুধু একখানা চিঠি লিখবে?

যেমনই এই কথাটা মনে এলো, অমনি ফ্রাঁসোয়া নিজের সঙ্গে নিজের এই ছলনা ধরে ফেললে! আজ নিয়ে তিন দিন সে এমনি ক'রে নষ্ট করেছে। "কি অকর্ম্মণ্য আমি!" ব'লেই হ্যাট হাতে করে' বেরিয়ে পড়ল, তখনই একখানা গাড়ী ডেকে রওনা হ'ল।

* * * * *

ফ্রাঁসোয়া ভের্নিয়ে যখন বড় রাস্তাটার মোড়ে এসে পৌছল, তখন প্রায় ছ'টা বাজে। গাড়ী থেকে নেমে, গলিতে ঢুকবার আগে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে—গাড়োয়ানকে সেইখানে অপেক্ষা করতে ব'লে গেল। সূর্য্য নদীর ওপারে, আকাশপ্রান্তের বনরেখায় যেখানে একটা ফাঁক হয়ে আছে, সেইখানটি দিয়ে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে; নদীর উঁচু পাড়ের উপর রাস্তাগুলোর উপর, দূরে দূরে ছাড়া-ছাড়া যেসব বাড়ী দেখা যাচ্ছে তার উপর—সেই আলোর একটা আভা পড়েছে; নব-বসন্তের মাধুরীতে যেন আকাস-বাতাস ভরে' উঠেছে। ছোট-ছোট বাগানবাড়ীর পাঁচিলের গায়ে-গায়ে লতাগুলোয় ফুল ধরেছে, ছেলেমেয়ের দল খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। বাড়ীর গৃহিণীরা দরজায় বসে' গল্প করছেন—এখনি কারখানা থেকে পুরুষেরা ঘরে ফিরবে। বাড়ীর ভেতরে যে তাদের সন্ধ্যার আহার প্রস্তুত হচ্ছে সে খবরও পাওয়া যাচ্ছে—খোলা

জানালা দিয়ে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে, সেই গন্ধ বাইরের গাছপালার পুষ্পগন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

১২নং প্যাম্প্লিয়ে ষ্ট্রীট—একটা ছোট বাড়ী, দোতলা, টালির ছাদ—বড় জোর দুটিমাত্র পরিবার তাতে বাস করতে পারে। পাঁচিল বেয়ে একটা আঙুর-গাছ উঠেছে; বাড়ীর সামনে অনেকগুলি লিলাক-ফুলের গাছ—ফুল নেই, ঝাড়গুলি সবুজ হয়ে উঠেছে। লেসের বুনুনীর মত সেই ঝাড়-গুলোর সরু ডালের ফাঁক দিয়ে ফ্রাঁসোয়া দেখতে পেলে, নীচের একটি ঘরে একটি মেয়ে টেবিলের উপর সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন করছে। আপনা হ'তে তার কেমন একটা ইচ্ছে হ'ল—সে থালাগুলো গুণতে আরম্ভ করলে—তিনটে, চারটে, পাঁচটা। এইটেই কি তাদের বাড়ী? আর একটু অপেক্ষা করে' আরো ভালো করে' সব দেখে নেবার ইচ্ছে তার ছিল; কিন্তু পাছে কেউ তাকে দেখে ফ্যালে এই ভয়ে সে ফটকটা ঠেলে খুলে ফেললে। বাগানের পথটা পার হ'য়ে দরজার উপরে ঘা দিতেই সেই মেয়েটি এসে খুলে দিলে।

"মাদাম ব্ল্যাজ কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

উত্তর পাবার আগেই তার সন্দেহ দূর হয়েছিল; মেয়েটি দেখতে তার দিদিরই মত; তেমন সুন্দরী নয়, চেহারার তেমন সৌকুমার্য্য নেই বটে, তবু তারই মত—অর্থাৎ, ঠিক বোঝাতে পারা যায় না এমন একটা যে সাদৃশ্য একই পরিবারের সকলের মধ্যে প্রায় থাকে—তেম্নি একটি সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট। মেয়েটি তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, সে কিন্তু তার দিকে চাইতে পারলে না, চোখ নীচু করে' জিজ্ঞাসা করলে,

"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?"

"তিনি এখন কাপড়গুলোয় সাবান দিচ্ছেন; আমিও সঙ্গে ছিলাম, একটু আগে চ'লে এসেছি।"

"তা'হলে আমি একটু অপেক্ষা করি।"

মেয়েটি দেয়ালের পাশ থেকে একখানা চেয়ার টেনে এনে তাকে বসতে দিলে। ঘরের ভিতরকার আসবাবগুলোর পালিশ, ছিটের ঢাকা-দেওয়া ওল্টানো বিছানা, খাবার টেবিলে পাতা ধবধবে চাদর—এসব দেখে মনে হয়, এ বাড়ীতে একটু ভদ্র রকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে। লক্ষ্মীছাড়া গরীবেরা

যে রকম এক-একটা ঘরে ঠেসাঠেসি করে' বাস করে—এরা তেমন নয়, এরা সত্যিকার গৃহস্থ, গৃহধর্ম্ম পালন করে। মেয়েটি টেবিল থেকে প্লেটগুলো তুলে নিয়ে আবার তাকের উপর রেখে দিলে।

তাই দেখে ফ্রাঁসোয়া বলে' উঠল—"আমার জন্যে আপনার কাজ বন্ধ রাখবেন না, মাদ্‌মোয়াজেল!

সে উত্তর দিলে, 'তা' হোক, তাতে আর কি?'—কথাটা খুব ভদ্র এবং শোভন করে নেবার জন্যে অতিশয় সরল সুন্দর ভঙ্গিতে বললে, 'আমি আজ একটু আগে থাকতেই আরম্ভ করেছিলাম'।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো; শেষে, চুপ করে' বসে থাকাও যেমন, কিছু বলাও তেমনি মুস্কিল দেখে ফ্রাঁসোয়া বললে, "যাই, ততক্ষণ বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি।"

ফিরে এসে এবার তার চোখ পড়লো—ম্যাণ্টেলপীসের মাথায় একখানা ফোটোগ্রাফের উপর—দু'টি বালিকার মুখ, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে আছে, চুলের সঙ্গে চুল মিশে গেছে। তাদের মুখে একই হাসি, যেন বলছে, "আমাদের কেমন মিল—দু'জনে দু'জনকে কত ভালবাসি!"

সে আর দাঁড়াতে পারল না, আবার বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় তখন শ্রমিকের দল কর্ম্মস্থান থেকে বাড়ী ফিরছে—কাঁধের উপর একটা ক'রে ব্যাগ। একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে ব্ল্যাজদের বাড়ীতে এসে ঢুকল, তার বগলে একখানা বড় পাঁউরুটী। তার একটু পরেই দূরে স্যঁা নদীর দিক থেকে একটি স্ত্রীলোককে আসতে দেখা গেল,—ছোট্ট মানুষটি, মাথার চুলগুলি পাকা; একটা বড় কাপড়ে জড়ানো এক গাদা সার্ট-সেমিজ বয়ে নিয়ে আসছে। ফ্রাঁসোয়া তার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ ক'রে রইল, দেখলে, স্ত্রীলোকটি সেই বারো নম্বর বাড়ীর ফটকে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে মনে ভাবলে, আমি যে কি সংবাদ নিয়ে এসেছি তার কিছুই জানে না বেচারী। এইবার সে তার মনটাকে একটু ছেড়ে দিলে, তার চোখের উপর ভাসতে লাগল, এই শ্রমজীবী গৃহস্থের প্রতি-দিনকার জীবনযাত্রা; সারাদিন খেটে সন্ধ্যার বিশ্রাম; বাপ ছেলে সব একের পর এক ঘরে ফিরছে; কেবল সেই একজন—সেই মেয়েটি—আজ চার বছর হ'ল ঘরে ফেরেনি; সন্ধ্যাকালে পরিবারের সবাই একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসবে, কিন্তু সেখানে তার স্থান আর হবে না। তখন সে আবার ফিরে এসে সেই দরজায় ঘা দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, "আপনিই মাদাম ব্র্যাজ—না ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, মহাশয়।"

তখন সে একেবারে তার কাহিনী আরম্ভ করে দিলে।

"আমি এসেছি আপনার কাছে, মাদাম, একজন মহিলার অনুরোধে; তিনি আপনার কন্যা আনেত্‌কে আগে থেকেই জানতেন, এখন তিনিই তার দেখাশোনা করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। আপনার কন্যার বড় কঠিন ব্যারাম হয়েছে, ডাক্তারে জবাব দিয়েছে।"

যেই আনেতের নামটা উচ্চারণ করা অমনি বৃদ্ধার সেই কুঞ্চিত বিশীর্ণ মুখখানা একেবারে ঠোঁটের কাছ পর্য্যন্ত ফ্যাকাসে হয়ে গেল,—ঠোঁট একটু একটু কাঁপতেও লাগল, কিন্তু একটি কথাও কইলে না। দেখে ফ্রঁাসোয়ার প্রাণটা এমন করে উঠল, যা তার ধাতে সয় না।

সে বলতে লাগল, "আপনার সঙ্গে তার অনেকদিন দেখা হয় নি বোধ হয় ?"

মাদাম ব্র্যাজ মাথাটা আরো হেঁট করে' খুব ধীরে একবার নাড়লেন, বললেন, "না, অনেকদিন হয় নি।"

মেয়েটি এতক্ষণ তার মাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন মাকে সে আগ্‌লে রয়েছে। সে তার মার কথায় আর একটু যোগ করে বল্‌লে, —"আমাদের কাছে দিদি ত' অনেকদিন মরে গেছে।"

এর পর কিছুক্ষণ আর কথা নেই। এই নীরবতা—সেই প্রথম শোকের—আসল শোকেরই নীরবতা; আজকের এই যে নতুন আঘাত, তাতে পুরানো শোকটাই নূতন করে' জেগে উঠেছে।

ফ্রঁাসোয়া বল্‌লে, "আমার বোধ হয়, তার আকুল ইচ্ছে একবারটি আপনাদের দেখা পায়, কারণ. আর—", কথা আটকে গেল। তারপর শুরু করলে, "সে যে বাঁচবে না তা' সে জানতে পেরেছে। এর আগে সে কি কখনো আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইবার স্পর্দ্ধা করেছে ? বলুন ? কিন্তু আমার মতে, এখনো যদি আপনারা তাকে ক্ষমা করতে না পারেন, সেটা উচিত হবে না। সে আমাকে তার হয়ে বলতে বলেছে যে; তার এখন অনুতাপ হয়েছে, সে মরবার সময়ে ভগবানের নাম নেবার জন্যে একজন ধর্ম্মযাজককে ডেকে আনতে বলেছে।"

দারুণ শোকে এতক্ষণ যে মুখে কথা ছিল না, এখন সেই মুখ থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ বেরিয়ে এলো।

মাকে বুকের আরো কাছে চেপে ধরে' মেয়েটি বলে' উঠল, "আমরা যাবো দেখতে—কি বল, মা? যাবে না তুমি? এখ্খুনি যাবে না?"

মা ঘাড়টা একটু নেড়ে জবাব দিলেন, তারপর চোখ মুছে বললেন, "ওকথা আর বলবেন না দয়া করে'!—একবার তাকে হারিয়েছি, আবার হারাতে যে বড় কষ্ট হবে।"

এর পর তারা কি কি জানতে চায় তাই দেখবার জন্যে ফ্রাঁসোয়া খানিকটা অপেক্ষা করে' রইল। কিন্তু তারা দুজনেই যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে—শোকের অবস্থায় কৌতূহল আর ছিল না; এমন শোক মানুষের সচরাচর হয় না, কৌতূহল ত' সব সময়েই আছে।

খুব তাড়াতাড়ি আনেতের ঠিকানাটা তাদের দিয়ে যেই সে চলে যাবার উপক্রম করছে, এমন সময় পিছন দিকে বাড়ীর দরজা খুলে একটি লোক ভিতরে এলো। বেশ দীর্ঘাকার, মাথার চুল, দাড়ি সব প্রায় শাদা; মুখের রঙটা গেবে' একরকম কালো হয়ে উঠেছে, তবু চোখ দুটো যেন জ্বলছে। বৃদ্ধ এই অচেনা অতিথিকে স্বাগত-সম্ভাষণ করলে, তারপর তার মুখের দিকে ধীর স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ফ্রাঁসোয়ার হ'য়ে মেয়েটিই বলে উঠল, "বাবা, এই ভদ্রলোকটিকে একজন মহিলা পাঠিয়ে দিয়েছেন—এই কথা জানাবার জন্যে যে, আনেত্ আর বাঁচবে না। সে আমাদের একবার শেষ-দেখা দেখতে চায়, আমরা যেন তাকে ক্ষমা করি।"

বৃদ্ধ চমকে উঠলো। তারপর মেয়ের কথার জবাব না দিয়ে, আগন্তুকের দিকে চেয়ে তাকে বললে, "আমরা তাকে অনেকদিন হারিয়েছি, তার কথাও আর স্মরণ করিনে। আমরা গরীব বটে, কিন্তু আর সকলের মত আমাদের মান-ইজ্জত আছে।"

খুব ধীরে ধীরে এই কথাগুলি বলার পর বৃদ্ধ ফ্রাঁসোয়ার পানে চাইলে। ফ্রাঁসোয়া সে কথা স্বীকার করলে।

বৃদ্ধ আবার বলতে লাগলো, "একথা মানি যে, যে-সব মেয়েদের ঘরের বাইরে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়, তাদের খুব সাবধানে চলা উচিত—

কোন দোষ করলে ঐ কথা বলেই কাটিয়ে দেওয়া যায় না। তবু কাঁচা বয়েস, বুদ্ধি তখনো পাকে না, তাই যারা ভুলিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করে, তারাই গুরুতর অপরাধী—পাপিষ্ঠ তারাই; কারণ, জেনেশুনেই তারা এমন কাজ ক'রে থাকে। আমি যদি জানতে পারতাম, মশাই, একাজ কে করেছিল, তা'হলে, সে যত সামান্য লোকই হোক বা যত বড় লোকই হোক, তাকে এমনি করে' মেরে গুঁড়িয়ে ফেলতাম! পাপের অন্নে জীবন ধারণ করবার জন্যে আমরা ছেলেমেয়ে মানুষ করি নে। 'বুলভারের উপর তেমন বহু মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আমাদের ঘর থেকে বার করে' নিয়ে যাবার প্রয়োজন কি?"

হঠাৎ চুপ করে' গেল, বোধ হয় এই রকম উত্তেজনা দমন করতে চায়। তারপর বললে, "আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না। আমি জানি, আপনার কাছে এসব কথা এমন করে' বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছি আমি।" দেয়ালের গায়ে যে টেবিল লাগানো ছিল তার 'পরে ভর দিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়ালো, আর কিছু না বলে' মেজের কারপেটখানার দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটি বাপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

"হ্যাঁ বাবা, যাবো তার কাছে আমরা? একবার যাবো না?"

পিতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে।

"তুমিও যাবে না আমাদের সঙ্গে?"

বৃদ্ধ একটু কি ভাবলে, তারপর বললে, "না, তোরাই যা।"

তারপর ফ্রাঁসোয়ার দিকে চেয়ে বললে,

"কোথায় থাকে সে, আপনি জানেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, কাস্তানিয়ারি ষ্ট্রীট, ভোজিরার।"

বৃদ্ধ যেন মনে মনে একটা কি স্মরণ করতে লাগল।

"আমিও যৌবনকালে ঐ অঞ্চলে বাস করতাম—রেল-লাইনের খুব কাছে। শহরের যত গরীবরাই ওখানে বাস করে। বড় অভাবে পড়েছে সে—না? ও কাজের পরিণাম ত' ঐ রকমই হয়!"

সেই পুরানো কথা। সে ত' সকলেরই জানা। কিন্তু এখন তা' আর সেই রকমের জানা নয়—সে কথা এখন বৃদ্ধের নিজের কথা হয়ে উঠেছে। সে চুপ করে' তাই ভাবতে লাগল—কপালের রেখাগুলো গভীর হয়ে

উঠলো। ওদিকে পাশের ঘরে মেয়েরা যাত্রা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। বৃদ্ধের পিছনে তার দুই পুত্র নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিতে ঘরখানি আলো হয়ে উঠেছে। পুরুষেরা চুপ করে থাকলেও বাড়ীর গৃহিণীর চাপা ফোঁপানির শব্দ শোনা যাচ্ছিল—তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতেই যাত্রার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ফ্রাঁসোয়া প্রস্তাব করলে, তার যে গাড়ীখানা রাস্তায় দাঁড় করানো আছে তাতে ক'রেই সকলে যদি সহরে যায়, তবে আনেত্‌কে আরও শীগ্‌গির গিয়ে দেখতে পারা যাবে। তাবা একটু বিপন্নভাবেই এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল।

মঃ ব্র্যাজ এইবার তাকে সম্বোধন করে বললে, "আপনাকে ত' ধন্যবাদ দেওয়া হ'ল না, মশয়! অপরাধ নেবেন না; লোকে দুঃখটা সহজেই প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু লজ্জার কথা খুলে বলা যে বড় কঠিন!"

বৃদ্ধের সেই দীপ্ত চক্ষুদুটি বেয়ে ঝর ঝর কবে' জল পড়তে লাগল। ফ্রাঁসোয়ার ইচ্ছে হ'ল, একটু সমবেদনা জানায—সে তার হাত বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু কেউ কারো চোখের দিকে চাইতে পাবলে না, ফ্রাঁসোয়া তাব চোখ দুটো আর একদিকে ফিবিয়ে ছিল।

বাইরে এসে, স্ত্রীলোক দুটিকে সে গাডীতে চড়িযে দিয়ে, ঠিকানা ব'লে দিলে। গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিলে। তাকেও সঙ্গে যেতে বলায় সে এক কথায় নিরস্ত ক'রে বললে যে, কাছেই একটা জায়গায় তার একটা জরুরী কাজ আছে, কাজ সেরে সে হেঁটেই সহবে ফিরবে।

গাড়ীখানা ক্রমে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল; আর কিছুক্ষণ পরে আনেতের সঙ্গে তার মা ও বোনের দেখা হবে। যাক্, তার কাজ শেষ হ'ল; বেশ সহজেই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল। এইবার আনেত্‌কে তারা ক্ষমা করবে——তার প্রাণের দুঃখ দূর হবে। এ বিষয়ে তার আর ভাববার কিছু নেই। কিন্তু এতক্ষণ সে যে তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছিল, সেই কথা ভেবে তাব প্রাণে বড় ব্যথা লাগল। বৃদ্ধ যে রকম করে' তাব হাতখানা চেপে ধরেছিল, সে যেন একটা জ্বালার মত এখনও তার আঙ্গুলে লেগে রয়েছে। তারা কিছুই বুঝতে পারেনি, একটুও সন্দেহ কবেনি। এর যে একমাত্র সোজা—কিন্তু অর্থহীন—প্রতিকার আছে, সে হচ্ছে নিজের ঐ দুষ্কৃতির কথা জানিয়ে দিয়ে 'ডুয়েল' লড়তে রাজী হওয়া; তাতে তারা প্রতিশোধ নেওয়ার একটা সুযোগ পাবে। যদিও তাতে লাভ কিছুই হবে না, তবু তার নিজের প্রাণটা

এই ভেবে একটু সুস্থ হবে যে, সে নিতান্তই একটা পাষণ্ড নয়। এই গরীবদের চোখে সে একজন ভদ্র এবং ভালো লোক বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে, কিন্তু সে ত' একটা প্রতারণা।

সে তখন 'পাসি'-ঘাটের বাঁধানো পাড় ধ'রে শহরে ফিরে এসেছে। কেবলই আনেতের কথা মনে হচ্ছিল—কি ভালোবাসাই তারা পরস্পরকে বেসেছিল! অবিশ্যি, এমন কাজ ত' অনেকেই করেছে, কিন্তু তার জন্য এমন শাস্তি তো কেউ পায়নি, যদিও পাওয়াটা খুব উচিত; কথাটা তার প্রাণে বড় বেশী করে বিঁধতে লাগল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বাসনা হ'ল—এই মিথ্যার হীনতা সে আর সহ্য করবে না, সে আবার আনেতের সঙ্গে দেখা করবে, তার মুখে চুম্বন করবে, এবং সে-ই তার ক্ষমা ভিক্ষা করবে, কারণ ক্ষমার প্রয়োজন যে তারই বেশি। একখানা গাড়ী ডেকে সে ভোজিরারের দিকে ছুটল।

ঘরখানা প্রায় অন্ধকার, চাপা-কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় দেহটা সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে আনেত্, যেন মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করে' আছে; তার মুখখানা ভয়ানক শাদা হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে যে দুইটি নারী ব'সে ছিল, তাদের দিকে দৃক্‌পাত না করে' সে একেবারে আনেতের পাশে গিয়ে তার বিছানার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালো। অতিশয় মৃদুস্বরে তাকে বলতে লাগল, "আনেত্, এখন ত' তোমার মন শান্ত হয়েছে, হয়নি? আমাকেও ক্ষমা করবে না তুমি? আমি যে বড় অপরাধ করেছি!"

মেয়েটা চোখ খুলে তাকালো, বাহু দুটি বাড়িয়ে, তার সেই বড়ো ভালো-বাসার জিনিষ—প্রিয়জনের সেই মুখখানি—দুইহাতে ধরে' নিজের ঠোঁট দিয়ে তার ঠোঁট দুটো স্পর্শ করলে।

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ পিছন দিকে একটা চীৎকার-শব্দ শোনা গেল। মা এসে তার হাতখানা চেপে ধরলে। চীৎকার করে' বললে,—"ওঃ, তুমিই সেই! তুমিই তবে ওর সর্ব্বনাশ করেছিলে! যাও, বেরিয়ে যাও বলছি!"

ব্যাপারটা হঠাৎ হওয়ার জন্যে সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছিল না। কিন্তু আনেতের মা বিছানাটা পিছন করে' তার মুখোমুখী দাঁড়ালো, এবং কাঁপা-গলায় ফের বলে উঠলো,—"যাও বলছি, এখনই বিদায় হও! ওর মা আছে, মায়ের কোল আছে!"

সে চম্‌কে' সরে' দাঁড়ালো, তারপর একটি কথা না ব'লে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধঃপতন

(১)

বেট্‌ম্যান হাণ্টার দেশে ফিরিতেছে। গাড়ীতে ভালো ঘুম হয় নাই। টাহিটি হইতে সান্‌-ফ্রান্সিস্কো পৌছিতে ষ্টীমারে প্রায় দুই সপ্তাহ লাগে, সমস্ত সময়টাই তাহার দুশ্চিন্তায় কাটিয়াছে—এসংবাদ সে কেমন করিয়া জানাইবে? ট্রেনে যে তিনদিন কাটিয়াছিল, কথাগুলি কেমন করিয়া বলিবে তাহাই মনে মনে মুখস্থ করিতেছিল। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ী শিকাগোয় পৌছিবে, এখন তাহার ভয় হইতে লাগিল। যুবকটি অতি সৎপ্রকৃতির, তাই মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে—হয়তো যতখানি চেষ্টা করা উচিত ছিল সে তাহা করে নাই। পরের জন্য নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারে, এমন বিশ্বাস তাহার ছিল, সেই বিশ্বাস এখন টলিয়াছে। বেট্‌ম্যান জানে তাহার মনে কোন পাপ নাই, কিন্তু ইসাবেল লংষ্টাফের কাছে সে যখন এই কাহিনী সবিস্তারে বলিবে, তখন তাহার সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সে কি সহ্য করিতে পারিবে? এমন ভরসা তাহার হইতেছে না। ইসাবেল বড় বুদ্ধিমতী, তাহার দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইবে না, সে যাহা বুঝিয়া লইবে তাহা নির্ভুল হইবেই। ঐ গুণের জন্যই বেট্‌ম্যান ইসাবেলকে শ্রদ্ধা করে; কেবল রূপসী বলিয়াই সে তাহার অনুরক্ত নয়। পাতলা ছিপছিপে তাহার গড়ন, মাথাটি সর্ব্বদা উঁচু করিয়াই সে চলে; তাহার স্বভাবও কম সুন্দর নয়—যেমন তাহার সত্যনিষ্ঠা, তেমনই আত্মসম্মান-বোধ; নিজের মতামত-প্রকাশেও নির্ভীক। এক কথায় মার্কিন মেয়ের যতকিছু সদ্‌গুণ সবই তাহার আছে। কিন্তু আরও এমন একটি গুণ আছে যাহা একটি বিশিষ্ট পারিপার্শ্বিকের জন্যই ঘটিয়াছে,—এক শিকাগো ছাড়া পৃথিবীর আর

কোন শহরে এমন নারীরত্নের উদ্ভব হইত না। এমন নারীকে সে যখন ঐ সংবাদ দিবে, তখন সে যে কিরূপ আঘাত পাইবে তাহাই ভাবিয়া বেট্‌ম্যানের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তাই এডওয়ার্ড বার্ণার্ডের কথা মনে হইতেই তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল।

ট্রেন শিকাগো ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। রাস্তার দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজি দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল, এতদিনে সে দেশে আসিল। আবার দেশের সবচেয়ে যে বড় শহর তাহাই তাহার জন্মস্থান, একথা মনে করিয়াও প্রাণ পুলকিত হইল।

বাড়ী পৌঁছিয়া সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সারিয়া সে যেমনই নিজের ঘরখানিতে একটু একা হইবার অবসর পাইল, অমনি টেলিফোনটা তুলিয়া একটা নম্বর চাহিল। উত্তরে যে কণ্ঠস্বর শুনিল তাহাতে বুকটা যেন লাফাইয়া উঠিল, হাসি-হাসি ভাবে বলিল, "সুপ্রভাত, ইসাবেল!"

"সুপ্রভাত, বেট্‌ম্যান!"

"আমার গলার স্বর চিনলে কেমন করে'?"

"খুব বেশীদিন যে শুনিনি এমন তো নয়; তা ছাড়া, আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলাম যে।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে কখন?"

"যদি কোন কাজ না থাকে তা' হলে আজ সন্ধ্যায় আহারটা এইখানে এসেই কোরো।"

"তুমি তো জানোই, আমার এমন কোনো কাজ থাকতেই পারে না যার জন্য তোমার নিমন্ত্রণ ত্যাগ করব।"

"অনেক খবর আছে, না?"

বেট্‌ম্যান বুঝিতে পারিল, তাহার গলার স্বরে একটা আশঙ্কার ভাব রহিয়াছে, বলিল—

"হাঁ, অনেক খবর আছে।"

"আচ্ছা আজ রাত্রে সব শুনব, এখন আসি তবে।"—বলিয়া সে টেলিফোন ছাড়িয়া দিল। যে খবরের জন্য ইসাবেল এত ব্যাকুল তাহা পাইতে সে যে অধীরতা প্রকাশ করিল না—অকারণে এতখানি সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, ইহাও তাহার চরিত্রের একটা লক্ষণ। বেট্‌ম্যানের মতে, এমন আত্মসংযম সত্যই বিস্ময়কর।

রাত্রে আহারাদির পর ইসাবেল বেট্‌ম্যানকে যে ঘরটিতে লইয়া গেল, তাহার সহিত কতদিনের কত স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে! অগ্নিকুণ্ডে একখানা বড় কাঠ জ্বলিতেছে, দুইজনে তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিল। ইসাবেল বেট্‌ম্যানের মুখে কিছুক্ষণ গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া শেষে বলিল—

"এখন বল, কি বলবে?"

"কেমন করে' যে আরম্ভ করব তাই বুঝতে পারছিনে।"

"এডওয়ার্ড বার্ণার্ড দেশে ফিরবে, তো?"

"না।"

ইহার পর বেট্‌ম্যান অনেক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, দুইজনেরই মনের মধ্যে নানা ভাব তোলপাড় করিতে লাগিল। যে সংবাদ সে লইয়া আসিয়াছে তাহা প্রকাশ করা বড়ই কঠিন; তাহাতে এমন সব কথা আছে যাহা ইসাবেলের পক্ষে অপমানকর, বলিতে তাহারও কষ্ট হইবে। অথচ, নিজেকে ও ইসাবেলকে দোষমুক্ত করিবার জন্য একটি কথাও বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২)

এ কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে অনেক পূর্ব্বে। বেটম্যান হাণ্টার ও এডওয়ার্ড বার্ণার্ড দুইজনে তখন কলেজে সহপাঠী। ইসাবেল লংষ্টাফের 'সমাজ-প্রবেশ'-উপলক্ষে যে একটি বিরাট চা-পান-সভার অনুষ্ঠান হয় তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইসাবেলকে তাহারা সেই যে দেখিয়াছিল তাহাই একরকম প্রথম দেখা। তাহার পূর্ব্বে ইসাবেলকে চিনিত বটে, কিন্তু তখন সে নিতান্তই বালিকা; তাহারাও সবে মাথায় একটু লম্বা হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইসাবেল কিছুকাল য়ূরোপে ছিল, যখন ফিরিল তখন সে সুন্দরী যুবতী; দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। আবার নূতন করিয়া পরিচয় হইল, দুইজনেই মজিল। কিন্তু বেট্‌ম্যান শীঘ্রই বুঝিতে পারিল, ইসাবেলের টানটা এডওয়ার্ডের দিকে। তখন সে গভীর বন্ধু-প্রীতির বশে নিজের কামনা দমন করিল, বন্ধুর প্রেমে সে তাহার বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই সুখী হইতে চাহিল। সময়ে সময়ে প্রাণটা বড়ই কাতর হইত, তবু স্বীকার না করিয়া পারিত না যে, এ সৌভাগ্য এডওয়ার্ডের লাভ করাই উচিত, সে ঢের বেশী উপযুক্ত; তাই যাহাতে একটি কথায় বা কাজে তাহার নিজ হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে অতিশয়

সতর্ক হইয়া থাকিত, পাছে এমন বন্ধুব সহিত কোনরূপ মনান্তর ঘটে। ছয় মাস পরেই দুইজনেব বিবাহ স্থির হইয়া গেল; কিন্তু ইসাবেলের পিতা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিলেন—দুইজনেরই বয়স অল্প, অন্ততঃ এডওয়ার্ডের পড়াটা শেষ হউক। সেজন্য পুরা একবৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাহার পরেই একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটিল। একটা ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া যাওয়ায় এডওয়ার্ডের পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। একদিন রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার আর একটি পয়সা নাই; রাত্রির আহারের পর নিজের অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বন্দুকের দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। ইহার এক সপ্তাহ পরে এডওয়ার্ড বার্ণার্ড অতিশয় শুষ্ক পাংশু মুখে ইসাবেলের সহিত দেখা করিল; তাহাকে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বলিল। উত্তরে ইসাবেল তাহার বুকের উপর পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বার্ণার্ড বলিল, "তুমি এমন করিলে, আমার কাজ আরও কঠিন হইবে। কেবল কষ্টই বাড়িবে। চুপ কর, লক্ষ্মীটি!"

"তুমি কি মনে কর, আজ এইদিনে আমি তোমাকে ত্যাগ করিব? আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"কিন্তু আমিই বা কেমন করিয়া তোমাকে আমায় বিবাহ করিতে বলি? কোন উপায়ই আর নাই; তোমার বাবা কখনই সম্মতি দিবেন না। আমার একটি কাণাকড়িও নাই।"

"তাহাতে কি? আমি তোমাকে ভালবাসি।"

তখন বার্ণার্ড নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়াছিল সকলই বলিল। এখন তাহাকে রোজগাব করিতে হইবে। তাহার বাবার এক পুরাণো বন্ধু—জর্জ্জ ব্রাউনস্মিট্—তাহাকে তাঁহার ব্যবসায়ের কাজে ভর্ত্তি করিয়া লইবেন বলিয়াছেন। তিনি সাউথ্-সী অঞ্চলে ব্যবসায় করেন, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপে তাঁহাদের শাখা-কার্য্যালয় আছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উপস্থিত সে তাঁহার টাহিটির অফিসে কাজ শিখিতে থাকুক; সবচেয়ে বিচক্ষণ এক ম্যানেজারের অধীনে সে থাকিবে, তারপর, এই নানাদ্রব্যের ব্যবসায়ে যতকিছু জানিবার বুঝিবার আছে তাহাতে পাকা হইয়া উঠিলে, তিনি তাহাকে শিকাগো শহরেই একটা ভালো কাজ দিবেন। এমন সুযোগ আর মিলিবে না।

তাহার কথা শেষ হইলে ইসাবেলের মুখ আবার হাসিতে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল,

"এমন বোকা তুমি! তাই যদি, তবে আমাকে এতক্ষণ মিছামিছি এই যন্ত্রণা দিতেছিলে কেন?"

শুনিয়া বার্ণার্ডের মুখ প্রফুল্ল হইল, তাহার চক্ষু দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"বল কি, ইসাবেল! তুমি আমার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিবে!"

সে হাসিয়া বলিল "কেন, তুমি বুঝি অতটুকুরও যোগ্য নও?"

"দেখ ইসাবেল, হাসির কথা নয়; দোহাই তোমার, একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। হয়তো দুইবৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।"

"ভয় নাই। আমি যে তোমাকে ভালবাসি, এডওয়ার্ড। তুমি যখনই ফিরিয়া আসিবে, তখনই আমাকে পাইবে।"

ইসাবেলের পিতা মিঃ লংষ্টাফ খুব সহৃদয়ভাবে কন্যার এই ব্যবস্থায় রাজী হইলেন। এডওয়ার্ড তাহার বিদেশ-যাত্রার পূর্ব্বদিন সারা সন্ধ্যাটা তাঁহার গৃহেই কাটাইল। সান্ধ্যভোজনের পর, এডওয়ার্ডের সঙ্গে তাঁহার একটা কথা আছে বলিয়া তাহাকে তিনি পাশের ঘরে লইয়া গেলেন। এমন কি গোপন কথা থাকিতে পারে ভাবিয়া, এডওয়ার্ড একটু বিস্ময় বোধ করিল; গৃহস্বামীর সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইয়াও উঠিল। কথাটা বলিতে তাঁহার যেন বাধো-বাধো ঠেকিতেছে। প্রথমে দুই চারিটা বাজে কথার পর শেষে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন।

"তুমি বোধ হয় আর্ণল্ড জ্যাকসনের নাম শুনেছ?"—বলিয়াই ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া এড্‌ওয়ার্ডের মুখের দিকে তাকাইলেন।

এড্‌ওয়ার্ড ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, শেষে না বলিয়া পারিল না—

"হাঁ, শুনেছি। কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। সে সময়ে আমি তা'তে বিশেষ কাণও দিই নি।"

"তুমি তখন জানতে যে, সে ইসাবেলের মামা?"

"তা জানতাম।"

"শুনেছি, সে টাহিটিতে থাকে। আমি চাই, তুমি তার ছায়া মাড়াবে না। তবে, যদি তার কোন সংবাদ পাও—জানালে ইসাবেলের মা ও আমি খুসী হ'ব।"

"সে তো বটেই।"

"বাস্, আমার আর কিছু বলবার নেই। তুমি এখন মেয়েদের কাছে গিয়ে আলাপ করতে পারো।"

আজকাল তেমন সংসার খুব কমই আছে, যাহাদের এমন কোন আত্মীয় নাই যাহাকে ভুলিতে পারিলে বাঁচে—অবশ্য পাড়া-প্রতিবেশীরা যদি বাদ না সাধে। দুই-এক পুরুষ আগের হইলে, তাহার কাহিনী গল্পের মত সরস বা রোমাঞ্চকর হইয়া উঠে। কিন্তু তেমন লোক যদি জীবিত থাকে, তবে তাহার নাম উচ্চারণ না করাই মান-রক্ষার একমাত্র উপায়। আর্ণল্ড জ্যাকসন সম্বন্ধে ইহারা সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিসিদ্ধ ছিল। যে রাস্তায় তাহার বাড়ী ছিল সে রাস্তা দিয়াও ইহারা হাঁটিত না। আর্ণল্ড জ্যাকসন তাহার আত্মীয় স্বজনের মুখ বেশ ভালো করিয়াই পুড়াইয়াছিল। সে ছিল একটা ব্যাঙ্কের কর্ত্তা—ধনী ব্যক্তি; ধর্ম্মানুরাগের জন্যও নিজ সমাজে তাহার সুনাম ছিল; আবার, জনহিতৈষীও ছিল। শুধুই বংশ বড় বলিয়া নয়, মানুষটা খাঁটি বলিয়া সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। এই মানুষই একদিন জুয়াচুরীর অপরাধে অভিযুক্ত হইল। বিচারের সময়ে তাহার সেই কাজটির যে স্বরূপ প্রকাশ পাইল, তাহাতে এমন মনে করিবার কারণ রহিল না যে, হঠাৎ একটা বড় লোভ সামলাইতে না পারিয়া সে এমন কর্ম্ম করিয়াছে; বরং ইহাই প্রমাণ হইল—সে খুব হিসাব করিয়া, মতলবটি উত্তমরূপে ফাঁদিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল। অর্থাৎ, আর্ণল্ড জ্যাকসন একজন পাকা বদমায়েস। বিচারে যখন সাতবৎসর কারাদণ্ড হইল, তখন অনেকেই বলিয়াছিল, দণ্ডটা লঘু হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বার্ণার্ড যখন বিদায় গ্রহণ করিল তখন উভয়ে উভয়কে বারংবার সুগভীর ভালবাসা ও স্নেহের আশ্বাস দিল। ইসাবেল কাঁদিয়া ভাসাইল,—এডওয়ার্ড যে তাহাকে সত্যই ভালবাসে এই ভরসায় বেচারী বুক বাঁধিল। ইহা দুই বৎসর আগের কথা।

(৩)

তারপর প্রত্যেক ডাকে এডওয়ার্ড চিঠি দিয়াছে; সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশখানি চিঠি, কারণ, মাসে মাত্র একবার ডাক আসে। চিঠিগুলি যেমন প্রেমপূর্ণ হওয়া উচিত তেমনই,—সুন্দর, প্রাণখোলা। কখনও বা—বিশেষ করিয়া

শেষের গুলিতে—রসিকতাও থাকিত, আর—বেশ একটু মমতা। প্রথম প্রথম দেশে ফিরিবার জন্য আকুলতা ছিল—ইসাবেলের কাছে আসিবার জন্য। তাহাতে ইসাবেল ভয় পাইত, টিকিয়া থাকিবার জন্য অনুনয় করিত। তাহার ভাবনা, পাছে সে এমন চাকরি ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া আসে।

কিন্তু শীঘ্র বুঝিতে পারা গেল, সে স্থির হইয়াছে; ইসাবেলও জানিয়া সুখী হইল যে, ঐরূপ অচেনা অজানা জগতে সে আমেরিকার ধরণে উন্নত ব্যবসায়-পদ্ধতি চালাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। তবু ইসাবেল তাহার মনের দুর্ব্বলতা জানে; এক বৎসর কাটিয়া গেলে দেশে ফিরিবার জন্য তাহার যে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইবে তাহা দমন করাইবার জন্য তাহাকে যে অনেক সাধ্যসাধনা করিতে হইবে, ইহাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। এ বিষয়ে সে বেটম্যান হাণ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিত, এমন বন্ধু তো আর নাই। সে না থাকিলে,—এডওয়ার্ড চলিয়া যাইবার পর প্রথম কিছুদিন সে যে কি করিয়া কাটাইত তাহা জানে না। দুইজনেই স্থির করিল, এডওয়ার্ডের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথাটাই আগে। অতএব, ক্রমে যখন দেখা গেল, এডওয়ার্ড আর ফিরিবার নাম করে না, তখন ইসাবেল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। একদিন সে বেটম্যানকে বলিল,

"কি মনের জোর দেখেছ! আশ্চর্য্য নয়!"

"একেবারে হীরের টুকরো বললেই হয়, কোনখানে একটু দাগ নেই।"

"চিঠিগুলো খুব লক্ষ্য করে' পড়লে বোঝা যায়, সেখানে থাকতে তার একটুও ইচ্ছে নেই, তবু জোর করে' থাকতে হচ্ছে, কেন না—"

মুখখানা লজ্জায় একটু রাঙা হইয়া উঠিল। বেটম্যান, তাহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া, ইসাবেলের কথাটা পূরণ করিয়া দিবার ছলে বলিল—"কেননা—সে তোমাকে ভালবাসে।"

"আমার লজ্জা হয়,—আমি কি তার যোগ্য?"

"তোমার তুলনা নেই, ইসাবেল!—অতুলনীয় তুমি!"

কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরও কাটিয়া গেল। প্রতি মাসে সেই একভাবে চিঠি আসিতে লাগিল। এইবার, এখনও সে দেশে আসিবার নাম করে না দেখিয়া, ইসাবেল আশ্চর্য্যবোধ করিল। তাহার চিঠি পড়িয়া মনে হয়, সে যেন টাহিটিতেই বাস করা স্থির করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়—খুব ভাল আছে। তখন

ইসাবেল পুনরায় চিঠিগুলা পড়িয়া দেখিল, সবগুলিই অনেকবার পড়িল। এইবার সে লক্ষ্য করিল, চিঠিগুলার ভাব যেন সত্যই অন্যরূপ, এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই। শেষের চিঠিগুলা আগেকার মতই সুন্দর ও প্রেমপূর্ণ, তবু সুরটা যেন এক নয়। সেগুলিতে যে একটা রসিকতার ভঙ্গি রহিয়াছে, তাহাতেই মনে সন্দেহ জাগে। সে যেন বড়ই হাল্‌কা—যেন কিছুই-না-মানার ভাব; দেখিয়া ইসাবেলের ভাবনা হইল। এ যেন সে-এডওয়ার্ড নয়। একদিন বিকালে—তার আগের দিন টাহিটির ডাক আসিয়াছে—বেটম্যানের সঙ্গে গাড়ীতে যাইতে যাইতে সে তাহাকে বলিল—

"এডওয়ার্ড কবে সেখান থেকে রওনা হবে, তার কিছু লিখেছে?"

"না, সে সব কিছু লেখেনি। আমি ভেবেছিলাম হয়তো তোমাকে লিখে থাকবে।"

"একটি কথাও না।"

ইসাবেল হাসিয়া বলিল, "তুমি তো জানো, ওর যদি সময়ের কোন জ্ঞান থাকে! এবার তুমি যখন তাকে চিঠি লিখবে, যদি মনে থাকে জিজ্ঞাসা কোরো তো, কবে সে আসবে ঠিক করেছে।"

কথাটা এমনভাবে বলিল, যেন সেজন্য সে বিশেষ চিন্তিত নয়, যেন সাধারণ ভাবেই একটা অনুরোধ করিল। কিন্তু বেটম্যানের অনুভূতি তীক্ষ্ণ বলিয়া সে বুঝিতে পারিল, ইহা তাঁহার আকুল অনুরোধ।

হাঁ, লিখবো তাকে। কি যে তার মতলব, বোঝা যাচ্ছে না।"

ইহার কয়েকদিন পরে আবার যখন দেখা হইল, ইসাবেল বেশ বুঝিতে পারিল, বেটম্যান একটু ভাবনায় পড়িয়াছে। এডওয়ার্ড চলিয়া যাওয়ার পর ইহাদের মেলামেশা কিছু বাড়িয়াছিল। এডওয়ার্ড দুইজনেরই বড় আপন, তাই তাহার সম্বন্ধে কথা কহিবার জন্য উভয়ে পরস্পরের সঙ্গ কামনা করিত। তাই ইসাবেল বেটম্যানের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিত। এবারেও বুঝিতে পারিল—এডওয়ার্ডের কোন সংবাদে বেটম্যান ঐরূপ চিন্তিত হইয়াছে। কথাটা সে না জানিয়া ছাড়িবে না। অগত্যা বেটম্যান বলিয়া ফেলিল।

"কথাটা আর কিছু নয়—শুনলাম এডওয়ার্ড নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—সে আর ব্রাউনস্মিট্ কোম্পানীর কাজ করে না। কাল সুবিধে পেয়ে একেবারে খোদ মিঃ ব্রাউনস্মিটকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"তারপর ?"

"এডওয়ার্ড প্রায় এক বৎসর হল তাঁদের ওখানে নেই।"

"কি আশ্চর্য্য ! এতদিন সেকথা আমাদের লেখেনি !"

বেটম্যানের বলিতে বাধিল, কিন্তু এতখানি বলার পর বাকিটা না বলিয়া পারিল না, বড়ই বিপদে পড়িয়াছে।

"ওরা তাকে জবাব দিয়েছে।"

"অ্যাঁ ! বল কি ! কিসের জন্য ?"

"তাকে নাকি দু' একবার সাবধান করে' দিয়েছিল, তারপর তাড়িয়ে দিয়েছে। তারা বলে, ছোকরা যেমন কুড়ে, তেমনি অপদার্থ।"

"এডওয়ার্ড !"

কিছুক্ষণ দুইজনে চুপ করিয়া রহিল, তারপর ইসাবেল কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ বেটম্যান তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল—

"কেঁদো না, কেঁদো না বলছি ! দেখে আমার বড় কষ্ট হয়।"

তারপর ইসাবেলকে একটু সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল,

"ব্যাপারটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না ; বড় অদ্ভুত না ? এডওয়ার্ড এমন হ'তেই পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোথাও একটা ভুল ঘটেছে।"

ইসাবেল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে যখন কথা কহিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে আর তেমন জোর নাই। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

"ইদানীং তার চিঠিগুলো কেমন যেন অদ্ভুত বলে' তোমার মনে হয়নি ?" তাহার চোখ দুইটি জলে চকচক করিতেছে।

বেটম্যান কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, সায় দিয়া বলিল, "হাঁ, একটা পরিবর্তন আমিও লক্ষ্য করেছি। যেন, তার চরিত্রের যেটা প্রধান গুণ—কোন বিষয়কেই ছোট ক'রে না দেখা—যার জন্য আমি তাকে এত শ্রদ্ধা করতাম—তা যেন আর নেই। মনে হয়, সংসারে যেগুলো মেনে চলা উচিত সেইগুলোই সে—বলতে কি—যেন মানেই না।"

ইসাবেল কোন উত্তর দিল না ; একটা অজানা কারণে সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

"হয়তো এইবার তোমার চিঠির উত্তরে সে লিখবে কবে আসছে। ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি ?"

আর একখানা চিঠি আসিল, তাহাতেও আসিবার কোন কথা নাই ! হয়তো

বেটম্যানের চিঠি তখনও পায় নাই, ইহার পরের ডাকে সে চিঠির উত্তর আসিবে। পরের ডাক আসিল। সেই চিঠি লইয়া বেটম্যান ইসাবেলকে দেখাইতে গেল। মুখ দেখিয়াই ইসাবেল বুঝিল, বেটম্যানের মন বড় খারাপ হইয়াছে। ঠোঁট দুইটা ঈষৎ চাপিয়া চিঠিখানা সে পড়িয়া গেল, আরও একবার পড়িল, আবার পড়িল।

"এমন অদ্ভুত চিঠি দেখিনি—আমি এর কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

"পড়ে মনে হয়, সে যেন আগাগোড়া তামাসা ক'রে চলেছে।"

কথা বলিতে গিয়া বেটম্যানের মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল।

"সেই রকম বোধ হয় বটে, কিন্তু ইচ্ছে করে' করেনি। এ যেন এডওয়ার্ডের চিঠিই নয়!"

"আসবার কথা কিছুই লেখে নি।"

"তার ভালবাসায় আমার যদি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকত, তা' হ'লে বলতাম —কি যে বলতাম তা জানিনে।"

এইবার বেটম্যান তাহার মনের কথাটা বলিল। মতলবটা সেইদিন বিকালেই তাহার মাথায় আসিয়াছে। তাহার বাবার যে মোটরগাড়ীর ব্যবসায় ছিল সে এখন তাহার অংশীদার। স্থির হইয়াছে, এইবার সিড্‌নী, হনলুলু ও ওয়েলিংটন শহরে কয়েকটা শাখা স্থাপন করা হইবে, সেজন্য ম্যানেজারকে পাঠাইবার কথা। এক্ষণে ম্যানেজারের বদলে সে নিজেই যাইবে। ফিরিবার সময়ে সে টাহিটি দিয়া আসিবে—ওয়েলিংটন হইতে আসিবার পথেই পড়ে। তাহা হইলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে।

"এর ভিতরে একটা কিছু আছে, সেটা আমাকেই খোলসা করতে হবে।"

ইসাবেল বলিয়া উঠিল,

"তোমার দয়ার সীমা নেই, বেটম্যান!"

"তুমি তো জানো, ইসাবেল,—তুমি সুখী হও এর চেয়ে বড় কামনা আমার কিছু নেই।"

ইসাবেল তাহার মুখের পানে একবার চাহিল, তারপর নিজের হাতখানি তাহাকে দিল।

"তোমার মত কেউ হয় না! আমি জানতাম না, তোমার মত এত ভালো সত্যিই কেউ হ'তে পারে। তুমি যে আমার কি উপকার করলে তা' আর কি বলব!"

"এর জন্যে তোমাকে এত করে' কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না; বরং আমিই তোমার কোন উপকার করতে পারলে ধন্য হ'ব।"

ইসাবেলের চক্ষু দুইটি অবনত হইল, মুখে একটু লাল আভা ফুটিয়া উঠিল। বেটম্যানকে নিত্যই দেখে বলিয়া তাহার আর মনেই হয় না, সে কত সুপুরুষ। এডওয়ার্ডের মতই সে দীর্ঘকায় ও সুগঠন। বর্ণ তাহার মত উজ্জ্বল নয়, মুখের রং একটু পাণ্ডুর—এডওয়ার্ডের মুখে রক্তের আভাই বেশি। বেটম্যান যে তাহাকে ভালবাসে, সে কথা ইসাবেল অবশ্যই জানিত—তাহার জন্য দুঃখ হইত, বড় মমতা বোধ করিত।

(৪)

বেটম্যান হাণ্টার সেই যে বিদেশযাত্রা করিয়াছিল, এখন তাহা হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্যবসায়-সম্পর্কের কাজগুলা সারিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, সেই সময়টাতে প্রিয়জন দুইটির সম্বন্ধে সে অনেক চিন্তা করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার ধারণা হইযাছে, এডওয়ার্ডের দেশে না ফিরিবার কারণ খুব গুরুতর নয়। তাহার আত্মসম্মানবোধ কিছু বেশী, তাই হয়তো সে নিজের অবস্থার বেশ একটু উন্নতি না হইলে ইসাবেলের পাণিগ্রহণ করিবে না, তাই বিলম্ব করিতেছে। কিন্তু তাহার ঐ আত্মাভিমান যে কিছু অতিরিক্ত, সে কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহাতে ইসাবেলকে যে কষ্ট দেওয়া হয়। এডওয়ার্ডকে তাহার সঙ্গে শিকাগোয় ফিরিতে হইবে, ফিরিয়াই বিবাহ করিবে। বেটম্যানের পিতার যে মোটরের ব্যবসা আছে তাহারই একটা উপযুক্ত পদ এডওয়ার্ডের জন্য ঠিক করা অসম্ভব হইবে না। এই সকল ভাবিয়া বেটম্যানের মমতা-কাতর হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, নিজের ক্ষতি করিয়া সে যে ঐ দুইজনকে সুখী করিতে পারিবে, ইহার মত সুখ আর কি আছে? উহারা যে তাহার পরমাত্মীয়। উহাদের পুত্রকন্যা হইলে বেটম্যানই তাহাদের ধর্ম্মপিতা হইবে। তারপর, যখন তাহারা বড় হইবে—যখন হয়তো, তাহাদের বাপ মা কেহই আর বাঁচিয়া নাই, তখন সেই বৃদ্ধ বয়সে সে ইসাবেলের কন্যাকে বলিবে—একদিন, সে অনেকদিন আগে, বেটম্যান তাহার মাকে ভাল বাসিয়াছিল। এ দৃশ্য কল্পনা করিতেও তাহার দুই চোখ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হইয়া গেল।

এডওয়ার্ডকে হঠাৎ দেখা দিয়া চমকাইয়া দিবে এই মনে করিয়া, সে তাহাকে টেলিগ্রাম করে নাই। টাহিটি পৌছিয়া জাহাজ হইতে নামিয়াই সে একটা

ছোকরার সঙ্গে ছোকরার বাপের হোটেলে চলিল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার দেখা পাইয়া বন্ধুর মুখটা কেমন হয়, শীঘ্রই তাহা দেখিবার জন্ম সে অধীর হইয়া উঠিল। পথে যাইতে যাইতে সেই ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"আচ্ছা, মিঃ এডওয়ার্ড বার্ণার্ড কোথায় থাকেন, বলতে পারো ?"

যুবক উত্তর করিল, "বার্ণার্ড ? নামটা চেনাচেনা বটে।"

"আমেরিকায় বাড়ী; বেশ লম্বা দোহারা চেহারা, মাথার চুল ফিকে ব্রাউন রঙের, চোখ দু'টা নীল। তিনি এখানে দু'বছরের উপর বাস করছেন।"

"ঠিক! এইবার চিনতে পেরেছি। আপনি মিঃ জ্যাকসনের ভাইপো'র কথা বলছেন তো ?"

"কার ভাইপো!"

"মিঃ আর্ণলড্ জ্যাকসন।"

"না, সে লোক নয়।"

বেটম্যানের উৎসাহ নিবিয়া গেল, সে স্তম্ভিত হইল। আর্ণল্ড্ জ্যাকসনের নাম সকলেই শুনিয়াছে; যে-নামে সে জেল খাটিয়াছে সেই নাম গোপন না করিয়া সে ইহাদের মধ্যে বাস করিতেছে কেমন করিয়া? কিন্তু সে যে কাহাকে তাহার ভাইপো বলিয়া চালাইতেছে বেটম্যান ভাবিয়া পাইল না। ইসাবেলের মা-ই তাহার একমাত্র ভগিনী—ভাই কেহ ছিল না। ছোকরা তাহার পাশে পাশে ইংরেজীতে বকিয়া চলিয়াছে—কথার টানটা অন্য ভাষার মত। বেটম্যান আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, তাহার দেহে ঐ-দেশীয় রক্তই বেশি। দেখিবামাত্র তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গি আপনা হইতেই রুক্ষ হইয়া উঠিল। হোটেলে পৌছিয়া নিজের ঘর ঠিক করিয়া, সে ব্রাউনস্মিট কোম্পানীর দোকান কোথায় জানিয়া লইল। সমুদ্র এই দ্বীপটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ধার পর্য্যন্ত রাস্তা। প্রায় আটদিন জাহাজে আটক থাকার পর, বেটম্যান আজ এই রাস্তার উপর দিয়া চলিতে বড়ই আরাম পাইতেছিল। প্রায় জলের কিনারার কাছে পৌছিয়া গম্য-স্থান দেখিতে পাইল। ম্যানেজারকে কার্ড পাঠানোর পর, একটা খুব বড় উঁচু ঘরের ভিতর দিয়া তাহাকে লইয়া গেল—ঘরখানা গুদামের মত, তাহার পরেই অফিস। সেখানে একজন ভারী চেহারার লোক বসিয়া আছে—চোখে চশমা, মাথায় টাক।

"মিঃ 'এডওয়ার্ড বার্ণার্ড কোথায় থাকেন বলতে পারেন? তিনি এই আফিসেই কিছুদিন কাজ করেছিলেন।"

"সে ঠিক, কিন্তু এখন কোথায় আছেন বলতে পারিনে।"

"আমি জানি, তিনি মিঃ ব্রাউনস্মিটের কাছ থেকে বিশেষ সুপারিশ নিয়ে এখানে এসেছিলেন। মিঃ ব্রাউনস্মিটের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

মোটা লোকটি বেটম্যানের 'দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধভাবে চাহিল। পাশের মালঘর হইতে একটা চাকরকে ডাক দিয়া বলিল, "হ্যাঁরে হেন্‌রি, বার্ণার্ড এখন কোথায় থাকে বলতে পারিস্? তুই তো জানিস্।"

"যতদূর জানি, তিনি এখন ক্যামেরন-দের ওখানে কাজ করেন।"

স্থূলকায় ভদ্রলোকটি মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন, তারপর বলিলেন,

"এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাঁয়ের পথ ধরে' গেলে আপনি তিন মিনিটের মধ্যে ক্যামেরনদের দোকানে পৌছে যাবেন।"

বেটম্যান তবুও একটু দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে বলিল,

"আপনাকে তা' হলে খুলেই বলি; বার্ণার্ড আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে এই আপিস ছেড়ে চলে' গেছে শুনে ভারী আশ্চর্য্য হয়েছি।"

"মনে হচ্ছে যেন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর কোন কোন বিষযে মতভেদ হয়েছিল।"

লোকটার ভাবভঙ্গি বেটম্যানের ভালো লাগিল না। অতঃপব সে মানে মানে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পরে, বাহির হইয়া কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, লোকটা তাহাকে অনেক খবর দিতে পারিত কিন্তু কিছুতেই দিবেনা। শীঘ্রই ক্যামেরন কোম্পানীব দোকানে আসিয়া পড়িল—খুচরা জিনিসের দোকান, পথে এমন পাঁচ-ছয়টা সে পার হইয়া আসিয়াছে। ঢুকিবামাত্র সে একেবারে সামনে যাহাকে দেখিল সে আর কেহ নয—এডওয়ার্ড। একটা শার্ট মাত্র গায়ে দিয়া সে খানিকটা সুতী কাপড় মাপিয়া দিতেছে। এডওয়ার্ড তাহার পানে তাকাইবামাত্র চিনিতে পারিয়া হর্ষে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—"আরে, বেটম্যান যে! তুমি এখানে!"

কাউণ্টারের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া বেটম্যানের হাতটা খুব জোরে কচলাইয়া দিল। তাহার মনে কোন সঙ্কোচ নাই, বেটম্যানই বিপন্ন বোধ করিল

কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া সে সেই কাপড়খানায় কাঁচি চালাইয়া সেটাকে ভাঁজ করিয়া, কাগজে মুড়িয়া ও দড়ি দিয়া বাঁধিয়া—সম্মুখে যে কৃষ্ণবর্ণ খরিদদারটি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল,

"ঐ ডেস্কে যিনি বসে' আছেন—দামটা ওর হাতে দিয়ে যাবেন অনুগ্রহ করে'।"

তারপর, হাসি-হাসি মুখে, উৎফুল্ল চোখে, বেটম্যানের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

"এখানে দর্শন দেওয়ার মানে? সত্যি, ভাই, ভারি খুসি হয়েছি তোমায় দেখে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? বস'! বেশ হাত পা' মেলে আরাম কর।

"এখানে কথাবার্ত্তার সুবিধে হবে না, তুমি আমার হোটেলে চল। এখন আসতে পারবে?"—

জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছিল না।

"পারবো না কেন? টাহিটিতে আমরা অত নিয়ম-কানুন মানিনে।

সামনের কাউণ্টারে যে চীনা কর্ম্মচারী কাজ করিতেছিল তাহাকে ডাক দিয়া বলিল,

"আ-লিঙ, বড় সাহেব এলে তাঁকে বোলো যে, আমার এক বন্ধু এই মাত্র আমেরিকা থেকে এসে পৌচেছেন; আমি তাঁর সঙ্গে একটু খানাপিনা করতে গিয়েছি।"

চীনা যুবক দন্তবিকাশ করিয়া একটু হাঁসিল, বলিল,

"অল লাইট!"

এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চড়াইয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া বন্ধুর সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। বেটম্যান একটু রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিল—

"আমি ভাবতেই পারিনি, তোমাকে এই অবস্থায় দেখব,—একটা নোংরা নিগারকে সাড়ে তিন গজ ছিটের কাপড় বিক্রি করছ!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

"ব্রাউনস্মিট আমাকে তাড়িয়ে দিলে, তখন ভাবলাম, মন্দ কি, যা পাই তাই করি না কেন?"

এডওয়ার্ডের এই রকম খোলাখুলি কথা শুনিয়া বেটম্যান ভড়কাইয়া গেল, কিন্তু এবিষয়ে এখনই আর কিছু বলা সঙ্গত নয় মনে করিয়া সে চুপ করিল; কেবল নীরস কণ্ঠে জবাব দিল,

"আমার তো মনে হয় না, কাজটা এমন কিছু যার থেকে তুমি লক্ষপতি হ'তে পারবে।"

"আমারও তা মনে হয় না। কিন্তু ওতেই আমার চলে যাবে, এর বেশী আমি চাইনে।"

"তু' বছর আগে কিন্তু তুমি এমন কথা বলতে না।"

আরে ভাই, মানুষের বয়স যত বাড়ে-জ্ঞানও তত বাড়ে যে!"—এডওয়ার্ড হাসিয়া জবাব দিল।

বেটম্যান তাহার দিকে একবার তাকাইল। এডওয়ার্ড একটা বাজে কাট-এর কোট পরিয়াছে, তাহার হ্যাটটাও ঐ দেশেরই তৈয়ারী—কাঠি-ঘাসে বোনা ষ্ট্র-হ্যাট। চেহারা আগের চেয়ে একটু পাতলা দেখাইতেছে; মুখের রং রোদ-পোড়া, তাহাতে বরং আরও সুন্দর দেখাইতেছে। কিন্তু তাহার মুখ-চোখের ভাব এমনই যে, বেটম্যান শঙ্কিত হইল। চলার ভঙ্গিটাও নূতন—কেমন একটা বেপরোয়া ভাব; কথাবার্ত্তায় কোনরূপ সতর্কতা নাই; সব কিছুতেই ফুর্ত্তি। এ সকলের কোনটাই দোষের নহে, তবু বেটম্যান বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। মনে মনে বলিল, "ওর এত ফুর্ত্তি হয় যে কিসে তা' তো ভেবে পাইনে!"

হোটেলে পৌঁছিয়া তাহারা সামনের খোলা বারন্দায় আসিয়া বসিল; একটা চীনা ভৃত্য ককটেল দিয়া গেল। এডওয়ার্ড শিকাগোর খবর জানিবার জন্য অধীর হইয়াছে, বন্ধুকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আগ্রহ যেমন স্বাভাবিক তেমনই আন্তরিক। কিন্তু একটা কারণে অদ্ভুত ঠেকিতেছিল; শিকাগোর সকল সংবাদই যেন তাহার কাছে সমান মূল্যবান—বেটম্যানের পিতার সংবাদও যেমন, ইসাবেলের সংবাদও তেমনই। ইসাবেলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে তাহার একটুও ভাবান্তর নাই—যেন বাগদত্তা ও ভগিনীতে কোন তফাৎ নাই। এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের মূলে এডওয়ার্ডের মনোভাবটা ঠিক কি তাহা বুঝিয়া লইবার আগেই বেটম্যান দেখিল, সে কথায় কথায় তাহার ব্যবসায় ও বিষয়-কর্ম্মের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন স্থির করিল, এইবার সে ইসাবেলের কথা পাড়িবে—তাহারই সুযোগ খুঁজিতেছে এমন সময়ে, এডওয়ার্ড রাস্তায় একজনকে যাইতে দেখিয়া যেন একটু উচ্ছ্বসিতভাবে হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিল।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি নিকটে আসিলেন। বেশ দীর্ঘাকার, মেদবর্জ্জিত দেহ; শাদা হাফ্-পা'জামা পরা; মাথার গঠনটি সুন্দর, তাহাতে বড় বড় কোঁকড়া পাকা চুল; মুখ গোল নয়—লম্বা, চাঁচা-ছোলা; নাকটি বেশ বড় আর উঁচু—সুবঙ্কিম। সুন্দর ভাবব্যঞ্জক ওষ্ঠাধর।

"ইনি আমার ছেলেবেলার বন্ধু—বেটম্যান হাণ্টার। এঁর গল্প আপনার কাছে করেছি।"—কথাগুলি বলিবার সময়ে এডওয়ার্ডের ঠোঁটদুইটা যেন হাসি চাপিতে পারিতেছিল না।

"আপনাকে দেখে ভারি সুখী হ'লাম, মিঃ হাণ্টার। আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।"

অপরিচিত ভদ্রলোক বাহু বাড়াইয়া বেশ জোরে এবং স্নেহভরে বেটম্যানের করমর্দন করিলেন। এইবার এতক্ষণে এডওয়ার্ড বেটম্যানকে তাঁহার নাম বলিল,

"মিঃ আর্ণলড্ জ্যাকসন।"

বেটম্যানের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, মনে হইল, তাহার হাত দুইখানা ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। এই লোকটাই তাহা হইলে সেই জালিয়াত, জেলের আসামী!—ইনিই ইসাবেলের মামা! কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না—কেবল মনের ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিল। আর্ণল্ড্ জ্যাকসন কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

"কেমন, আমার নাম তো ভালরকমই জানা আছে!"

বেটম্যান হাঁ বলিবে কি না বলিবে স্থির করিতে পারিতেছে না; সবচেয়ে বিভ্রমে পড়িয়াছে এই জন্য যে, তাহার এই অবস্থায় অপর দুইজন যেন মজা দেখিতেছে। ঐ দ্বীপটায় আসিয়া ঠিক যে মানুষটার মুখদর্শন করা তাহার উচিত ছিল না, তাহারই সঙ্গে এমন করিয়া ঘাড়ে ধরিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তো একটা অত্যাচার, তার উপর আবার এই আমোদ! সে বড় আঘাত পাইল। হয়তো এরূপ মনে করিবার কোন হেতু ছিল না, আর একটু দেখা উচিত ছিল। কারণ জ্যাকসন ইহার পরেই বলিলেন,

"শুনেছি, লংষ্টাফ্‌দের সঙ্গে তোমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে—মেরী লংষ্টাফ আমার ভগিনী।"

এবার বেটম্যানের মনে হইল, আর্ণল্ড্ জ্যাকসন্ সম্ভবতঃ ভাবিয়াছে, সে তাহার অত বড় কলঙ্কের কথা কিছুই জানে না। অতঃপর জ্যাকসন্ এডওয়ার্ডের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন,

"না, টেডি, আমি আর ব'সব না, আমার কাজ আছে। তোমরা বরং দু'জনে আজ রাত্রে আমার ওখানেই খাওয়া-দাওয়া কোরো।"

এডওয়ার্ড বলিল, "সে বেশ হ'বে!"

বেটম্যান কিন্তু অবিচলিত কণ্ঠে শুনাইয়া দিল,

"আপনার সৌজন্যে মুগ্ধ হ'লাম, মিঃ জ্যাকসন। কিন্তু আমি এখানে আর ক'ঘণ্টাই বা আছি, কালই আমার জাহাজ ছাড়বে। মাপ করবেন, আমি যেতে পারবো না।"

"আরে, ও কি একটা কথা হ'ল! দেশী খানা খাওয়াবো তোমাকে, আমার স্ত্রীর রান্না চমৎকার। একটু সকাল সকাল এসো—তা'হলে সূর্য্যাস্ত দেখতে পাবে। যদি চাও তো, আমি তোমাদের দু'জনকেই আজ বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়ে দেবো।"

"যাবো বৈ কি আমরা—নিশ্চয় যাবো। যে দিন জাহাজ আসে সেদিন কি রাত্রে হোটেলে ঘুমোবার যো আছে?—যে হৈ চৈ! তার চেয়ে আপনার বাংলোতে বসে' বেশ গল্প শোনা যাবে।"

"আর, আমিও তোমাকে ছেড়ে দিতে পারিনে, মিঃ হাণ্টার।"—সুগভীর হৃদ্যতার কণ্ঠেই জ্যাকসন কথাগুলি বলিলেন,—"শিকাগোর গল্প, মেরীর কথা —সব শুনবো তোমার মুখে।"

বেটম্যান কিছু বলিবার আগেই তিনি শিরঃকম্পন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এডওয়ার্ড হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"টাহিটিতে আমরা কারো কিছুতে 'না'-বলা গ্রাহ্য করিনে। তা ছাড়া, এমন ডিনার তুমি এখানে আর কোথাও খেতে পাবে না।"

"ও যে বললে, ওর স্ত্রীর রান্না খুব ভালো—এর মানে কি? আমি শুনেছি, ওর স্ত্রী এখন জেনেভায় আছেন।"

এডওয়ার্ড বলিল, "স্ত্রীর অত দূরে থাকা কি কোন ভদ্রলোকের পোষায়? আর, দেখা-সাক্ষাৎও নেই বহুদিন। আমার বোধ হয়, এ আর এক স্ত্রী।"

বেটম্যান কিছুক্ষণ আর কথা কহিল না। তাহার মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, এডওয়ার্ড তাহার পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতেছে। দেখিয়া হঠাৎ তাহার বড় রাগ হইল, বলিল,

"আর্ণল্‌ড্‌ জ্যাকসন একটা বেহায়া বদমায়েস!" এডওয়ার্ড হাসিয়া উত্তর দিল,

"আমার মনও তাই বলে।"

"কোন ভদ্রলোক যে ওর সঙ্গে মিশতে পারে, আমি তা' বিশ্বাস করিনে।"

"হয় তো আমিও ভদ্রলোক নই।"

"তুমি কি ওর সঙ্গে বেশি মেলামেশা কর ?"

"তা' একটু বেশিই করি বৈকি। উনি আমার সঙ্গে ভাইপো-সম্পর্ক পাতিয়েছেন।"

বেটমান একটু সামনে ঝুঁকিয়া এডওয়ার্ডের মুখখানা ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল, তারপর বলিল,

"ওই লোকটাকে তোমার ভাল লাগে ?"

"বড্ড।"

"কিন্তু তুমি কি জানো না—এখানকার কেউ কি জানে না যে, ও বেটা একটা জালিয়াত—ও জেল খেটেছে ? ভদ্রসমাজ থেকে ওকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।"

এডওার্ডের চুরুট হইতে একটা ধোঁয়ার লাইন ক্রমে গোল হইয়া উঠিতেছিল, সে তাহার পানে চাহিয়াছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, সন্ধ্যার বাতাসে একটা সুগন্ধ ভাসিতেছে। শেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল,

"আমি স্বীকার করি, লোকটা—যাকে বলে, একটি পাকা বদমায়েস। কিন্তু একথা ভেবেও আমি কিছুমাত্র খুসী হতে পাবিনে যে, দুষ্কর্ম্ম করে' যদি কেউ অনুতপ্ত হয়, তা' হলেই যে ক্ষমার যোগ্য। লোকটা একটা প্রকাণ্ড জুয়াচোর, এবং মহাভণ্ড—একথা মানতেই হবে। আমি কিন্তু এমন সঙ্গসুখ আর কোথাও পাইনি। আমাব যা কিছু শিক্ষা, তা ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি।"

বেটম্যান ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল

"তোমায় কি শিক্ষা দিয়েছে ও, তাই শুনি ?"

"জীবনটাকে কেমন করে' ভোগ করতে হয়।"

"আহা, কি গুরুই পেয়েছ ? ওই গুরুমন্ত্র পেয়েই বুঝি তুমি বড়লোক হ'বার এমন সুযোগ ত্যাগ করে', ঐ রকম একটা দোকানে পাঁচ-সিকের কেনা-বেচায় লেগে গেছ ?—তা'ও চাকর হ'য়ে !"

কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া, মৃদুহাস্যে এডওয়ার্ড বলিল,

"বড় চমৎকার মানুষ, হে ! একটা অদ্ভুত শক্তি আছে ওঁর। আজ রাত্রে ওখানে গেলে তুমিও বুঝতে পারবে।"

"তোমার যদি সেই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি কখ্খনো যাবো না ওর বাড়ীতে ; কিছুতেই নয় !"

"অন্ততঃ আমার খাতিরেও চল, বেটম্যান। আমি তোমার কতকালের বন্ধু,—এমন করে' বলছি, আমার কথাটা রাখবে না ?"

. এডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরে এতখানি দরদ বেটম্যান এর আগে কখনো দেখে নাই—এ যেন একটা নূতন সুর, সে রাজী না হইয়া পারিল না।

"তুমি যদি এমন করে' বল, তবে আমাকে যেতেই হয়।"

এডওয়ার্ড একটু হাসিল। বেটম্যান আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখিল। আর্ণল্ড জ্যাকসনের পরিচয়টা একটু ভালো করিয়া লওয়া দরকার। সে যে এডওয়ার্ডকে বশ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু কোন্ গুণে ? তাহা না জানিলে উহার ঐ শক্তিকে ব্যর্থ করা যাইবে কেমন করিয়া ? এডওয়ার্ডেব সঙ্গে যতই আলাপ করিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল তাহার ভিতরে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাও বুঝিল, এখন তাহাকে খুব সাবধানে চলিতে হইবে, সে যে কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, ইহাদের হাল-চাল আরও ভালো করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। অতঃপর সে অন্য কথা পাড়িল—তাহাদের ব্যবসায়ের কথা, শিকাগো শহরের রাজনৈতিক দলাদলিব কথা, বন্ধুদের কথা, তাহাদের সেই কলেজের দিনগুলার কথা—এইরূপ কত কথা।

শেষে এডওয়ার্ড বলিল, এইবার তাহাকে দোকানে ফিরিতে হইবে। তারপর, বেলা পাঁচটার সময়ে সে আবার আসিয়া তাহাকে জ্যাকসনের বাড়ীতে লইয়া যাইবে।

হোটেল হইতে বাহির হইয়া, বাগানে চলিতে চলিতে বেটম্যান বলিল,

"দেখ, একটা কথা তোমায় বলব ভাবছিলাম—তুমি কেন এই হোটেলেই বাসা নাও না ? শুনলাম, এখানে এই একটিমাত্র ভদ্ররকমের হোটেল আছে।"

এডওয়ার্ড হাসিয়া বলিল, "সে :আমি করব না। আমার পক্ষে এরকম হোটেলে থাকা বেজায় বড়মানুষী। আমি শহরের বাইরেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি—যেমন সস্তা, তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

"যতদূর মনে পড়ে, শিকাগোয় থাকতে তুমি ওই দুটোকেই সবচেয়ে দরকার বলে' মনে করতে না !"

"শিকাগো !"

অমন করে' উঠলে যে? এর মানে আমি বুঝতে পারছিনে, এডওয়ার্ড। শিকাগো হ'চ্ছে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শহর—সে কথা মনে রেখো।"

"তা' জানি।"

বেটম্যান একবার চকিতে তাহাকে দেখিয়া লইল, মুখ দেখিয়া কিছু বোঝা গেল না।

"তুমি শিকাগোয় ফিরছ কবে?"

একটু হাসিয়া এডওয়ার্ড বলিল, "তাই তো ভাবি।" এই জবাব ও তাহার ভঙ্গিতে বেটম্যান থতমত খাইয়া গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে, এমন সময়ে—রাস্তায় একজনকে একটা মোটর হাঁকাইয়া যাইতে দেখিয়া এডওয়ার্ড হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিল।

"আমাকে একটু পৌছে দেবে, চার্‌লি?"

বেটম্যানকে বিদায়সম্ভাষণ করিয়া সে গাড়ী-খানার পিছনে পিছনে খানিকটা ছুটিল, গাড়ীটাও কয়েক হাত দূরে দাঁড়াইয়া গেল। বেটম্যান এখন একা। এতক্ষণ যাহা কিছু দেখিল ও শুনিল—সেই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারগুলাকে এইবার সে মনের মধ্যে একটু গুছাইয়া লইবার অবসর পাইল।

সন্ধ্যার আগে এডওয়ার্ড আসিল, একটা বুড়াঘোড়ায়-টানা, নড়বোড়ে গাড়ীতে দুই বন্ধু চড়িয়া বসিল, রাস্তাটা সমুদ্রের ধার দিয়া গিয়াছে। দুই পাশে সুপারী ও ভানিলার আবাদ; মাঝে মাঝে এক একটা আম গাছ —তাহাতে লাল, হলুদ ও বেগুনী-লাল ফলগুলি সবুজ পত্ররাশির মধ্যে দেখা যাইতেছে। কখনও বা এই সকলের ফাঁক দিয়া স্থল-বেষ্টিত বিশাল হ্রদের মত সমুদ্র-বাহুর চকিত-দর্শন পাওয়া যাইতেছিল। নীল নিস্তরঙ্গ জলরাশি, তাহার মধ্যে এখানে ওখানে নারিকেলকুঞ্জ-শোভিত ছোট ছোট দ্বীপ। আর্নল্‌ড জ্যাকসনের বাড়ীখানি একটি ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, সেখানে উঠিবার জন্য একটি মাত্র পায়ে-চলা পথ আছে; এজন্য তাহারা ঘোড়াটাকে খুলিয়া একটা গাছে বাঁধিয়া, গাড়ীখানাকে রাস্তার উপরে একধারে রাখিয়া দিল। বেটম্যানের চক্ষে এই ধরণের ব্যবস্থা—নিতান্তই কোনরকমে কাজচালানো রকমের। উপরে উঠিয়া বাড়ীতে যখন পৌছিল, তখন একটি বেশ সুশ্রী, দীর্ঘাকার ঐ-দেশীয়া রমণী তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল,—এডওয়ার্ড সাদরে তাহার হাতখানি হাতে লইয়া নাড়া দিয়া দিল।

বেটম্যানের পরিচয় দিল—"ইনি আমার বন্ধু, মিঃ হান্টার। আজ তোমার বাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে, লাভিনা।"

শুনিবামাত্র সে হাসিয়া বলিল—"বেশ, বেশ! আর্নলড এখনো বাড়ী আসেন নি।"

"আমরা তবে এখন নেমে গিয়ে হ্রদের জলে স্নান করিগে। দু'খানা 'পারেও' দাও দেখি।"

স্ত্রীলোকটি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

বেটম্যান জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

"ওঃ, ঠিক বটে; ওঁর নাম লাভিনা, উনি হচ্ছেন আর্নল্ডের স্ত্রী।"

বেটম্যান কেবল ঠোঁট দুইটা চাপিল, কিছু বলিল না। একটু পরেই, স্ত্রীলোকটি একটি পুঁটুলি আনিয়া এডওয়ার্ডের হাতে দিল। ইহার পর, যুবক দুইটি কোনরকমে সেই উঁচু পাড় বাহিয়া নামিয়া গেল, এবং সমুদ্র-তীরবর্ত্তী একটা নারিকেল-বাগানে প্রবেশ করিল। সেখানে তাহারা পোষাক খুলিয়া ফেলিল। এডওয়ার্ড তাহার বন্ধুকে দেখাইয়া দিল কেমন করিয়া পারেও'* নামক সেই বস্ত্রখণ্ডটিকে মাল-কোঁচা করিয়া পরিলে সুন্দর স্নানের পোষাক হয়। একটু পরেই তাহারা সেই অগভীর সুখোষ্ণ জলে ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করিয়া দিল। এডওয়ার্ডের ফুর্ত্তি যেন ধরে না। সে হাসিয়া, চেঁচাইয়া, গান গাহিয়া অস্থির করিয়া তুলিল—যেন পনেরো বছরের বালক। বেটম্যান তাহার এত আনন্দ কখনও দেখে নাই; পরে তীরেব বালুভূমির উপরে শুইয়া তাহারা যখন সেই নির্ম্মল বায়ুমণ্ডলে সিগারেট-ধূম ছাড়িতে লাগিল, তখন এডওয়ার্ডের ভাবে-ভঙ্গিতে এমন একটা অদম্য চিত্ত-চাপল্য প্রকাশ পাইতেছিল যে, বেটম্যান রীতিমত অবাক হইয়া গেল। বন্ধুকে বলিল—

"তোমার যে বড় ফুর্ত্তি দেখছি! জীবনে এ ছাড়া আর কিছু আছে ব'লে তোমার মনে হয় না!"

"তাই বটে।"

একটা মৃদু শব্দ শোনা গেল, ফিরিয়া চাহিতেই চোখে পড়িল, আর্ণলড জ্যাকসন সেইদিকে আসিতেছেন।

"ভাবলাম যাই—ছোকরাদের আমিই ডেকে নিয়ে আসি। কেমন, স্নানটা বেশ ভাল লেগেছে তো?

* আমাদের ধুতির মত।

বেটম্যান বলিল, "খুব ভালো।"

আর্ণলড জ্যাকসনের পরনে আর সেই সুসভ্য ও সুদৃশ্য হাফ-পাজামা নাই, কোমরে একখানা 'পারেও' বাঁধিয়া, খালি পায়ে আসিয়াছেন। তাঁহার গায়ের রঙ রৌদ্রতাপে বেশ একটু কালো হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ ও কুঞ্চিত শুক্লকেশ, আর মুখের সেই তপঃশীর্ণ কৃশ-ভাবটার সহিত ঐরূপ পরিচ্ছদ কেমন একটু বেমানান দেখাইতেছিল, কিন্তু তাঁহার আচরণে একটুও ভারিক্কি-ভাব ছিল না।

জ্যাকসন বলিলেন, "তোমাদের যদি সব সারা হ'য়ে থাকে, তবে চল, উপরে ওঠা যাক।"

বেটম্যান বলিল, "আমি পোষাকটা পরে' নিই।"

"সে কি? টেডি, তোমার বন্ধুর জন্য একটা 'পারেও' নিয়ে আসনি?

এডওয়ার্ড একটু হাসিয়া বলিল, "ও পোষাক-পরাটাই পছন্দ করবে মনে করেছিলাম।"

বেটম্যান একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, "সে তো নিশ্চয়ই।" চাহিয়া দেখিল, তাহার সার্ট গায়ে দিবার পূর্ব্বেই এডওয়ার্ড 'পারেও' খানা কোমরে জড়াইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সে এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করিল, "খালি পায়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? পথটা যেন একটু বেশী পাথুরে ব'লে মনে হ'ল।"

"ও, সে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।"

জ্যাকসন বলিলেন, "শহর থেকে ফিরে সব ছেড়ে-ছুড়ে একখানা 'পারেও' পরলে ভারি আরাম বোধ হয়। তুমি যদি এখানে কিছুদিন থাকো, তবে আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ওটা পরতে অভ্যেস কর। এমন বুদ্ধিমানের মত পরিধেয় আমি আর কোথাও দেখিনি। যেমন আরাম, তেমনই কোন হাঙ্গাম নেই, খরচও কম।"

সকলে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল। জ্যাকসন তাহাদিগকে একটা বড় ঘরে লইয়া গেলেন; ঘরখানির দেওয়ালগুলা শুধুই চুনকাম করা; ছাদের কড়ি-বরগা দেখা যাইতেছে; মধ্যস্থলে আহারের জন্য সজ্জিত একখানা টেবিল। বেটম্যান লক্ষ্য করিল, তাহাতে পাঁচজনের জন্য পাত্র সাজানো হইয়াছে।

জ্যাকসন ডাকিলেন, "ইভা, এদিকে এসো, টেডির বন্ধু তোমাকে দেখবেন। আর, আমাদের সবাইকে এক-একটা ককটেল মিশিয়ে দাও দেখি।

অতঃপর তিনি বেটম্যানকে লইয়া একটা নীচু ও দীর্ঘ জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিলেন—

“ঐ দেখ—ভালো ক’রে চেয়ে দেখ!”

নিম্নে অতি নিকটে, উঁচু পাহাড়ের গা বাহিয়া দীর্ঘ নারিকেলশ্রেণী যেন হুড়ামুড়ি করিতে করিতে, একেবারে সেই সাগর-দীর্ঘিকার তীর-প্রান্ত পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। সেই সন্ধ্যালোকে বিশাল হ্রদের মসৃণ জলতল কপোত-গ্রীবার মত বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে—তেমনই কর্ব্বুরিত, বর্ণগুলি তেমনই কোমল। অল্পদূরে একটি খাঁড়ির উপর কতকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট কুটীর দেখা যাইতেছে—উহাই এ দেশের পল্লী। আর একদিকে, জলমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ডিঙি রহিয়াছে, তাহাতে বসিয়া দুইজন লোক মাছ ধরিতেছে, পিছনকার দীপ্ত আকাশ-পটে মূর্ত্তি দুইটা আগাগোড়া কালিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আরও দূরে, হ্রদের বাহিরে, প্রশান্তমহাসাগরের অসীম জলবিস্তার নিস্পন্দ হইয়া আছে; এবং তাহারই উপর দিয়া কুড়ি মাইল দূরে—কবিকল্পনারও অনধিগম্য যে স্বপ্নাতীত সৌন্দর্য্যের মায়াদৃশ্য দেখা যাইতেছে, তাহার নাম—মুরিয়া দ্বীপ। সে শোভা এমনই যে, বেটম্যান তাহার দিকে চাহিয়া নিজেকে ছোট মনে করিল, অবশেষে বলিয়া উঠিল—

“এমনটি আর কোথাও দেখিনি!”

আর্ণলড জ্যাকসন একদৃষ্টে সমুখের পানে চাহিয়া আছেন—তাঁহার চোখে স্বপ্নের ঘোর।

সেই কৃশ ভাব-ব্যঞ্জক মুখ অতিশয় গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পানে একবারটি চাহিতেই, বেটম্যান পুনরায় অনুভব করিল—সে মুখ ধ্যানীর মুখ—যোগীর মুখ।

জ্যাকসন মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—“সৌন্দর্য্য! হাঁ, সৌন্দর্য্যই বটে; কিন্তু সৌন্দর্য্যকে এমন মুখামুখী দেখার সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে। খুব ভালো ক’রে দেখে নাও, মিঃ হাণ্টার। এই যা দেখলে, আর কখনো দেখতে পাবে না। এ মুহূর্ত্ত এখনই চলে যাবে। কেবল এর স্মৃতিটা মনের মধ্যে অবিনশ্বর হ’য়ে থাকবে। এই একটি মুহূর্ত্তের জন্য আমরা অনন্তকে একটু-খানি ছুঁয়ে নিলাম।”

তাঁহার কণ্ঠ যেমন গাঢ়, তেমনই সুরময়। অতি উচ্চ ভাবের আবেগে তিনি যেন বুঁদ হইয়া গিয়াছেন। বেটম্যানকে জোর করিয়া স্মরণ করিতে হইল, এই লোকটা একজন দাগী আসামী, হৃদয়হীন তঞ্চক। কিন্তু এডওয়ার্ড তখনই কি একটা শব্দ শুনিয়া সহসা পিছন ফিরিয়া চাহিল।

"এটি আমার কন্যা, মিঃ হাণ্টার।"

বেটম্যান মেয়েটির করমর্দ্দন করিল। অপরূপ দুইটি চোখ—যেমন কালো তেমনই ডাগোর। টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুইখানি যেন সর্ব্বদা মৃদু-হাসির ভরে কাঁপিতেছে। রঙ একেবারে শাদা নয়, একটু তামাটে। ঘন-কুঞ্চিত দীর্ঘকেশ দুই কাঁধ বাহিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নামিয়া গিয়াছে। পরনে গোলাপী রঙের, প্রচুর-প্রসর একখানি মাত্র বসন; পা দু'খানি নগ্ন, মাথায়একগাছি সুগন্ধি শাদাফুলের মালা। রূপসী বটে,—যেন পলিনেসিয়া-দেশ-বিহারিণী মূর্ত্তিমতী বসন্তলক্ষ্মী!

মেয়েটি একটু লাজুক, কিন্তু বেটম্যানের লজ্জা তাহার চেয়ে বেশি। সব মিলিয়া যেমনটি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সে বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছিল। আবার যখন দেখিল, এই বনদেবীর মত মেয়েটিই ককটেল মিশাইবার পাত্রটি লইয়া অতি নিপুণ হস্তে তিন জনের ককটেল প্রস্তুত করিতেছে, তখন সে আরও বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

জ্যাকসন বলিয়া উঠিলেন, "দেখিস বাছা, যেন খেলে মাথার ভিতরে বেশ একটু জানান্ দেয়।"

গেলাস তিনটি ভর্ত্তি করিয়া সে হাসি-হাসি মুখে প্রত্যেকের হাতে এক একটা তুলিয়া দিল। বেট্ম্যানের একটা গর্ব্ব ছিল যে, সে খুব ভালো কক্‌টেল মিশাইতে পারে, তাই জিনিসটা আস্বাদন করিয়া যখন দেখিল চমৎকার হইয়াছে, তখন বড়ই বিস্ময় বোধ করিল। অতিথির মুখে ঐ অতর্কিত প্রশংসার ভাব লক্ষ্য করিয়া জ্যাকসন গর্ব্বভরে হাসিয়া উঠিলেন।

"কেমন? খারাপ নয় তো? আমি নিজে ওকে শিখিয়েছি। যখন শিকাগোর ছিলাম, আমার ধারণা ছিল, শহরের কোন পানশালায় এমন একটা খানসামা নেই, যে ও বিষয়ে আমার কাছেও ঘেঁসতে পারে। যখন জেলে ছিলাম, আর কিছু করবার উপায় ছিল না, তখন আমি বসে' বসে' নতুন নতুন কক্‌টেল মনে মনে উদ্ভাবন করতাম। কিন্তু যাই বল, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নির্জ্জলা 'মার্টিনি'র কাছে ওসব কিছুই লাগে না।"

কথাগুলা শুনিয়া বেটম্যানের মনে হইল, যেন তাহার দেহের অত্যন্ত নরম হাড়খানাতে একটা বড় আঘাত লাগিয়াছে। নিজেই বুঝিতে পারিল, তাহার মুখটা প্রথমে লাল পরে ফ্যাকাসে হইয়া গেছে। কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একটা দেশী চাকর বড় বাটিতে সুপ আনিয়া দিল। তখন সব কয়জনে আহার আরম্ভ করিল। আর্ণল্ড জ্যাকসন প্রসঙ্গক্রমে যাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, তাহাতেই তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার কারা-জীবনের কথাই আরম্ভ করিলেন; বেশ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দভাবে, যেন কাহারও উপরে কোন আক্রোশ নাই—যেন জেলখানা নয়—কোন বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করার কথা। তিনি বেটম্যানকেই শুনাইতেছিলেন। প্রথমে সে ইহার অর্থ বুঝিতে পারে নাই, শেষে রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেল। দেখিল, এডওয়ার্ড একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে, তাহার চোখের কোণে যেন একটু কৌতুকের আভাস রহিয়াছে। জ্যাকসন তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছেন মনে হইতেই তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তারপর অবস্থাটা বড় অস্বাভাবিক বোধ হইল—হইবারই কথা—সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাগ হইল। আর্ণল্ড জ্যাকসনের আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!—তা ছাড়া আর কি? আর এই যে তাহার নির্ব্বিকার ভাব—সত্যই হোক আর ভানই হোক—তাহাও অসহ্য। আহার চলিতে লাগিল। নানাপ্রকার ব্যঞ্জন তাহাকে খাইয়া দেখিতে অনুরোধ করা হইতেছিল—কাঁচা মাছ, আরও কত কি, তাহাদের নামও সে জানে না; সে ভদ্রতার অনুরোধে বাধ্য হইয়া মুখে দিতেছিল—দিয়াই দেখে খাইতে বড় সুস্বাদু, বড় আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটিল যাহা সেদিনের আর সকল দুর্ভোগের তুলনায় বেটম্যানের পক্ষে সবচেয়ে বিরক্তিকর। টেবিলের উপর তাহার সামনে একগাছি ফুলের মালা ছিল; কিছু বলিতে হইবে বলিয়া সে সেই মালাখানির সম্বন্ধে একটা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করিয়া ফেলিল।

জ্যাকসন বলিলেন, "মালাখানি ইভা তোমার জন্যে গেঁথেছে,—লজ্জায় পরিয়ে দিতে পারছে না"

বেটম্যান মালাগাছটি তুলিয়া লইয়া মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিবার ছলে, বেশ একটি ছোট্ট বক্তৃতা করিল।

তখন ইভা সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা আপনাকে পরতে হবে।"

"আমি? না না, সে কি হয়?"

জ্যাকসন বলিলেন, "এটা এদেশের একটি চমৎকার প্রথা।"

জ্যাকসনের সামনেও তেমনই একগাছি ছিল, তিনি তাহা তুলিয়া মাথায় পরিলেন; এডওয়ার্ডও তাহাই করিল।

বেটম্যান একটু বিপন্ন ভাবে বলিল, "আমার পোষাকে ওটা মানাবে না।"

ইভা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "একখানা 'পারেও' এনে দেবো আপনাকে? এখ্‌খুনি এনে দিচ্ছি।"

"না, ধন্যবাদ, আমি বেশ আছি—আর কিছুতে কাজ নেই।"

এডওয়ার্ড বলিল "কেমন করে' পরতে হয় ওকে দেখিয়ে দাও তো, ইভা।"

ঐ সময়ে, বেটম্যান তাহার প্রাণের বন্ধুর উপরেও ভয়ানক চটিয়া উঠিল। ইভা টেবিল হইতে উঠিয়া খুব হাসিতে হাসিতে কালো চুলের উপর মালাটি বসাইয়া দিল।

জ্যাকসন-রমণী বলিল, "বেশ মানিয়েছে আপনাকে!—নয়, আর্ণল্ড?"

"নিশ্চয়"।

বেটম্যানের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ছুটিতে লাগিল।

ইভা বলিল, "আহা, যদি অন্ধকার হয়ে না উঠত তা'হলে আপনাদের তিনজনকে নিয়ে ফোটো তুলতাম।"

বেটম্যানের ভাগ্য ভালো যে অন্ধকার হইয়া আসিযাছে। তাহার মতে, নীল সার্জ্জের সুট, উঁচু কলার—এমন পরিপাটী ও সুসভ্য—ইহার উপরে মাথায় ঐ ফুলের মালা—আরে ছিঃ, সে যে নিতান্তই হাস্যকর! রাগে সে গরগর করিতেছিল; বাহিরে সৌজন্য রক্ষা করিতে তাহার প্রাণান্ত হইতেছিল। টেবিলের শিরোভাগে ঐ যে অর্দ্ধ-উলঙ্গ বুড়া বসিযা আছে,—মুখখানা অতিশয় নিরীহ সাধুপুরুষের মত, আর মাথার সুন্দর শুভ্রকেশে ফুলের মালা—উহাকে দেখিয়া সে ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্তপ্রায় হইযা উঠিল। ব্যাপারটা আগাগোড়াই অভাব্য এবং কুৎসিত।

আহার শেষ হইল; ইভা ও তাহার মা সব পরিষ্কার করিবার জন্য ঘরেই রহিয়া গেল, পুরুষ তিনজন বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিল। স্নিগ্ধ রাত্রি, বাতাসে রজনীগন্ধার গন্ধ। নির্ম্মেঘ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ,—ক্রমে যতই উর্দ্ধে উঠিতেছে ততই নিম্নে সেই নিস্তরঙ্গ বারিরাশির উপরে একটা উজ্জ্বল আলোরেখা টানিয়া দিতেছে; সে যেন একটা পথ, অকূল-অচিহ্নিতে মিশিয়া হারাইয়া গিয়াছে। আর্ণল্ড জ্যাকসন গল্প করিতে লাগিলেন, তাঁহার

কণ্ঠস্বর যেমন ভরাট তেমনই মিষ্ট। তিনি ঐ দ্বীপের আদিবাসীদের কথা, সাগর-পর্য্যটক য়ুরোপীয় নৌজীবীদের কথা, কত রোমাঞ্চকর কাহিনী বলিয়া গেলেন। বেটম্যানের এসব ভাল লাগিতেছিল না। প্রথম প্রথম অতিশয় অপ্রসন্ন মুখে শুনিতেছিল, কিন্তু শীঘ্রই কথাগুলার কেমন একটা মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বুদ্ধির দিবালোক যেন কাব্যের রঙীন কুয়াশায় ঝাপসা হইয়া গেল। সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, আর্ণল্ড জ্যাকসন তাহার ঐ কথায় ও কণ্ঠস্বরে সকলকে মুগ্ধ করিতে পারিত, ঐ একটি যাদুশক্তির বলেই সে বহুলোকের রাশি রাশি অর্থ বাহির করিয়া আনিয়াছিল, এবং উহার দ্বারাই এতবড় অপরাধের শাস্তি হইতেও, আর একটু হইলে মুক্তিলাভ করিত। না, এমন বাক্‌পটুতা দুর্লভ; আবার ঠিক কতদূর উঠিয়া কোথায় থামিতে হয়, সে জ্ঞানও তাহার মত আর কাহারও নাই।

"আচ্ছা, আমি তা'হলে এখন উঠি; তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ কর—অনেকদিন পরে দেখা, কত কি বলবার আছে। ঘুম পেলে টেডি তোমাকে তোমার ঘর দেখিয়ে দেবে।"

বেটম্যান বলিয়া উঠিল, "তার দরকার নেই, এখানে রাত কাটাবো ব'লে তো আসিনি।"

"এখানে আরো আরাম পাবে। কোনো ভাবনা নেই, তোমাকে ঠিক সময়ে উঠিয়ে দেবে।" এই বলিয়া সাদরে করমর্দ্দন করিয়া ও বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার গমন-ভঙ্গিতে একটি সুমহৎ আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিল।

"তুমি যদি শহরে ফিরে যেতে চাও, তা'হলে আমি অবশ্যই তোমাকে গাড়ি ক'রে দিয়ে আসব। কিন্তু আমার কথা যদি শোন—রাতটা এইখানেই থাকো।"

কয়েক মিনিট কেহই আর কথা বলিল না। বেটম্যান ভাবিতেছিল, কেমন করিয়া আসল কথাটা এইবার পাড়িবে—সারাদিন সে যাহা দেখিল, তাহাতে আর চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—

"তুমি শিকাগোয় ফিরছ কবে?"

এক মুহূর্ত্তকাল এডওয়ার্ড ইহার জবাব দিল না। পরে বন্ধুর পানে একবার আলস্য-ভরে ফিরিয়া চাহিয়া একটু হাসিল।

"ঠিক জানিনে। বোধ হয় আর ফিরবই না।"

বেটম্যান প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিল, "তার মানে?"

"আমি এখানে সুখে আছি। কি দরকার আর কোথাও গিয়ে? সেটা কি বুদ্ধিসঙ্গত হবে?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এইখানেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবে? এ তো জীবন্মৃত হয়ে থাকা! দোহাই এডওয়ার্ড! তুমি এখনি চলে' এসো—এর পরে আর পারবে না। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম যে, একটা কিছু হয়েছে। এই জায়গাটার প্রতি তোমার কেমন একটা মোহ হয়েছে, তোমাকে যাদু করেছে। কেবল একটু জোর করে' ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে; একবার এর থেকে মুক্তি পেলেই তখন বুঝতে পারবে, কি বাঁচাই বেঁচে গিয়েছ! এ যেন একটা বিষের নেশা—একবার অভ্যাস হলে আর ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু কোনক্রমে ছাড়তে পারলে কি আনন্দ! তোমারও তাই হবে। তখন বুঝতে পারবে, দুইটা বছর ধরে' তুমি কি বিষাক্ত হাওয়ায় বাস করেছ! এর পর যখন নিজের দেশের সেই বিশুদ্ধ বাতাস বুক ভরে নিতে থাকবে, তখন ভাবো দেখি, সে কি আরাম!"

কথাগুলি সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল—আবেগের উচ্ছ্বাসে যেন একটার পিছনে আর একটা হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল; তাহার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক স্নেহ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল।

"তুমি যে আমাকে বড় ভালবাসো, ভাই!—আমার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদবেই তো।"

"কালই আমার সঙ্গে চল, এডওয়ার্ড। এখানে তোমার আসাই একটা বড় ভুল হয়েছে। এখানে তুমি বাঁচবে কি করে?"

"তুমি তো কত রকম বাঁচার কথা বলছ? আচ্ছা, কিরকম বাঁচা বাঁচলে জীবনটা সার্থক হয় তোমার মতে?

"কেন? ওর তো একটা ছাড়া দুটো উত্তর নেই। নিজের কর্ত্তব্য-পালন, কঠিন কর্ম্মনিষ্ঠা, এবং নিজের অবস্থা ও সামাজিক পদমর্য্যাদা বজায় রেখে চলা।"

"তার পুরস্কার?"

"পুরস্কার এই যে, যা সংকল্প করেছিলাম, তা' সাধন করতে পেরেছি; মনের এই সন্তোষ।"

"আমার কানে এসব কথা বড্ড বড় ঠেকছে।"

এই উত্তর দিবার সময়ে এডওয়ার্ডের মুখে যেন একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল,—রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারে তাহা বেট্‌ম্যানের দৃষ্টি এড়াইল না।

"তোমার মনে কি হচ্ছে তা' আমি বুঝতে পারছি—তুমি ভাবছ আমার ঘোরতর অধঃপতন হয়েছে। সত্যি বলতে কি, এমন কয়েকটা কথা আমি এখন বিশ্বাস করি, যা' ভাবতেও তিন বছর আগে শিউরে উঠতাম!"

বেট্‌ম্যান বেশ একটু ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আর্ণলড জ্যাকসনের কাছে শিখেছ বুঝি?"

"তুমি ওঁকে দেখতে পারো না দেখতে না পারবারই কথা। আমিও যখন প্রথম এখানে আসি তখন আমারও ঐ রকম মনে হ'ত। ঠিক তোমার মতই ওঁর সম্বন্ধে কু-ধারণা ছিল। লোকটা বড়ই অদ্ভুত। তুমি নিজেই দেখেছ, তিনি যে জেল খেটেছেন, সে কথা গোপন করবার কোন চেষ্টাই নেই। আমার ত' মনে হয় না, জেলখাটার জন্য তাঁর কোন দুঃখ আছে; কিম্বা যার জন্যে ঐ শাস্তি ভোগ করেছেন, সেই কুকর্ম্মের জন্যও উনি অনুতাপ করেন। যে একটি মাত্র অভিযোগ তিনি আমার কাছে করেছিলেন, তা এই যে, ঐ ব্যাপারেব পর তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, অনুশোচনা বলে' কোন বস্তুই ওঁর প্রাণে নেই। সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞানবিরহিত বললেই হয়। জীবনের কোন-কিছুকেই উনি কুচক্ষে দেখেন না, নিজেকেও নয়। ওঁর মন উদার, হৃদয় মমতাপূর্ণ।"

"হাঁ, তা'তে সন্দেহ কি? পরের টাকা সম্বন্ধে ওঁর উদারতা অসামান্য।"

"আমি একজন সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি। আমার কাছে ওঁর যা পরিচয় তাই কি যথেষ্ট নয়? আমি চোখে যা দেখেছি, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা কি অন্যায়?"

"তাব মানে হচ্ছে এই যে, ভালো আর মন্দর মধ্যে যে তফাৎ সেটা তুমি ভুলে গেছ।"

"না, তা নয়; সেই বোধটা আমার মনে আগেও যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনই সুস্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু যে আর একটা বিষয়ে আমার মনে একটু গোল বেধেছে সে হচ্ছে—ভাল লোক আর মন্দ লোক স্থির করব কি দিয়ে? আর্ণলড জ্যাকসন কি একজন মন্দলোক যার কাজগুলো ভালো? না, একজন ভালো লোক যার কাজগুলো মন্দ? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ

নয়। হয়তো আমাদেরই দোষ—আমরা মানুষে-মানুষে ভেদটা বড় বেশি করে' করি। হয়তো, আমাদের মধ্যে যারা অতিশয় সাধু ও সজ্জন তারাই প্রকৃত দুর্জ্জন, আবার যারা অতিশয় অসজ্জন তারাই সাধুশ্রেষ্ঠ। কে বলতে পারে?"

বেট্‌ম্যান বলিল, "একথা আমাকে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারবে না যে, সাদাই কালো, আর কালোই সাদা।"

"না, তা' নিশ্চয় পারবো না।"

এডওয়ার্ড তার কথায় সায় দেওয়া সত্ত্বেও কেন যে একটু হাসিল, বেট্‌ম্যান তাহা বুঝিতে পারিল না। প্রায় একমিনিট কাল এডওয়ার্ড চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল,

"আজ সকালে তোমাকে যখন দেখলাম তখন আমার মনে হ'ল, আমি যেন তিন বছর আগেকার সেই আমিটাকে দেখছি। সেই কলার, সেই জুতো, সেই ব্লু-রঙের স্যুট, সেই কর্ম্মব্যস্ততা, আর সেই সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। সত্য করে' বলছি, আমিও কম উৎসাহী ছিলাম না। এ জায়গার এই ঘুমন্তভাব আমার অসহ্য বোধ হ'ত। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতাম প্রায় সবদিকেই সকল ব্যাপারে কত উন্নতি করা যেতে পারে, কত বড় বড় ব্যবসায়ের সুযোগ রয়েছে। কত টাকাই না করা যায়! নারকেল-গুলোর কেবল খোলা ছাড়িয়ে আমেরিকায় পাঠানো, আর সেখানে তার থেকে তেল বের করে নেওয়া—এ তো একটা বুদ্ধিহীনতা। এইদেশেই গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ওর যা' কিছু কাজ করে' নিলে, খরচা কত কম পড়ে! —এখানকার মানুষকে ঢের সস্তায় খাটানো যায়। তা ছাড়া, ব'য়ে নিয়ে যাবার জাহাজ-খরচাও কম নয়। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল দিকে দিকে অসংখ্য বিরাট ফ্যাক্টরী—ওই নারকেল-তেলের কারখানা। তারপর, নারকেলের খোলা থেকে শাঁসটা যেমন করে' খুলে নেওয়া হয়—সে পদ্ধতিটাও ভালো নয়। আমি একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলাম, তার দ্বারা ঘণ্টায় দু'শো-চল্লিশটা নারকেল কেটে তার মালা থেকে শাঁস বের করে' নেওয়া যেতে পারবে। এখানকার জাহাজ-ঘাট বড় ছোট, সেটাও বড় করতে হবে। ধনী ব্যবসায়ীদের সংঘবদ্ধ করে' সেই সঙ্ঘের নামে জমি কিনে তিন-চারটে বড় হোটেল, এবং অনেকগুলো বাংলো-বাড়ী তৈরী করতে হবে—যারা এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে চাইবে তাদের সুখ-সুবিধার জন্যে। তা' ছাড়া, এখানে যাতে বেশি ষ্টীমার আসা-যাওয়া করে, কালিফর্ণিয়া থেকে আরও

বেশি লোক এখানে বেড়াতে আসে, তারও একটা প্ল্যান আমি করেছিলাম। বিশ বৎসরের মধ্যে, এই অতিশয় নির্জ্জীব, নিষ্কর্ম্মা, একটা ক্ষুদ্র আধা-ফরাসী শহর রীতিমত আমেরিকান শহরে পরিণত হবে—দশ-তালা বাড়ী, রাস্তায় রাস্তায় মোটরকার, থিয়েটার, অপেরা-ঘর, শেয়ার-মার্কেট এবং মেয়র—এ সবই হবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম।"

"বলে' যাও, এডওয়ার্ড, বলে' যাও!"—বেট্‌ম্যান আনন্দের আবেগে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। "তোমার এসব বিষয়ে মাথা আছে—এসব গড়ে' তোলবার যোগ্যতাও আছে। আরে, তুমিই অষ্ট্রেলিয়া থেকে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলটার মধ্যে সবচেয়ে বড় টাকার মালিক হবে!"

এডওয়ার্ড মনে মনে হাসিতে লাগিল। বলিল, "কিন্তু আমি তা' হ'তে চাইনে।"

"তুমি বলতে চাও, টাকায় তোমার দরকার নেই? যেমন-তেমন টাকা নয়—কোটী-কোটী টাকা! জানো তুমি টাকার মালিক হ'লে কত কি করতে পারো? জানো, টাকার শক্তি কত? আর যদি নিজের জন্যে না চাও, তা' হলেও—ঐ টাকার বলে তুমি মানুষের কর্ম্মশক্তিকে কতদিকে, কত পথে সার্থক হবার উপায় ক'রে দিতে পারো! হাজার হাজার মানুষের খেটে-খাবার সুযোগ হবে। তোমার ঐ সব কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে গেছে হে!"

এডওয়ার্ড উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "বসে' পড় ভাই, ব'সে পড় তা' হ'লে। আমার ঐ নারিকেল-কাটা কল কখনো সচল হবেনা; আর আমা হতে এখানকার রাস্তায় ট্রাম-বাসও চলবে না।"

বেটম্যান হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

"ঐ ভাব আমার মনে একটু একটু ক'রে জেগেছে। আগে পড়াশুনা করতাম, কেবল লোকের সঙ্গে ভাল করে' কথাবার্ত্তা কইতে পারবো বলে'! এখানে এসে আমি নিজেরই আনন্দের জন্য লেখাপড়া করতে শিখেছি। কেমন ক'রে মানুষের সঙ্গে ব'সে আলাপ করতে হয় সে শিক্ষাও এখানে এসে হয়েছে। আলাপ করতে পারার মত আনন্দ মানুষের জীবনে খুব কমই আছে—তা' জানো কি? কিন্তু তার জন্য সময় চাই, অবকাশ চাই। আগে আমি কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। ক্রমে আমার বোধ হতে লাগল। যে-ধরণের জীবনকে এত মূল্যবান মনে হয়েছিল, তার আগাগোড়াই যেন

বড় তুচ্ছ, বড় ছোট প্রবৃত্তি তার। এই যে এত ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি—দিনরাত এই কর্ম্মের উন্মাদনা—এর প্রয়োজন কি? এখন আমার শিকাগোকে মনে হ'লে কেবল একটা জ্যোতি-হীন নিরানন্দ শহর চোখের উপর জেগে ওঠে—তার সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মত কঠিন; সে যেন একটা গারদখানা—তার ভিতরে অনবরত একটা ভীষণ কোলাহল লেগে আছে। এই যে কেবল কাজ আর কাজ—কাজ ছাড়া আর কিছু নয়, শেষ পর্য্যন্ত এর ফল কি দাঁড়ায়? ওর দ্বারা জীবনটাকে কি যথার্থ ভোগ করা যায়? ওরি জন্যেই কি আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি? একটা কোন আপিসে ছুটতেই হবে; সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মেহনত কর, তারপর ছুটতে ছুটতে আবার বাড়ী আসা, এসে খানা খাওয়া, তারপর একটা থিয়েটারে গিয়ে একটু ফুর্ত্তি করা। এমনি করে' যৌবনটা কাটাতে হবে? মানুষের যৌবন বেশীদিন থাকে না, বেটম্যান। তারপর যখন বুড়ো হব, তখন আরও কি আশা করব? তখনও সেই আপিস, সেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজের চাপ, সেই বাড়ী ফিরে আসা, সেই থিয়েটার! এতেই সুখ!—অবিশ্যি যদি ওদিকে টাকার পর্ব্বত করে' তুলতে পারো। হ'বে বা! কিন্তু সেটা নির্ভর করে মানুষের স্বভাবের উপর। কিন্তু ঐ টাকা করতে যদি না পারো, তাহলে ঐরকম জীবন-যাপন করায় কোন লাভ আছে? আমি ঐ টাকার চেয়ে আমার জীবনে আরও বড় কিছু উপার্জ্জন করতে চাই, বুঝলে, বেটম্যান?"

"সে জিনিষটা কি?"

"শুনে তুমি নিশ্চয় হাসবে। আমি এই তিনটিকে চাই—যা' সত্য; যা' সুন্দর; আর চাই মনুষ্যত্ব।"

"শিকাগোতে কি ও তিনটে জিনিষ পাওয়া যায় না?"

"কেউ কেউ হয়তো পেতে পারে, কিন্তু আমি নয়"—এই বলিয়া এডওয়ার্ড উঠিয়া দাঁড়াইল; উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "সত্যি বলছি, আগের দিনগুলো মনে করলে আমার আতঙ্ক হয়। কত বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি ভাবলেও গা কাঁপে। আমার যে একটা আত্মা আছে তা' এখানে এসে জানতে পেরেছি। যদি বড়লোক হয়েই জীবন কাটাতে হ'ত, তা' হলে ওটাকে চিরদিনের মত হারাতাম।"

বেটম্যান রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"ও কথা তুমি বলো কেমন করে'! আমরা তো এসব নিয়ে নিত্যি কত আলোচনা করেছি।"

"হাঁ তা জানি। বোবা আর কালা যারা তাদের সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা যেমন, সেও তেমনি। আমি আর কখনো শিকাগোয় যাবো না, বেটম্যান।"

"তা'হলে ইসাবেলের কি হবে?"

এডওয়ার্ড বারান্দার প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল—মাথাটা একটু বাড়াইয়া রাত্রির সেই অপরূপ নীল লাবণ্যের পানে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। যখন বেটম্যানের নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ইসাবেল এত বেশী ভালো, যে আমি তার অযোগ্য। তাকে আমি যেমন শ্রদ্ধা করি তেমন আর কোন মেয়েকে করিনা। সে আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী যেমন সুন্দরী, তেমনই সাধ্বী। তার মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আর তার অধ্যবসায় এ দুয়েরই আমি প্রশংসা করি। জীবনে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

"সে কিন্তু তা মনে করেনা।"

"কিন্তু, আমার এই কথা তুমি তাকে বোলো, বেটম্যান।"

বেটম্যান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "আমি? ও কাজ আর যেই করুক আমাকে দিয়ে হবে না।"

অত্যুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পিঠ দিয়া এডওয়ার্ড দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মুখ দেখা যাইতেছিল না,—সে কি ঐ কথা শুনিয়া হাসিল?

"তার কাছে কিছুই গোপন করবার চেষ্টা কোরো না, বেটম্যান। তার যে রকম প্রখর বুদ্ধি—পাঁচ মিনিটেই সে তোমাকে উল্টে ধরে' নাড়া দিয়ে সব বের করে নেবে। তার চেয়ে তুমি আগে থাকতেই সব কথা খুলে বোলো।"

বেটম্যান একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "তোমার মনের ভাবটা বুঝিতে পারছিনে। তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হ'য়েছে, সে কথা অবিশ্যি বলবো; আর যে কি বলব তা ভেবেই পাচ্ছিনে।"

"বোলো, আমার গতিক ভালো নয়; বোলো আমি যে শুধু গরীব তা' নয়, গরিব হয়ে থাকতেই চাই। বোলো, আমি অলস, অকর্ম্মণ্য, কাজকর্ম্মে আমার মন নেই বলে' আমাকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। আর তুমি যা' সব দেখলে, এবং আমি তোমাকে যা' যা' বললাম, সব তাকে বোলো।"

বেটম্যানের মাথায় হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুতের মত জাগিয়া উঠিল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া এডওয়ার্ডের মুখের উপরে মুখ রাখিয়া অতিশয় আকুল-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

"বল কি ? তা'হলে ইসাবেলকে তুমি বিয়ে করবে না ?"

এডওয়ার্ড গম্ভীর ভাবে তাহার পানে চাহিল।

"আমি নিজে কখনই আমার প্রতিশ্রুতি থেকে আমায় মুক্তি দিতে বলবো না তাকে। সে যদি আমাকে আমার কথা রাখতে বাধ্য করে, তবে তাকে বিয়ে করে', যতদূর সাধ্য স্বামীর কর্তব্য পালন করবার চেষ্টা করব।"

"আমি তাকে এই সংবাদ দেবো গিয়ে—এই তোমার ইচ্ছে ? উঃ, সে আমি পারবো না। এ যে বড় ভয়ানক! সে যে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, তুমি, তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। সে তোমাকে ভালবাসে। এত বড একটা আঘাত আমি তাকে দেবো কি করে ?"

এডওয়ার্ড আবার হাসিল। "তুমি নিজেই তাকে বিয়ে কর না, বেটম্যান ? তুমি তো বহুকাল তাকে ভালবেসেছ। তোমাদের দুজনে খুব ভালো মিল হবে। তোমার হাতে পড়লে খুব সুখী হবে সে।"

"এমন কথা ব'লনা বলছি। আমি সহ্য করতে পারিনে।"

"আমি স্বেচ্ছায়, সন্তুষ্টচিত্তে আমার দাবী ছেড়ে দিচ্ছি, যাতে তোমার কোন বাধা না থাকে। তুমিই যোগ্যতর।"

এডওয়ার্ডের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যার জন্য বেটম্যান একবার চকিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু সে মুখ স্থির, গম্ভীর, একটু হাসির ভাব তাহাতে ছিল না। বেটম্যান হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কি যে বলিবে স্থির করিতে পারিল না। এডওয়ার্ড কি তবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, বেটম্যান একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া টাহিটিতে আসিয়াছে ? একটা চিন্তা—ঘোরতর পাপ-চিন্তাই বটে—তবুও মনে আসিতেই, প্রাণের মধ্যে একটা প্রবল আনন্দ আর বাধা মানিল না।

অতঃপর সে ধীরে ধীরে বলিল,—"আচ্ছা, ইসাবেল যদি চিঠিতেই সেই বাগ্‌দান প্রত্যাহার করে তখন তুমি কি করবে ?

"অন্ততঃ বেঁচে থাকবো।"

কথাটা বেটম্যান শুনিতে পাইল না, সে এমনই ভাবাবেগে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। একটু পরে বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তুমি তোমার

ঐ উদ্ভট পোষাকটা ছেড়ে ফেল তো! এতবড় একটা গুরুতর সংকল্পের কথা বলছ—কিন্তু ঐ পোষাকটা দেখলে মনে হয়, সে যেন একটা হাস্যকর কিছু।"

"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। 'পারেও' পরে', আর মাথায় একটা ফুলের মালা চড়িয়ে আমার মনের গাম্ভীর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি—উঁচু হ্যাট আর ফ্যাসান-দুরস্ত কোট আমার কথার মর্য্যাদা কিছুমাত্র বাড়িয়ে দেবে না।"

তখন বেটম্যানের আর একটা কথা মনে হইল। "এডওয়ার্ড, তুমি আমার জন্যেই এমন কাজ করছ না তো? ঠিক বলতে পারিনে,—এর দ্বারা আমার জীবনে একটা বড় রকম পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু আমার কথা ভেবেই কি তুমি এতবড় ত্যাগ স্বীকার করছ? তুমি জানো, আমি কিন্তু এতোটা সহ্য করতে পারবো না।"

"না, বেট্‌ম্যান, এখানে আসার পর আমি সব রকম মূর্খতা ও ভাব-বিলাস ঝেড়ে ফেলতে শিখেছি। তুমি ও ইসাবেল সুখী হও—এও আমি যেমন চাই, তেমনি আমি নিজেও অসুখী হ'তে চাইনে।"

বেট্‌ম্যানের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। উত্তর শুনিয়া মনে হইল, যে এমন কথা বলে, সে মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে শ্রদ্ধা করে না; বেট্‌ম্যান নিজে কোনরূপ মহত্ত্বের কাজ করিতে লজ্জা পায় না।

"তা' হলে, এইখানে জীবনটা এমনি করে' নষ্ট করতে কোন দুঃখ নেই তোমার? এতো স্রেফ্‌ আত্মহত্যা! কলেজে যখন পড়তে তখন তোমার মনে কত উচ্চ আশাই না ছিল!—সেই তুমি আজ একটা খুচরা-জিনিস-বিক্রির দোকানে ঐ রকম ছোট কাজ করতেও রাজী—এযে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!"

"ঠিক তা নয়; ও কাজ অমি কিছুদিন মাত্র করব, ওর দ্বারা আমার অনেক দরকারী বিষয়ে জ্ঞানলাভ হবে। আমার মাথায় আর একটা প্ল্যান আছে। আর্ণল্‌ড্‌ জ্যাকসনের একটা ছোট জমিদারী আছে—এখান থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে, একটা দ্বীপে। সমুদ্র একটা দীঘির মত হয়ে ভিতরে ঢুকেছে—তাকেই গোল হয়ে ঘিরে আছে একখণ্ড জমি। জ্যাকসন তাতে নারিকেল গাছ লাগিয়েছেন; সেটা আমাকেই তিনি দেবেন বলেছেন।"

"তোমাকে দেবেন কেন?"

"তার কারণ, ইসাবেল যদি আমাকে ছেড়ে দেয়, তা' হলে ওঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করব।"

বেট্‌ম্যান শুনিয়া স্তম্ভিত হইল, বলিল "তুমি এমন কাজ করবে!—একটা দো-আঁশলা জাতের মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে,—নিশ্চয় পাগল হওনি!"

"মেয়েটি বড় ভালো। স্বভাবটি বড় নরম, বড় মধুর। আমার মনে হয়, ওকে বিয়ে করলে আমি সুখী হব।"

"তুমি ওকে ভালবেসেছ?"

বেশ একটু ভাবিয়া এডওয়ার্ড বলিল—"তা' ঠিক বলতে পারিনে। ইসাবেলের সঙ্গে আমার যে রকম হয়েছিল, ওর সঙ্গে সে রকম হয়নি। ইসাবেলকে আমি দেবীর মতন করে' পুজো করতাম—মনে হ'ত তেমন অপূর্ব্ব বস্তু জগতে আর নেই; ওর আমি মোটেই যোগ্য নই। ইভার সম্পর্কে আমার তেমনটি মনে হয় না। ও যেন একটা ভিন্‌দেশী অপরূপ ফুল; ওকে বড় যত্নে রক্ষা করতে হ'বে, যেন কঠিন শীতের হাওয়া ওর গায়ে না লাগে। আমি ওর রক্ষক হতে চাই! ইসাবেলকে রক্ষা করবার কথা মনেই হয় না। ইভা আমাকে ভালবাসে—শুধু আমাকেই; আমি কি হব, কত বড় হ'ব, এ চিন্তা করে না। আমার ভাগ্যে এর পর যাই ঘটুক না কেন, ওর তাতে আশাভঙ্গ হবে না। আমার পক্ষে ওর মত স্ত্রীই ভালো।"

বেট্‌ম্যান চুপ করিয়া রহিল।

শেষে এডওয়ার্ড বলিল—"কাল খুব ভোরেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। আর দেরী করা ঠিক নয়, এখন ঘুমুইগে যাই চল।"

এইবার বেট্‌ম্যান আর থাকিতে পারিল না, প্রায় ফুঁপাইয়া উঠিল।

"আমি কেমন হয়ে গেছি,—কোন কথা আর আসছে না। ভেবেছিলাম, কিছু একটা ঘটেছে, তাই এখানে এসেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, তুমি যা' মনে করে' এসেছিলে তা' করে উঠতে পারোনি, তাই লজ্জায় দেশে ফিরতে পারছো না। বড় দুঃখ পেলাম, এডওয়ার্ড!—আমার সব আশা চূর্ণ হল! আমার বিশ্বাস ছিল, তোমাকে দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ হবে। এ কথা মনে করতেও বুক ফেটে যাচ্ছে যে, তুমি তোমার যৌবন, তোমার এত বিদ্যা-বুদ্ধি, বড় হবার এত সুযোগ—সবই এমনি করে ব্যর্থ করে দেবে!"

"দুঃখ কোরো না, বন্ধু!—আমার সব নষ্ট হয়নি। আমার জীবন সফলই হয়েছে। তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না, জীবনটাকে খুব ভালো করে' ভোগ করবার আশা কত বেড়ে গেছে আমার; সে জীবনে একটু ফাঁক থাকবে না কোথাও, কিছুই বৃথা হবে না। ইসাবেলকে বিয়ে করার পর তুমি মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ কোরো। আমার সেই প্রবাল-দ্বীপটিতে একখানি বাড়ী তৈরী করে' তাইতেই আমি বাস করবো; গাছগুলিকে যত্ন করব; নারকেলগুলো কাটবো ঠিক সেই রকম করে'—যেমন করে' হাজার বছর ধরে' সবাই কেটেছে; বাগানে কত কি লাগাবো, হ্রদের জলে মাছ ধরবো। কাজের অভাবে বসে' থাকতেও যেমন হবে না, তেমনি কাজের চাপে দিনগুলো একঘেয়ে হ'য়েও উঠবে না। আমার বই থাকবে, ইভা থাকবে; হয়তো দুচারিটি ছেলেমেয়েও হবে। আর এ সবের উপর থাকবে আকাশ আর সমুদ্রের অফুরন্ত রূপ; টাটকা-ফোটা ফুলের মত ভোরবেলার আলো, সূর্য্যাস্তের শোভা, আর নিস্তব্ধসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় রাত্রি। যে-ভূমি এতদিন বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল তাকে আমি ফলে-ফুলে সাজিয়ে দেবো, সে হবে একটা সত্যিকার সৃষ্টিকর্ম্ম। জানতেও পারবো না—দিনগুলো কেমন করে' কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। তারপর যখন বৃদ্ধ হ'ব, বিগত জীবনের দিকে চেয়ে দেখবো—সে জীবন সুখে, সহজে, শান্তিতে কেটেছে। আমিও আমার মত করে' আমার এই জীবনটা সৌন্দর্য্যে ভরে' তুলব। তুমি কি মনে কর, এই যে অল্পে-তুষ্ট হয়ে থাকা, এর কোন মূল্য নেই? একথা তো আমরা শুনেছি যে, মানুষ যদি নিজেকেই হারায়, তবে সারা জগতটা পেলেও তার কি লাভ? আমার বিশ্বাস, আমি আমার 'আমি'-টাকে খুঁজে পেয়েছি!"

এডওয়ার্ড তাহাকে শোবার ঘরে লইয়া গেল, সেখানে দুইজনের দুইটা বিছানা, একটাতে সে শুইয়া পড়িল। দশমিনিটের মধ্যে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—শিশুর নিঃশ্বাসের মত; বেটম্যান বুঝিল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে কিন্তু ঘুমাইতে পারিল না, তাহার মন বড় বিক্ষিপ্ত হইয়াছে; যতক্ষণ না ভোরের অস্ফুট আলো প্রেতযোনির মত ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল, ততক্ষণ তাহার ঘুম আসিল না।

(৫)

বেটম্যান ইসাবেলের নিকটে তাহার দীর্ঘ কাহিনী শেষ করিল। কিছুই গোপন করিল না, কেবল, যাহাতে সে আঘাত পাইবে, অথবা যাহাতে তাহার

নিজের লজ্জা পাইতে হইবে, তাহাই বাদ দিল। সে যে মাথায় একগাছা ফুলের মালা পরিয়া ডিনারে বসিয়াছিল সে কথাও বলিল না; অথবা, ইসাবেল যে-মুহূর্তে এডওয়ার্ডকে তাহার বাগ্‌দান হইতে মুক্তি দিবে, সেই মুহূর্তেই সে যে ইসাবেলের মামার সেই দেশীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিবে, সে কথাও বলিল না। কিন্তু ইসাবেলের বোধশক্তি যে কত তীক্ষ্ণ তাহা সে জানিত না; গল্প শুনিতে শুনিতে তাহার চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, ঠোঁট দুইটা একটার উপর আরেকটা আরও চাপিয়া বসিতেছিল। মাঝে মাঝে সে বেটম্যানের মুখে এমনভাবে চাহিতেছিল যে, বেটম্যান যদি নিজের গল্পে নিজেই তন্ময় হইয়া না থাকিত, তবে সেই দৃষ্টি তাহার চক্ষু এড়াইত না।

কাহিনী শেষ হইলে ইসাবেল জিজ্ঞাসা করিল—

"মেয়েটা দেখতে কেমন—মামার সেই মেয়েটা? তোমার কি মনে হয়, তার সঙ্গে আমার চেহারার কোথাও মিল আছে?"

প্রশ্ন শুনিয়া বেটম্যান অবাক হইয়া গেল, বলিল—

"আমার একবারও তা' মনে হয়নি। তুমি জানো, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমার ভাল করে' দেখতে ইচ্ছেই হয় না; তোমার মত রূপ আর কারো আছে না কি?"

তাহার কথায় ঈষৎ হাসিয়া ইসাবেল বলিল—

"তবু দেখতে কেমন? সুন্দরী নয়?"

"তা' হ'তে পারে। আমার বিশ্বাস, এমন লোকও আছে, যাদের চোখে সে পরমাসুন্দরী।"

"আচ্ছা, হলই বা, তাতে আর কি? তার কথায় আর কাজ নেই।"

ইহার পর বেটম্যান জিজ্ঞাসা করিল,

"এখন তা' হ'লে কি করবে, ইসাবেল?"

ইসাবেল তাহার হাতখানির দিকে একবার চাহিল—এডওয়ার্ড তাহার আঙুলে বাগ্‌দানের যে আংটি পরাইয়া দিয়াছিল, তখনও তাহা তেমনই রহিয়াছে।

"আমি তখন তার সেই প্রতিশ্রুতি তাকে ভাঙতে দিইনি; ভেবেছিলাম, সেই-কথা স্মরণ করে' সে সকল কাজে জোর পাবে, আমিই হ'ব তার বাহুতে বল, হৃদয়ে শক্তি। মনে করেছিলাম, তার জীবনে সে যদি উন্নতি করে, তবে

তা'র একমাত্র কারণ হবে—আমার ভালবাসার উপর তার নির্ভর। আমার যতদূর সাধ্য আমি তা' করেছি, আর কিছুই করবার নেই। আমি যদি সব বুঝেও না বুঝি, তবে সেটা আমারই দুর্ব্বলতা। বেচারী এডওয়ার্ড! সে নিজে নিজেরই শত্রু, আর কারো নয়। ভালবাসবার মত অনেক গুণ তার ছিল, সত্যিই বড় ভালো সে—মনে করলে দুঃখ হয়; কিন্তু একটা কি যেন তার ছিল না; আমার বোধ হয়, সেটা হচ্ছে—চরিত্র। সে যেন সুখী হয়।"

এই বলিয়া ইসাবেল আংটিটা আঙুল হইতে খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। তাহার ঐ কাজটি দেখিয়া বেটম্যানের বুক এমন দুর-দুর করিতে লাগিল যে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া যাইবে।

"কি আশ্চর্য্য তোমার মনের বল, ইসাবেল! তুমি ধন্য! সত্যই তুমি মহীয়সী!"

ইসাবেল হাসিল, তারপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেটম্যানের দিকে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—

"তুমি আমার জন্যে যা' করেছ তা' আমি কখনো ভুলব না—বড় উপকার করেছ তুমি! আমি জানতাম, তুমি আমার মান রাখবে।"

বেটম্যান তাহার হাতখানি হাতে লইয়া ধরিয়া রাখিল। তাকে এত সুন্দর সে আর কখনো দেখে নাই।

"কি বলব তোমায়, ইসাবেল। আমি ওর চেয়ে ঢের বেশি করতে পারি তোমার জন্যে। তুমি তো জানো, আমি আর কিছু চাইনে—কেবল তুমি আমাকে বলে, দাও, কোন্ ভালবাসার কাজ, কোন্ সেবার কাজ আমায় করতে হবে।"

ইসাবেল সনিঃশ্বাসে মৃদুকণ্ঠে বলিল—

"তুমি এমন শক্তিমান পুরুষ, বেটম্যান; তোমার উপর নির্ভর করতে পারি মনে হ'লে প্রাণে কেমন একটি মধুর তৃপ্তি-সুখের আবেশ হয়।"

"ইসাবেল, তোমাকে যে আমি দেবীর মতন"—

আবেগটা এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল যে, কি করিতেছে তাহা বুঝিবার পূর্ব্বেই সে ইসাবেলকে দুই বাহু দিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল; সেও কিছুমাত্র বাধা না দিয়া, মধুর চাহনি-ভরা চোখে তাহার চোখদুইটির পানে চাহিল।

প্রেমোচ্ছ্বসিত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল,

"যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম, সেই দিনই তোমাকে বিয়ে করব জন্যে আমি পাগল হয়েছিলাম—তুমি কি তা' বুঝিতে পারো নি?"

ইসাবেল বলিল "তা' হলে' সে কথা আমায় বলতে তোমার কি হয়েছিল? ইসাবেলও তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। ইসাবেল তাহার সেই ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁটদুইটি চুম্বনের জন্য আগাইয়া দিল। অতঃপর ইসাবেলকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বেট্‌ম্যান স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহাদের সেই হাণ্টার-মোটর-কোম্পানী কারবার হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, এত বড় হইয়া উঠিয়াছে যে, তি শো বিঘা জমিতেও কুলায় না। তারপর, সে কত ভালো ভালো ছবি সংগ্র করিবে—অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিখ্যাত ছবি। নিউইয়র্ক শহরে অ কাহারও তেমন ছবির সংগ্রহ থাকিবে না। সে চোখে হর্ণ-এর চশমা পরিবে। ইসাবেলও তাহার বক্ষে বেট্‌ম্যানের বাহুস্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে করিতে আবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, সেও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তাহার দিব্য পরিপ একখানি বাড়ী, তাহাতে কত রকমের জিনিস! আসবাবগুলা সব প্রাচ ধরণে তৈরী—এক একটা যুগের ভঙ্গিতে এক এক ঘরের সজ্জা। বা বড় ঘরে সে নিত্য কন্‌সার্টের আয়োজন করিবে; ভালো ভালো নাচ, উৎ ডিনার—তাহাতে শহরের শ্রেষ্ঠ সমাজের লোকেরাই নিমন্ত্রিত হইবে। বেট্‌ম্য চোখে হর্ণের চশমা পরিবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

"আহা, বেচারী এডওয়ার্ড!"